প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ-ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

চন্দন বসু
উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ : জুলাই, 2023

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ডিসট্যান্স এডুকেশন ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the University Grants Commission,
Distance Education Bureau, New Delhi

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PGJM

M.A. in Journalism & Mass Communication (সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন)

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

PGJM : Paper VIIIB : উন্নয়ন জ্ঞাপন (Development Communication)

	রচনা (Content Writer)	সম্পাদনা (Editor)
মডিউল ১	**সুস্মিতা পণ্ডিত** অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ফিউচার ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা	**ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য** অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মডিউল ২	**অরিজিৎ ঘোষ** অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	**ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য**
মডিউল ৩	**ড. পল্লব মুখোপাধ্যায়** অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়	**ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য**
মডিউল ৪		
একক ১-৩	**ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য**	**অরিজিৎ ঘোষ**
একক ৪	**অরিজিৎ ঘোষ**	**ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য**

বিন্যাস ও প্রুফ-পরিমার্জনা : অরিজিৎ ঘোষ

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ

স্নাতকোত্তর বিষয় সমিতি (PG Board of Studies)

অধ্যাপক শাশ্বতী গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক, গণজ্ঞাপন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

স্নেহাশিস সুর, প্রবীণ সাংবাদিক, দূরদর্শন কেন্দ্র, কলকাতা

ড. দেবজ্যোতি চন্দ, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, গণজ্ঞাপন ও ভিডিওগ্রাফি বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

ড. পল্লব মুখোপাধ্যায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অরিজিৎ ঘোষ, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, ডিরেক্টর, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজী সুভাস মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোরকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক অসিত বরণ আইচ
নিবন্ধক

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)
PGJM

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ

অষ্টম পত্র: দ্বিতীয় পর্যায় - VIII B

উন্নয়ন জ্ঞাপন (Development Communication)

মডিউল ১ : উন্নয়ন জ্ঞাপনের ধারণা

একক ১ ❑ উন্নয়ন জ্ঞাপনের ধারণা : উন্নয়নের পন্থা, উন্নয়নের সূচক 9-20

একক ২ ❑ উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্ত (Dominant Paradigm of Development) 21-32

একক ৩ ❑ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্ষেত্র ও সুযোগ -উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের আইওয়া মডেল (IOWA MODEL) 33-47

একক ৪ ❑ লার্নার ও তার আধুনিকীকরণের তত্ত্ব 48-56

মডিউল ২ : উন্নয়নের সূক্ষ্মতা

একক ১ ❑ গ্রামীণ উন্নয়নের ধারণা, গ্রামীণ উন্নয়নের সরঞ্জাম, গান্ধীবাদী মডেল এবং গ্রাম স্বরাজ 59-71

একক ২ ❑ টেকসই উন্নয়ন, মানব উন্নয়ন পদ্ধতি, উন্নয়নের বাহক হিসেবে সংস্কৃতি 72-81

একক ৩ ❑ উন্নয়নে অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি 82-92

একক ৪ ❑ উন্নয়ন স্বাধীনতা— সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা 93-99

মডিউল ৩ : উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা

একক ১ ❑ উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা : ধারণা ও উৎস 103-110

একক ২ ❑ সাংবাদিকতা-ধারণা ও প্রকারভেদ 111-122

একক ৩ ❑ উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা 123-132

একক ৪ ❑ ভারতে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা 133-144

মডিউল ৪ : উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণের জন্য জ্ঞাপন

একক ১ ❑ উন্নয়নে অংশগ্রহণের গুরুত্ব—অংশগ্রহণ তত্ত্বের তাৎপর্য—
পাওলো ফ্রেইরীর প্রেক্ষা—অংশগ্রহণকারী জ্ঞাপনের উপায় 147-154

একক ২ ❑ উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা—সাম্প্রতিক উদীয়মান পরিপ্রেক্ষিত—
জাতিগঠনে জ্ঞাপনের ভূমিকা—উদ্ভাবনের প্রসারণ 155-162

একক ৩ ❑ ভারতে উন্নয়ন জ্ঞাপনের কৌশল 163-166

একক ৪ ❑ উন্নয়নে এনজিওর (NGO) ভূমিকা 167-173

মডিউল ১

উন্নয়ন জ্ঞাপনের ধারণা

একক ১ ❑ উন্নয়ন জ্ঞাপনের ধারণা : উন্নয়নের পন্থা, উন্নয়নের সূচক

গঠন

১.১.১ উদ্দেশ্য

১.১.২ প্রস্তাবনা

১.১.৩ উন্নয়ন জ্ঞাপনের ধারণার প্রকরণ

১.১.৪ উন্নয়নের পন্থা

- ১.১.৪.১ অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার
- ১.১.৪.২ প্রান্তিক সম্প্রদায়
- ১.১.৪.৩ পরিবেশের স্থায়িত্ব
- ১.১.৪.৪ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি

১.১.৫ উন্নয়নের সূচক

- ১.১.৫.১ অর্থনৈতিক সূচক
  - ১.১.৫.১.১ গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম (**GNI**)
  - ১.১.৫.১.২ গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (**GDP**)
  - ১.১.৫.১.৩ গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট (**GNP**)
  - ১.১.৫.১.৪ মাথাপিছু **GNP**
- ১.১.৫.২ সামাজিক সূচক
  - ১.১.৫.২.১ জন্ম এবং মৃত্যুর হার
  - ১.১.৫.২.২ শিশুমৃত্যুর হার
  - ১.১.৫.২.৩ সাক্ষরতার হার
  - ১.১.৫.২.৪ আয়ুষ্কাল
- ১.১.৫.৩ মানব উন্নয়ন সূচক **Human Development Index (HDI)**

১.১.৬ সারাংশ

১.১.৭ অনুশীলনী

১.১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১.১.১ উদ্দেশ্য

উন্নয়ন জ্ঞাপনের মূল ধারণাটি একটি দেশের উন্নয়নের জন্য গণমাধ্যমের ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়েছে। এই ধরনের জ্ঞাপন মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহ দেয় এবং মানুষজনের সেবাতে নিজেদের নিয়োগ করে। এইভাবে এটি একটি সামাজিক সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে। উন্নয়ন জ্ঞাপনের উৎপত্তি ১৯৪০-এর দশকে হয়েছিল কারণ সেই সময় সমাজের উন্নয়নের জন্য গণমাধ্যম ব্যবহারের ধারণাটিকে প্রথমবার ব্যবহার করা হয়েছিল। উন্নয়ন জ্ঞাপনের মাধ্যমে সমাজে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন সৃষ্টি করা সম্ভব। এই ইতিবাচক পরিবর্তন স্টেকহোল্ডার এবং নীতি নির্ধারকদের নিত্য সম্পৃক্ততা দ্বারাই সম্ভব। এইখানে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার মাধ্যমে তথ্য প্রচারকে এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এইভাবে উন্নয়ন জ্ঞাপন ক্রমাগত জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, যার ফলে একটি কম উন্নত সমাজ একটি উন্নত সমাজে রূপান্তরিত হতে পারে। এই এককে আমরা উন্নয়ন জ্ঞাপনের ধারণা ও মানে এবং উন্নয়নের পন্থা ও সূচক নিয়ে আলোচনা করবো।

১.১.২ প্রস্তাবনা

উন্নয়নকে অনেকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। এরকম অনেকের বিশ্লেষণে জ্ঞাপনের একটি বিশেষ ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জ্ঞাপনকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রচারের একটি কার্যকরী হাতিয়ার এবং ব্যাপক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনার উপায় হিসাবে দেখা হয়েছে। উন্নয়ন জ্ঞাপন হল এমন এক উপায়ে যা সামাজিক পরিবর্তনের অনুঘটক হিসাবে কাজ করে যার ফলে দরিদ্রদের জীবনে উন্নতি আনা যেতে পারে। উন্নয়ন জ্ঞাপনের সূচনা থেকেই এই ক্ষেত্রটি বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম এবং আন্তঃব্যক্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে কৌশলগত হস্তক্ষেপের কাজ করে আসছে। এইটা লক্ষণীয় যে উন্নয়ন জ্ঞাপন পন্থায়ে ক্রমে একটা পরিবর্তন ধরা পড়েছে। আমরা দেখি যে উন্নয়ন জ্ঞাপন বিশেষজ্ঞরা উপর থেকে নিচে যোগাযোগের নীতি, সরকারি প্রোপ্যাগান্ডা ও সাহায্য সংস্থাকে প্রাধান্য দেওয়া থেকে সরে এসে গণতন্ত্রকে উন্নত করার কৌশল, জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার নীতি এবং নিচ থেকে উপরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছে। উন্নয়ন যোগাযোগে এই পরিবর্তনগুলি মূলত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি-চালিত উন্নয়নের মডেল থেকে অংশগ্রহণমূলক মডেলে পরিবর্তনের ফলে হয় যেখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আজকের দিনে উন্নয়ন জ্ঞাপন উন্নয়নশীল দেশগুলির উদ্বেগ নিয়ে কাজ করে। উন্নয়ন জ্ঞাপনের ক্ষেত্রটি একটি অসম বিশ্বকে সমান করার ক্ষেত্রে জ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তাকে খুব গুরুত্ব দেয়। তার সঙ্গে আমাদের উন্নয়ন অগ্রাধিকার সম্পর্কের ধারণাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১.১.৩ উন্নয়ন জ্ঞাপনের ধারণার প্রকরণ

উন্নয়ন জ্ঞাপনের দুটি প্রকরণ রয়েছে। একটিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে উন্নয়ন জ্ঞাপন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রচার করা হয়েছিল যারা শিল্প এবং জ্ঞান উভয়েরই একটি সংস্থা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তারা উন্নয়নকে উত্তর গোলার্ধের পশ্চিমা শিল্পায়িত দেশের (যারা অর্থনৈতিক লক্ষ্য এবং সূচকগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে) নিরিক্ষে দেখেছিলেন। আরেকটি প্রকরণ, ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে আবির্ভূত হয়েছিল এবং তার একটি শক্তিশালী ভিত্তি ল্যাটিন আমেরিকা ছিল। এই প্রকরণ আগের প্রকরণের ব্যর্থতাগুলিকে চিহ্নিত করে এবং তাদের দেওয়া অর্থনৈতিক কাঠামো ও উন্নয়নের একক লক্ষ্য থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। এরা আরও বেশি করে দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলো এবং সেই অনুযায়ী এক পন্থা তৈরি করার কথা ভেবেছিলো। এইখানে জ্ঞাপনের উপর থেকে নিচের আলোচনা পন্থাকে বরখাস্ত করে নিচ থেকে উপরের আলোচনা পন্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তার সঙ্গে তারা অর্থনৈতিক উন্নতির চিন্তা যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিশ্বাসকে সরিয়ে রেখে অন্যান্য দিকগুলিকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। সংস্কৃতি, ভাষা, নারী, পরিবেশগত সমস্যা, ছোট পদক্ষেপ বা প্রকল্প, প্রযুক্তির ভূমিকা, এবং বুনিয়াদি অংশগ্রহণকে উন্নয়ন জ্ঞাপন অভিধানে যোগ করা হয়েছিল।

উন্নয়ন জ্ঞাপন ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে গণমাধ্যম (প্রিন্ট, রেডিও, টেলিফোন, ভিডিও এবং ইন্টারনেট) অথবা শিক্ষা (প্রশিক্ষণ, সাক্ষরতা, স্কুলিং) এর মাধ্যমে একটি পদ্ধতিগত বা কৌশলগতভাবে হস্তক্ষেপ করার একটি প্রক্রিয়া। এই পরিবর্তন অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত, যেমন আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক হতে পারে। উন্নয়ন জ্ঞাপন ক্ষেত্রের সূচনা : প্রথমত পশ্চিম ইউরোপীয় এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলি থেকে উদ্ভূত অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং মডেলগুলির মাধ্যমে হয়েছে যা মূলত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উন্নয়ন এবং সামাজিক পরিবর্তনের গতিপথ নির্ধারণের একটি রূপরেখা তৈরি করেছিল। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের উপনিবেশকরণের পর মানবিক সংকটের প্রতিক্রিয়ায় জাতিসংঘের বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক সংস্থা এবং ধনী দেশগুলির দ্বারা সংগঠিত উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচির ফলে হয়।

১.১.৪ উন্নয়নের পন্থা

একটি দেশের গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GDP) বৃদ্ধিকে একটি দেশের উন্নয়নের সমার্থক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু অনেক অনুশীলনকারী এবং উন্নয়ন চিন্তাবিদরা এই ধারণার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং GDP, গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট (GNP) এর মতো অর্থনৈতিক সূচকগুলির অপর্যাপ্ততা নিয়ে কথা বলেছেন। তারা যুক্তি দিয়েছেন যে হিউমান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (HDI), ফিজিক্যাল কোয়ালিটি অফ দ্য লাইফ ইনডেক্স (PQLI), মাল্টিডিমেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স (MPI) এর মতো সামাজিক সূচকগুলি

একটি দেশের উন্নয়ন এবং জনগণের সমবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও বেশি ভাল ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। উন্নয়নের বর্ধিত ধারণা এটিকে একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া বলে মনে করে যা একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় অবস্থার উন্নতি পরিচালিত করতে পারে। উন্নয়নের বর্তমান ধারণায় একটি উন্নত জীবনের জন্য জনগণের স্বাধীনতা, ক্ষমতা এবং অধিকার বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এইভাবে অনুন্নয়নের মৌলিক সমস্যাগুলি যেমন দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, ক্ষুধা, খাদ্য নিরাপত্তা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব ইত্যাদি যা ভারত সহ বেশিরভাগ স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে জর্জরিত করে চলেছে, তা ছাড়াও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, ন্যায়সঙ্গত বৃদ্ধি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়গুলিকে এখন উন্নয়ন আলোচ্যসূচীর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে।

১.১.৪.১ অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার

উন্নয়ন জ্ঞাপন উন্নয়নের সমস্যাগুলিকে এমনভাবে মোকাবেলা করে যা দরিদ্র মানুষদের মর্যাদাপূর্ণ ও সমান সুযোগের জীবনযাপনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সেই জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রচার করাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় যা স্বাধীনতা, সমতা এবং মর্যাদার সাথে একটি উৎপাদনশীল এবং অর্থবহ জীবন অর্জনের জন্য সকলকে সমতা এবং সুযোগ প্রদানের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উন্নয়ন জ্ঞাপন তার উদ্যোগের মাধ্যমে, একটি সামাজিকভাবে ন্যায়সঙ্গত সমাজের মূল মূল্যবোধকে প্রচার করে যা মৌলিক মানবাধিকার, সম্পদের সুষম বণ্টন, সমান সুযোগ, শান্তি ও নিরাপত্তা এবং মানুষের সম্ভাবনার উপলব্ধিকে উৎসাহিত করে। তাই উন্নয়ন নীতিগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা বোঝার ক্ষেত্রে দরিদ্র ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর বহুবিধ বঞ্চনাগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

১.১.৪.২ প্রান্তিক সম্প্রদায়

দারিদ্র্য বৈষম্যকে বাড়িয়ে তোলে যা মানুষকে আরও দারিদ্র্য ও অনগ্রসর জীবনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। উন্নয়ন জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নতি অনেকটাই লিঙ্গ বৈষম্যকে দূর করার উপর নির্ভরশীল। ভারতের মহিলারা ক্রমাগত একাধিক বঞ্চনার সম্মুখীন হয় এবং তারা ভারতের জনসংখ্যার সবচেয়ে অবহেলিত এবং দরিদ্রতম শ্রেণীর মধ্যে একটি। দলিত, উপজাতীয় এবং বিভিন্ন অনগ্রসর সম্প্রদায়েরাও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, জ্ঞাপন এবং অন্যান্য পরিষেবাগুলিতে এই গোষ্ঠীগুলির সীমিত বা দুর্বল অভিগমনের কারণে তারা দারিদ্র্যের একাধিক জালে আবদ্ধ থাকে। অর্থনৈতিক সবৃদ্ধি এবং মানব উন্নয়ন নারী ও সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমান অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। উন্নয়ন নীতি, শাসনের বিষয়গুলির পাশাপাশি উন্নয়ন পরিকল্পনাকেও অন্তর্ভুক্তি এবং বর্জনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। তাদের বৃহত্তর কণ্ঠস্বর প্রদান করা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দুর্বলদের চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়াই তাদের সামাজিক মূলধারায় নিয়ে আসার রাস্তা খুলে দেবে যার ফলে আমাদের দেশ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারবে।

১.১.৪.৩ পরিবেশের স্থায়িত্ব

উন্নয়ন জ্ঞাপন Sustainable Development Goals (SDGs) এর পরিবেশগত স্তায়িত্বতার নীতিকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এবং জনগণের পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে তাদেরকে ক্ষমতাশালী করার কাজ করে। যে কোনো সফল প্রচেষ্টার জন্য ঐতিহ্যগত ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমন্বয়, নীতি ও কর্মসূচির উপর আলোচনা এবং জাতীয় ও বিশ্বব্যাপী স্তরের সরকার, কর্পোরেট এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন।

১.১.৪.৪ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি

উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের ক্ষমতাকে আরো জোরদার করে, উন্নয়নের সাথে জড়িত সংস্থাগুলির প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো তৈরি করা জরুরি, যাতে উন্নয়ন বিতরণের ক্ষেত্রে সুবিধাগুলি কার্যকারিতা পায় এবং উন্নয়ন সম্বন্ধিত অনুদানের ব্যবহার দক্ষতার সঙ্গে করা যায়। উন্নয়ন জ্ঞাপন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তা করে। তাছাড়া উন্নয়ন জ্ঞাপন মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সহজতর করার চেষ্টা করে যাতে সকল গোষ্ঠী তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং উন্নয়ন বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। একটি স্বাধীন গণমাধ্যম যা জনস্বার্থের জন্য কাজ করে, সে উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্বচ্ছতা ও দায়িত্ববোধ আনতে সক্ষম হয় এবং ভিন্ন মতামতকে একজোট করার চেষ্টা করে।

মিশ্র-অর্থনীতি রাষ্ট্র এবং বাজারকে উন্নয়নের কাঠামো হিসাবে একত্রিত করে। এতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগের সহাবস্থান জড়িত। মিশ্র অর্থনীতি পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করে। পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলি তাদের নিজের স্বার্থ ও মুনাফার উদ্দেশ্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। তার পাশাপাশি, সরকারি শাখার উৎপাদন, যা লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করে না, বরং বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে উৎপাদনের পাশাপাশি সামাজিক শাখাগুলিকে আরও মজবুত করার চেষ্টা করে। ভারতকে মিশ্র অর্থনীতির একটি ভালো উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতিমালা (The Directive Principles of State Policy) বলে যে রাজ্য সম্প্রদায়ের বস্তুগত সম্পদের মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আরও ভাল বণ্টন নিশ্চিত করবে এবং কিছু লোকের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীকরণ রোধ করার চেষ্টা করবে। এই বাধ্যবাধকতা রাষ্ট্রকে উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে নিয়ে আসে। ভারতের পরিকল্পিত উন্নয়ন পদ্ধতিও একটি মিশ্র-অর্থনীতির মডেলের উপর নির্ভরশীল। এইখানে সরকারি এবং বেসরকারি সংগঠনগুলির সহাবস্থান আছে এবং এদের কাজের চরিত্র রাষ্ট্র দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, পরিকল্পিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভূমিকা সরকারি সংগঠনগুলিকে দেওয়া হয়েছিল এবং বেসরকারি সংগঠনগুলিকে সরকারি সংগঠনগুলির প্রচেষ্টার সম্পূরক ভাবা হয়েছিল। ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রবর্তনের পর থেকে, বেসরকারি খাতের অর্থনৈতিক স্থানের উল্লেখযোগ্য বিস্তার হয়েছে। বেসরকারি সংগঠনগুলি অর্থনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রেই আধিপত্য বিস্তার করে

চলেছে, যা ভারতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রকে দেওয়া সাংবিধানিক প্রাধান্যকে প্রায়শই প্রশ্নের মুখে এনেছে। এইভাবে, ভারতে মিশ্র-অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রকে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রবিন্দু থেকে কিছুটা সরিয়ে এনে বাজারকে কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছে। এইখানে রাষ্ট্রের অবস্থান খুবই ক্ষুদ্র, যেহেতু তার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বেসরকারিকরণের জন্য অনেকটাই কমে গেছে।

১.১.৫ উন্নয়নের সূচক

১.১.৫.১ অর্থনৈতিক সূচক

১.১.৫.১.১ গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম (GNI):

গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম মোট দেশীয় এবং বিদেশী মূল্য যা একটি দেশে বসবাসকারী মানুষজন সংযোজন করেছে তার পরিমাপ করে। GNI GDP-র সঙ্গে প্রবাসী সূত্রদের প্রাথমিক আয়ের গড় রসিদ (কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ এবং সম্পত্তির আয়) দ্বারা গঠিত হয়। মার্কিন ডলারে GNI গণনা করার সময়, আন্তর্জাতিকভাবে তুলনীয় ডেটা তৈরির জন্য, বিশ্বব্যাংক অ্যাটলাস পদ্ধতি ব্যবহার করে, যা বিনিময় হারের ক্ষণস্থায়ী ওঠানামার প্রভাবকে মসৃণ করার জন্য তিন বছরের বিনিময় হারের গড়কে (আগের বছরগুলি আপেক্ষিক মুদ্রাস্ফীতির ফলে বিন্যস্ত করে নেওয়া হয়) ব্যবহার করে। অর্থনীতি জুড়ে দামের বড় পার্থক্যের ফলে, বাজার বিনিময় হার-রূপান্তরিত GNI এবং GDP সঠিকভাবে অর্থনীতির আপেক্ষিক আকার, সম্পদ এবং বস্তুগত কল্যাণের মাত্রা পরিমাপ করতে পারে না। এটি কাটিয়ে উঠতে, ক্রয়শক্তির সমতার (PPP) হারকে ব্যবহার করে অনুমানগত হিসেবকে আন্তর্জাতিক ডলারে রূপান্তরিত করা হয়। PPP একটি দেশের মুদ্রার এক ইউনিট যা অন্য দেশের মোট পণ্য ও পরিষেবা কিনতে পারে তার পরিমাপ করে। PPP এইভাবে মোট পণ্য ও পরিষেবার খরচকে একটি সাধারণ মুদ্রায় রূপান্তর করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, যার ফলে দেশগুলিতে মূল্য স্তরের পার্থক্যকে দূর করা যেতে পারে। PPP মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতাকে সমান করে যা দেশগুলির মধ্যে ব্যয়ের বাস্তব স্তরের তুলনা করার অনুমতি দেয়, ঠিক যেমন একটি প্রচলিত মূল্য সূচক সময়ের সাথে বাস্তব মূল্যের তুলনা করতে দেয়।

১.১.৫.১.২ গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GDP)

গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GDP) হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি দেশের সীমানার মধ্যে উৎপাদিত সমস্ত সমাপ্ত পণ্য এবং পরিষেবার মোট আর্থিক বা বাজার মূল্যের পরিমাপ। সামগ্রিক দেশীয় উৎপাদনের বিস্তৃত পরিমাপ হিসাবে, এটি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বোঝার ক্ষেত্রে ব্যাপক গুরুত্ব রাখে। GDP হল এক বছর ধরে একটি দেশ তার পণ্য থেকে যে টাকা উপার্জন করে তার হিসেব। সাধারণত এই হিসেবকে ইউএস ডলারে রূপান্তরিত করা হয়। এই ক্ষেত্রে একটি অর্থনীতিতে থাকা সমস্ত আবাসিক উৎপাদকদের মোট মূল্যের যোগফল এর সঙ্গে পণ্যের করকে যোগ করে তার থেকে কোনো

ভর্তুকি (যা পণ্যের মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়) থাকলে তাকে বাদ দেওয়া হয়। GDP তিনটি উপায়ে গণনা করা হয়- ব্যয়, উৎপাদন এবং আয় ব্যবহারের মাধ্যমে। GDP কে মুদ্রাস্ফীতি এবং জনসংখ্যার নিরীখে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। প্রকৃত GDP মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবকে বিবেচনায় আনে কিন্তু নমিনাল জিডিপি তা করে না। যদিও GDP-র অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নীতিনির্ধারক, বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়িকদের কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এটি একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

১.১.৫.১.৩ গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট (GNP)

GNP মূলত একটি দেশের GDPর সঙ্গে বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত অর্থকে যোগ করে, দেশের অভ্যন্তরীণ থাকা অভারতীয়দের অর্জিত অর্থকে বিয়োগ করে পাওয়া যায়। গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট (GNP) হল একটি দেশের বাসিন্দাদের মালিকানাধীন উৎপাদনের সরঞ্জামের মাধ্যমে হওয়া সমস্ত চূড়ান্ত পণ্য এবং পরিষেবাগুলির একটি নির্দিষ্ট সময়ের মোট মূল্যের একটি অনুমান। GNP সাধারণত ব্যক্তিগত খরচ, ব্যক্তিগত গার্হস্থ্য বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয়, নেট রপ্তানি এবং বিদেশী বিনিয়োগ থেকে বাসিন্দাদের অর্জিত আয়ের যোগফল নিয়ে গণনা করা হয়। তারপর এর সঙ্গে বিদেশী বাসিন্দাদের দ্বারা অর্জিত আয় বিয়োগ করা হয়। নেট রপ্তানি মূলত একটি দেশ যা রপ্তানি করেছে তার থেকে কোনো পণ্য ও পরিষেবার আমদানিকে বিয়োগ করে পাওয়া যায়। GNP গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GDP) নামক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিমাপের সঙ্গে জড়িত। GDP উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা নির্বিশেষে একটি দেশের সীমানার মধ্যে উৎপাদিত সমস্ত উৎপাদনের হিসেব করে। GNP GDP দিয়ে শুরু হয়, বিদেশী বিনিয়োগ থেকে বাসিন্দাদের বিনিয়োগের আয় যোগ করে এবং তারপর তার দেশের মধ্যে অর্জিত বিদেশী বাসিন্দাদের বিনিয়োগের আয়কে বিয়োগ করে।

১.১.৫.১.৪ মাথাপিছু GNP

মাথাপিছু GNPর গণনা মূলত জনসংখ্যা দিয়ে GNPকে ভাগ করে করা হয়। এটি সাধারণত মার্কিন ডলারে প্রকাশ করা হয়। এটি উন্নয়ন পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি সাধারণ সূচক, কিন্তু এটি অপূর্ণ, কারণ এই গণনাতে কিছু নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদন যেমন জীবিকা উৎপাদন বিবেচিত হয় না। মাথাপিছু GNP আমাদের দেখায় যে যদি GNP কে আমরা সমানভাবে ভাগ করি তাহলে একটি দেশের GNPর কতটা অংশ প্রতিটি ব্যক্তির কাছে থাকবে। একটি দেশের মাথাপিছু GNP জানা সেই দেশটির অর্থনৈতিক শক্তি এবং চাহিদা বোঝার পাশাপাশি, সেখানকার সাধারণ নাগরিকের জীবনযাত্রার সাধারণ মান বোঝার ক্ষেত্রে একটি ভাল পদক্ষেপ। একটি দেশের মাথাপিছু জিএনপি অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে যা দেশ এবং তার জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত সমৃদ্ধি পরিমাপ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে সাধারণত মাথাপিছু বেশি GNPর দেশগুলিতে বসবাসকারী লোকেদের

দীর্ঘ আয়ু, বেশি সাক্ষরতার হার, নিরাপদ জল পাওয়ার অধিকার এবং কম পরিমাণে শিশুমৃত্যুর হার থাকে। মাথাপিছু GNP একটি দেশের উৎপাদন পরিমাপ করতে সাহায্য করে, কিন্তু এটি সেই দেশটিতে কী ধরনের পণ্য এবং পরিষেবা উৎপাদন করা হয় সেটি দেখায় না এবং সেখানকার সমস্ত মানুষ সেই দেশের সম্পদে সমানভাবে ভাগ করে অবদান রাখে কিনা বা তারা একটি পরিপূর্ণ জীবনযাপন করে কিনা সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে না।

উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন আয়ের দেশগুলির মাথাপিছু GNPতে বড় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, সমস্ত দেশে একটি প্রবণতা চোখে পরে যেখানে সবচেয়ে ধনী ২০ শতাংশের জন্য আয় উপার্জন মূলত দরিদ্রতম ২০ শতাংশের তুলনায় বহুগুণ বেশি। GNP সর্বদা অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির ক্রিয়াকলাপের গণনা করে না, যেমন পণ্য ও পরিষেবার জন্য অপ্রতিবেদিত নগদ অর্থ প্রদান, বিনিময় বা কালোবাজারী ব্যবসা ইত্যাদি। অনানুষ্ঠানিক খাত প্রচুর আয় করতে পারে যা কখনোই মানসম্মত অর্থনৈতিক সূচকে দেখা যায় না। অনেক দেশ এখন এমন কার্যক্রমকে উৎসাহিত করছে যার ফলে অনানুষ্ঠানিক খাতের লোকেদের ঋণ এবং ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ পেতে সহায়তা হয়। এইখানে দেশগুলির মূল লক্ষ্য হলো যে অনানুষ্ঠানিক খাতের লোকেরা যাতে অবশেষে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির অংশ হয়ে ওঠে।

১.১.৫.২ সামাজিক সূচক

১.১.৫.২.১ জন্ম এবং মৃত্যুর হার

একটি দেশের জন্ম এবং মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ এ) সেই দেশের স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার অবস্থার সামগ্রিক পরিমাপ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যদিও এই সংখ্যাগুলি একটি দেশের পরিস্থিতির সম্পূর্ণ চিত্র দেয় না।

১.১.৫.২.২ শিশুমৃত্যুর হার

একটি নির্দিষ্ট বছরে প্রতি ১০০০ জীবিত শিশুর জন্মের মধ্যে এক বছর বয়েসে পৌঁছানোর আগে মারা যাওয়া শিশুর সংখ্যাকে বিবেচিত করে শিশুমৃত্যুর হার বার করা হয়। সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ :

সিভিল রেজিস্ট্রেশন : শূন্য বছর বয়সে মৃত্যুর সংখ্যা এবং একই বয়সের জনসংখ্যা ব্যবহার করা হয় যার ফলে মৃত্যুর হার গণনা করা হয় যা পরে মৃত্যুর বয়স-নির্দিষ্ট সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করা হয়।

সেনসাস এবং সার্ভে: প্রজনন বয়েসী প্রতিটি মহিলাকে প্রশ্ন করা হয় যে তিনি এখনও পর্যন্ত কতগুলি সন্তানের জন্ম দিয়েছে এবং কতজন এখনও বেঁচে আছে। তারপর ব্রাস পদ্ধতি এবং জীবন ছকের মডেল ব্যবহার করে শিশু মৃত্যুর একটি অনুমান বের করা হয়।

সার্ভে: জন্মের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে একটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যেখানে একজন মহিলা তার জীবদ্দশায় জন্ম দেওয়া প্রতিটি শিশুর উপর বিস্তারিত প্রশ্ন সমূহের উত্তর দেয়। এই নমুনার ত্রুটি কমাতে, অনুমানগুলিকে সাধারণত সময়ের হারের ভিত্তিতে সমীক্ষার পূর্ববর্তী পাঁচ বা দশ বছর অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়।

১.১.৫.২.৩ সাক্ষরতার হার

একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে সেই দেশে কত শতাংশ লোক পড়তে পারে সেটা একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। একটি দেশে মহিলাদের সাক্ষরতার হার বেশি থাকলে তাদের গর্ভনিরোধ নিয়ে জ্ঞানের বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যায়, যার ফলে সেই দেশের জন্মের হারের ক্ষেত্রে একটি নিয়ন্ত্রণ চোখে পরে। সাক্ষরতার হার বলতে বোঝায় একটি দেশের নির্দিষ্ট বয়সের জনসংখ্যার শতাংশ যারা পড়তে এবং লিখতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার বুঝতে গেলে ১৫ বছর এবং তার বেশি বয়সের ছেলেমেয়েদের সাক্ষরতা, যুব সাক্ষরতার হার বলতে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী মানুষজন এবং বয়স্কদের সাক্ষরতা বলতে গেলে যাদের বয়েস ৬৫ বছর বা তার বেশি। এটি সাধারণত দৈনন্দিন জীবনের একটি ছোট সাধারণ বিবৃতি বোঝার ক্ষমতা অনুযায়ী পরিমাপ করা হয়। সাধারণত, সাক্ষরতা সংখ্যাকেও অন্তর্ভুক্ত করে, এবং পরিমাপ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গাণিতিক ক্ষমতার একটি সাধারণ জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাক্ষরতার হার এবং সাক্ষরদের সংখ্যা থেকে কার্যকরী সাক্ষরতা আলাদা করা উচিত। কার্যকরী সাক্ষরতা সাক্ষরতার একটি আরও বিস্তীর্ণ পরিমাপ যাকে ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং যেখানে একাধিক দক্ষতার স্তর নির্ধারণ করা যেতে পারে। কিছু দেশ সাক্ষরতার মানদণ্ড প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই আন্তর্জাতিক মানের থেকে ভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োগ করে, বা স্কুলে না যাওয়া ব্যক্তিদের নিরক্ষরদের সাথে সমান করে দেখে। কিছু দেশ সাক্ষরতার মূল্যায়ন এর ক্ষেত্রে আবার স্ব-প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে যার ফলে সম্ভবত সঠিক তথ্য সামনে আসতে পারেনা। যেসব দেশে প্রায় সকল ব্যক্তি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে, সেখানে সাক্ষরতার হার জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষরতার দক্ষতার বৈচিত্র্যের সীমিত তথ্য প্রদান করে।

১.১.৫.২.৪ আয়ুষ্কাল

এই সাধারণ পরিসংখ্যানটি একটি সূচক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বিশেষত একটি দেশ বা প্রদেশের স্বাস্থ্যসেবার মান বোঝার ক্ষেত্রে, যেখানে একটি জায়গার স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং বয়স্কদের পরিচর্যার বিশ্লেষণ করা জরুরি। সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল বলতে আমরা একজন ব্যক্তি কত বছর বেঁচে থাকবে তার অনুমান পেশ করাকে বুঝি। সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যা গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রাণহানির বয়েসের মোট গড় অনুমান করা জরুরি।

আলোচিত সব কটি সূচকের সংমিশ্রণ আমাদের উন্নয়ন ব্যবস্থার পরিমাপ করার আরও সঠিক উপায় দিতে পারে। মানব উন্নয়ন সূচক Human Development Index (HDI) এমনই একটি উদাহরণ। HDI আয়ু, প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা এবং মাথাপিছু GDP (যেখানে একটি দেশের সম্পদকে তার জনসংখ্যা দ্বারা বিভক্ত করা হয়) দিয়ে একটি একক পরিমাপ তৈরি করে যেই পরিমাপকে শূন্য থেকে এক এর স্কেলে রাখা হয় যেখানে একের কাছাকাছি স্কোর উন্নয়নের উচ্চ স্তর বোঝায়।

১.১.৫.৩ মানব উন্নয়ন সূচক Human Development Index (HDI):

HDI মূলত জনগণ এবং তাদের ক্ষমতার ফলে একটি দেশের উন্নয়নের মূল্যায়ন করে। এইখানে একা অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে দেখা হয় না। HDI মানব উন্নয়নের মূল মাত্রাগুলির গড় অর্জনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিমাপ প্রদান করে যেমন একটি দীর্ঘ এবং স্বাস্থ্যকর জীবন, মানুষের জ্ঞান অর্জন এবং একটি পরিমিত জীবনযাত্রার মান। HDI এই তিনটি মাত্রার প্রতিটির স্বাভাবিক সূচকের জ্যামিতিক গড় দ্বারা নির্ধারিত হয়। স্বাস্থ্যের মাত্রা জন্মের সময় আয়ুর দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়, শিক্ষার মাত্রা ২৫ বছর বা তার বেশি বয়সের মানুষজনদের স্কুলে পড়ার বছর এবং স্কুলে প্রবেশকারী বাচ্চাদের স্কুলে পড়ার প্রত্যাশিত বছরগুলির গড়ের মাধ্যমে মাপা হয়। জীবনযাত্রার মান মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (gross national income per capita) দ্বারা মাপা হয়। HDI আয়ের লগারিদম ব্যবহার করে, যার ফলে GNI বৃদ্ধির সাথে আয়ের কমতি গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়। এই তিনটি HDI এর সূচকগুলির ফলাফলগুলিকে জ্যামিতিক গড় ব্যবহার করে একটি যৌগিক সূচকে একত্রিত করা হয়। HDI কে জাতীয় নীতি নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। এইখানে প্রশ্নটা মূলত দুটি দেশকে কেন্দ্র করে হতে পারে যাদের মাথাপিছু GNI একই স্তরের কিন্তু তাদের মানব উন্নয়ন ফলাফল একে অপরের থেকে আলাদা, এই বৈপরীত্যগুলি সরকারের নীতি অগ্রাধিকার সম্পর্কে বিতর্ক উদ্দীপিত করতে পারে। HDI মানব উন্নয়ন বলতে আমরা যা বুঝি তা শুধুমাত্র একটি অংশকে সহজ ভাবে তুলে ধরে। এটি বৈষম্য, দারিদ্র্য, মানব নিরাপত্তা, ক্ষমতায়ন ইত্যাদির প্রতিফলন তুলে ধরেনা। HDRO মানব উন্নয়ন, অসমতা, লিঙ্গ বৈষম্য এবং দারিদ্র্যের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রতিনিধিত্ব করে একটা সংযুক্ত সূচক প্রদান করে।

অন্যান্য সূচক যেমন লিঙ্গ বৈষম্য সূচক Gender Inequality Index (GII) এবং মানব স্বাধীনতা সূচক Human Freedom Index (HFI) প্রায় একই ভাবে কাজ করে যেখানে আপেক্ষিক উন্নয়ন স্তরের আরও সঠিক ইঙ্গিত দিতে, ডেটার সেটগুলিকে একত্রিত করা হয়।

১.১.৬ সারাংশ

উন্নয়ন জ্ঞাপন হল মানুষের কাছে উন্নয়ন আনার একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। উন্নয়নকে তথ্য, শিক্ষা,

সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর মধ্যে জ্ঞাপন এবং উন্নয়নে অংশগ্রহণের প্রেরণা হিসাবে ভাবা হয়। উন্নয়ন প্রচেষ্টায় জ্ঞাপনের সংযোগ, পরস্পরকে চেনা এবং জ্ঞাপন ব্যবস্থার অধিগম্যতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে, উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা, বর্তমান উন্নয়ন পরিস্থিতি নিয়ে অসুন্তুষ্টি প্রকাশ, উন্নয়নের দাবি সামনে আনা এবং উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষের অংশগ্রহণকে অনুপ্রাণিত করা হিসাবে ভাবা হয়েছে। একটি বৈচিত্র্যময় উন্নয়ন জ্ঞাপন পন্থা সম্প্রসারণ, বিস্তার, গণমাধ্যম, উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন, এবং উন্নয়ন জ্ঞাপনের কৌশলগুলিকে গুরুত্ব দেয়। এই পন্থাগুলি উন্নয়ন প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী জ্ঞাপন কৌশল বিকাশের পদক্ষেপগুলিকে আরো সহজ করে দেয়। উন্নয়ন আনার ক্ষেত্রে যে কোনো দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে শক্ত করা, পরিবেশগত স্থায়িত্ব আনা এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করা বিশেষ ভাবে দরকার। আমাদের এইটাও মাথায় রাখা উচিত যে যেকোনো দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সূচকগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি দেশে কতটা উন্নয়ন হয়েছে তার ধারণা আমরা সেই দেশের GDP, GNI, GNP, সাক্ষরতার হার, আয়ুষ্কাল এবং মানুষের উন্নয়নের হার দ্বারা পাই।

১.১.৭ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন

টাকা লিখুন

১. উন্নয়ন জ্ঞাপন

২. উন্নয়ন সূচক

৩. গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম (GNI)

৪. গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GDP)

৫. গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট (GNP)

৬. মাথাপিছু GNP

৭. সাক্ষরতার হার

বড় প্রশ্ন

১. উন্নয়ন জ্ঞাপন বলতে আমরা কী বুঝি?

২. উন্নয়ন জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা কী?

৩. উন্নয়নের সামাজিক সূচকগুলি কী?

৪. উন্নয়নের পন্থা বলতে আমরা কী বুঝি?

৫. প্রান্তিক সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কি ভাবে একটি দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ?

১.১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. সারভাইস, জে. (২০০৩). আপপ্রচেস টু ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন. প্যারিস: ইউনেস্কো.

২. ম্যাকফাইল, টি. এল. (সম্পাদিত). (২০০৯). ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন: রিফ্রেমিং দ্য রোল অফ দ্য মিডিয়া. জন বাইলি এন্ড সন্স.

৩. মেলকোট, এস. আর., এন্ড স্টিভস, এইচ. এল. (২০০১). কমিউনিকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন থার্ড ওয়ার্ল: থিওরি এন্ড প্রাকটিস ফর এমপাওয়ারমেন্ট. সেজ.

একক ২ ❑ উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্ত (Dominant Paradigm of Development)

গঠন

১.২.১ উদ্দেশ্য

১.২.২ প্রস্তাবনা

১.২.৩ বৃদ্ধি ও উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য

১.২.৪ উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্ত (**Dominant Paradigm Development**)

১.২.৪.১ আধুনিকীকরণ তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য

১.২.৪.২ লার্নার এবং শ্রামের মতে অনুন্নয়নের কারণ

১.২.৪.৩ মিডিয়া প্রভাবের প্রক্রিয়া

১.২.৫ উন্নয়নের ধারণার উপর প্রধান একাডেমিক ও ঐতিহাসিক প্রভাব

১.২.৫.১ শিল্প বিপ্লব

১.২.৫.২ মূলধন নিবিড় প্রযুক্তি

১.২.৫.৩ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

১.২.৫.৪ পরিমাপ

১.২.৬ উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্তের দৃষ্টিভঙ্গি

১.২.৬.১ ড্যানিয়েল লার্নার

১.২.৬.২ উইলবার শ্রাম

১.২.৬.৩ এভারেট এম রজার্স

১.২.৭ উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্তের সমালোচনা

১.২.৮ সারাংশ

১.২.৯ অনুশীলনী

১.২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১.২.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা উন্নয়ন এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রচলিত তত্ত্ব উন্নয়নের প্রভাবশালী

দৃষ্টান্ত (Dominant Paradigm of Development) সম্পর্কে আলোচনা করবো। উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্ত হল এক প্রস্ত কৌশল, ধারণা এবং বিশ্বাস যা ৬০ এবং ৭০ এর দশকে প্রধানত উন্নয়নের পশ্চিমা মডেল থেকে বিকশিত হয়েছে। যেসব দেশ সেই সময় ঔপনিবেশিক শক্তির কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল, তাদের অনুন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রথম বিশ্বের দেশগুলি, অর্থাৎ যেই দেশগুলি অক্ষ ও মিত্র বাহিনীর লাগাতার আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও পশ্চিম ব্লকের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা এই অনুন্নত দেশগুলিতে উন্নয়নের দৃষ্টান্তে আনার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের প্রতাপ বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং তার জন্য অনেকগুলি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনাও করে। সেই সব বিষয় নিয়েই আমরা এই এককে আলোচনা করবো।

১.২.২ প্রস্তাবনা

১৯৬০ এর দশকের শেষের দিকে, জ্ঞাপন বুদ্ধিজীবীদের উন্নয়ন সম্বন্ধিত আলোচনা ও ধারণাকে প্রভাবিত করে এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীতেও প্রভাব ফেলে। এই উন্নয়নের ধারণার আত্মপ্রকাশ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, যেমন ইউরোপের শিল্প বিপ্লব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা, উত্তর আমেরিকার সামাজিক বিজ্ঞানের পরিমাণগত অভিজ্ঞতাবাদ, এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক/রাজনৈতিক দর্শন, এর ফলে পুষ্ট হয়। এই সময় উন্নয়নের সংজ্ঞা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারের মাপকাঠিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সেই সময় জাতীয় উন্নয়নের স্তর হিসেবে গণ্য করা হতো মোট জাতীয় পণ্য (GNP) বা, মোট জাতির জনসংখ্যা ভাগ করে মাথাপিছু আয়। যদিও মাথাপিছু আয়কে উন্নয়নের প্রধান সূচক হিসাবে দেখতে অনেক বুদ্ধিজীবীরা অস্বস্তি বোধ করেছেন কিন্তু সেই সময় উন্নয়নের বিকল্প পরিমাপ ও সংজ্ঞার প্রবক্তারা সংখ্যায় অনেকটাই কম ছিলেন।

১.২.৩ বৃদ্ধি ও উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য

"বৃদ্ধি" এবং "উন্নয়ন" শব্দ দুটি সাধারণত একই জিনিস বোঝাতে ব্যবহৃত হয় কিন্তু শব্দ দুটি একে অপরের থেকে আলাদা। উন্নয়ন ও বৃদ্ধি, এই দুটি শব্দই মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বা সহজভাবে বললে মাথাপিছু আয় দ্বারা নির্দেশিত হয় আর সেই জন্য মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন এর বৃদ্ধিকে মূলত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে জরুরি মনে করা হয়। ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে "বৃদ্ধি" এবং "উন্নয়ন" অর্থে এক নয়। উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত সমস্যার জটিলতা বুঝতে গেলে, "বৃদ্ধি" এবং "উন্নয়ন" এর মধ্যে পার্থক্য বোঝা দরকার। প্রথমত, "বৃদ্ধি" বলতে মাথাপিছু আয়ে (GDP) বৃদ্ধি বোঝায়, যা বার্ষিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিমাপ করা হয় এবং একটি স্বল্পমেয়াদী ঘটমান বিষয়, কিন্তু "উন্নয়ন" মাথাপিছু আয়ের পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদী দিকগুলিকে বোঝায়। যেহেতু মাথাপিছু আয় একটি "গড়" মাত্র সেই জন্য এর নিছক বৃদ্ধি মানুষের

ভালো হচ্ছে সেটা ইঙ্গিত করে না। আমরা দেখি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জনসংখ্যার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যক লোক অর্থাৎ ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে এবং একটি বড় সংখ্যক লোক অর্থাৎ গরিবদের কোনো লাভ হচ্ছে না। বৃদ্ধির ফলে আয়ের বণ্টন বোঝাটা অবশ্যই জরুরি যদি আমরা সুনির্দিষ্টভাবে সাধারণ উন্নয়নের স্তর সম্পর্কে কথা বলতে চাই।

১.২.৪ উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্ত (Dominant Paradigm of Development)

উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে, উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের জন্য এক নতুন ধারণার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে বেশিরভাগ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উন্নয়নের পশ্চিমা আদর্শগুলির উপর ভিত্তি করে যা ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন এবং প্রযুক্তিগত অভিযোজন এর উপর নির্ভরশীল ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আধুনিকীকরণ তত্ত্ব (Modernisation theory) বা উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্ত (Dominant Paradigm of Development) যা এক প্রকারে বলতে গেলে পশ্চিমের উন্নয়নের আদর্শের প্রতিলিপি করা, যা শিল্পায়ন, মুক্তবাজার ও নগরায়ণের মাধ্যমে উন্নয়নকে বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা, এনজিও, জাতিসংঘ এবং বহুপাক্ষিক সংস্থার মাধ্যমে। ১৯৪১ সালের আটলান্টিক চার্টার এবং ১৯৪৮ সালের মার্শাল প্ল্যান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু উদ্যোগ অনুন্নত দেশগুলির অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে, যাতে তাদের বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প অগ্রগতিতে সাহায্য করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে, মার্শাল প্ল্যান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসএসআর (USSR) এর কমিউনিস্ট আগ্রাসনের মোকাবিলায় একটি রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা হিসাবে সমালোচিত হয়।

১.২.৪.১ আধুনিকীকরণ তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য :

আধুনিকীকরণ তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য হলো :

- শিল্প অর্থনীতির প্রধান চালক। অতএব বিনিয়োগের একটি প্রধান অংশ অবশ্যই শিল্পে যেতে হবে এবং শিল্প তৈরি করার জন্য যা প্রয়োজন তা হল কাঁচামাল, পরিবহন এবং প্রশিক্ষণ।
- আধুনিক সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেমন স্বাস্থ্য এবং শিল্পে আমাদের বেশি করে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন।
- জনশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবার পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা এবং জনগণের কল্যাণ।
- শিল্প থেকে মুনাফা অন্যান্য বিভাগে যেমন কৃষি এবং গ্রামীণ প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে, প্রয়োজনীয় তথ্য গণমাধ্যমের দ্বারা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং মানুষের মধ্যে পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে।

আধুনিকীকরণ পদ্ধতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে নগরায়ণ এবং শিল্পায়নের দ্বারা আধুনিকতা অর্জন করা যাবে। আধুনিকীকরণের তত্ত্বের একটি অর্থনৈতিক-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কারণে, এটি উন্নয়নকে একটি একরৈখিক, বিবর্তনীয় প্রক্রিয়া হিসাবে দেখে এবং অনুন্নয়ন অবস্থাকে বোঝার জন্য একদিকে তথাকথিত গরীব ও ধনী দেশ এবং অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক দেশগুলির লক্ষণীয় পরিমাণগত পার্থক্যকে বোঝার চেষ্টা করে। এই পদ্ধতি উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্ত (Dominant Paradigm of Development) হিসাবেও পরিচিত।

১.২.৪.২ লার্নার এবং শ্রামের মতে অনুন্নয়নের কারণ :

শ্রাম এবং লার্নারের যুক্তি অনুসারে, অনুন্নত দেশগুলির দুর্দশা ও দারিদ্র্য কোনো বাহ্যিক প্রভাবের কারণে হয়নি, তা সে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বা ঔপনিবেশিকই হোক না কেন। এই দেশগুলির সংকট অভ্যন্তরীণ। তারা আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে অনুন্নত দেশগুলির দুর্দশার জন্য তাদের ওখানকার সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত নিয়মাবলীও অনেকাংশে দায়ী। মিডিয়া, তার প্রযুক্তিগত কাঠামো দ্বারা এই দেশগুলির সমস্যা সমাধানে একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

লার্নার এবং শ্রাম উন্নয়নের জন্য চারটি প্রধান সূচক চিহ্নিত করেছিলেন যার মাধ্যমে অন্নুনত দেশগুলি উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। তাদের মতে উন্নয়নের চারটি সূচক হল: ক. শিল্পায়ন খ. সাক্ষরতা গ. জনগণ এবং জনগণের কাছে মিডিয়া এক্সপোজার এবং ঘ. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ।

১.২.৪.৩ মিডিয়া প্রভাবের প্রক্রিয়া

পাওলো ফ্রেয়ারে প্রভাবশালী দৃষ্টান্তের চারটি প্রধান স্তর চিহ্নিত করেছেন। সেই স্তরগুলি হল: a. সাংস্কৃতিক স্তর b. প্রযুক্তিগত স্তর c. রাজনৈতিক স্তর এবং d. অর্থনৈতিক স্তর।

এটি ফ্রেয়ারে দ্বারা প্রণীত উন্নয়নের জন্য যোগাযোগের মডেল যা খুবই আলোচিত হয়েছে। এই প্রভাবশালী দৃষ্টান্তের মডেলটিতে জ্ঞাপন প্রবাহকে একটি উল্লম্ব প্রবাহ হিসাবে দেখা হয় যা সাধারণত কর্তৃত্বের থেকে মানুষজনদের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং তাই আদর্শগত প্রেরণা বা আধিপত্যের সম্ভাবনার সুযোগ এইখানে অনেকটাই বেশি। প্রভাবশালী দৃষ্টান্ত উন্নয়ন মূলত ভোক্তাকরণ এর ধারণার উপর নির্ভরশীল। একটি দেশ যত ভোগ করবে তত বেশি সে উন্নয়নশীল হবে।

সাংস্কৃতিক স্তর - প্রভাবশালী মতাদর্শ অনুযায়ী আধুনিকায়ন জনজীবনে পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলে। দরিদ্র দেশের ব্যক্তিদের সেই জন্য তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করা একান্তই অপরিহার্য। ঐতিহ্যগত বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রাক-আধুনিক দিকগুলিকে সাধারণত আধুনিকতার প্রতিবন্ধক হিসেবে মনে করা হয়। এর পরিবর্তে, উন্নয়নমূলক দৃষ্টান্ত তৃতীয় বিশ্বের নাগরিকদের উদ্ভাবন, প্রযুক্তি এবং পুঁজিবাদের যুক্তি এবং তার সাথে উন্নয়নের সমীকরণকে স্বাগত জানানোর কথা বলে।

টেকনোক্র্যাটিক স্তর - নবজাগরণ যুগের প্রাথমিক সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি একটি স্বাভাবিক টান তৈরি হয়েছিল। প্রভাবশালী দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আমরা দেখি যে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রযুক্তির উপর অনেকটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যুক্তিবাদী মনকে এই দৃষ্টান্তে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে মানব সমাজকে এমন একটি উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে যেখানে বিশ্বাসের পরিবর্তে উৎপাদনশীলতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক স্তর - যে উদারনীতির কথা বলা হয়েছে তা হল পুঁজিবাদের নীতি যা মুক্ত বাজার দাবি করে যেখানে অর্থনৈতিক কৌশলযুক্ত নীতিতে রাষ্ট্রের কোনও হস্তক্ষেপ থাকবে না। এটা মানুষজনদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা নয়, বরঞ্চ এই উদারনীতির ফলে তাদের আরও শক্তিশালী করে তোলা।

অর্থনৈতিক স্তর - এই মডেলের সবচেয়ে কৌতূহলী ব্যাখ্যাটি সম্ভবত অর্থনৈতিক স্তরের এই বিভাগে উন্মোচিত হয়েছে। এই মডেল মুক্ত বাজার নীতির গুণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর অন্ধ বিশ্বাসের কথা বলে, যা যুদ্ধোত্তর বিশ্ব পুঁজিবাদের অন্যতম প্রধান দিক। বিশেষত সরকারকে অর্থনৈতিক স্তরে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা, এবং রাষ্ট্রের এই বিষয়ে অবস্থান নেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া যাতে ব্যক্তিগত শিল্পগুলিতে জাতীয় স্বার্থের জন্য সে কোনো নির্দেশ না দিতে পারে।

১.২.৫ উন্নয়নের ধারণার উপর প্রধান একাডেমিক ও ঐতিহাসিক প্রভাব

১.২.৫.১ শিল্প বিপ্লব :

শিল্প বিপ্লবের অনুষঙ্গী হিসেবে ১৮০০ দশকের শেষের দিকে বিদেশী উপনিবেশ এবং গার্হস্থ্য নগরায়ণ হয়েছিল। মূলত ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সময়ের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এক রকমের ধারণার জন্ম দেয় যার ফলস্বরূপ অনেকেই এই ধরনের বৃদ্ধিকে উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত করেন, বা অন্তত উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে ভাবতে শুরু করেন। সেই জন্য শিল্পায়নকে উন্নয়নের প্রধান পথ হিসেবে দেখা হয় এবং তাই উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদরা কম উন্নত দেশগুলির উন্নয়নের জন্য শিল্পায়ন করার পরামর্শ দেন। শিল্পায়নের কেন্দ্রে ছিল প্রযুক্তি এবং মূলধন, যাকে শ্রমের বিকল্প হিসেবে দেখা হয়। উন্নয়নের এই সহজ সংশ্লেষণ পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার শিল্প বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ফলে একটি মোটামুটি সঠিক পাঠ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে কিন্তু এটিকে পর্যাপ্তভাবে এবং সফলভাবে খুব ভিন্ন রকমের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রয়োগ করা যেতে পারে কি না— যেমন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যেখানে শ্রমের সরবরাহে ঘাটতি নেই- তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিলো।

পশ্চিম দেশগুলিতে উন্নয়ন হিসেবে যা ঘটেছে তা অ-পশ্চিম দেশগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে কাজ করবে এই পরিকল্পনার মধ্যে একটা গলদ আছে। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপীয় দেশগুলি

প্রায়শই উপনিবেশের শোষণের মাধ্যমে, তাদের আর্থ-সামাজিক রূপান্তর ঘটানোয় সহায়তা পেয়ে এসেছে। স্পষ্টতই, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার কোনো উপনিবেশ ছিল না, আর সেই জন্য তাদের উন্নয়নের ধারণা পশ্চিমা দেশগুলি থেকে ভিন্ন হতে পারে।

১.২.৫.২ মূলধন নিবিড় প্রযুক্তি :

উন্নত দেশগুলির কাছে এই ধরনের প্রযুক্তি ছিল। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রযুক্তির পরিমাণ কম ছিল। তাই অনেক বিশেষজ্ঞরাই মনে করেছিলেন যে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রযুক্তি আনলে তারা তুলনামূলকভাবে আরও উন্নত হতে পারবে। এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে বাহ্যিকভাবে আনা উপাদান প্রযুক্তি অনুষঙ্গী করে উপযুক্ত সামাজিক প্রযুক্তিকে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। যখনই কম উন্নত দেশগুলিতে সামাজিক কাঠামো বাস্তবায়িত হয়নি তক্ষনি দেখা গেছে যে তাদের ঐতিহ্যগত চিন্তাধারা, বিশ্বাস এবং সামাজিক মূল্যবোধই তার মূল কারণ। সেই সময় সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার লক্ষ্য ছিল বিশেষ গুণকগুলিকে চিহ্নিত করা যার দ্রুত পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে এবং ঐতিহ্যগত চিন্তাধারার ব্যক্তিদের আধুনিক চিন্তাধারার গন্ডির মধ্যে নিয়ে আসা। বিভিন্ন সরকারি সংস্থার জন্য এইটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে ওঠে আর এই কাজটির জন্য গণমাধ্যমকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

ব্যয়বহুল প্রযুক্তির জন্য অবশ্যই মূলধনের প্রয়োজন ছিল যা জাতীয় সরকার, স্থানীয় উদ্যোক্তা, আন্তর্জাতিক ঋণ প্রদান এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির কার্যক্রমের মাধ্যমে (সাধারণত এদের মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ শিল্পগতভাবে উন্নত দেশগুলি করে থাকে) প্রদান করা হয়ে। ক্রমশ নতুন করে স্বাধীন হওয়া দেশগুলি বুঝতে শুরু করে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন। ঔপনিবেশিকতার অবসান হওয়ার ফলে যে উন্নত দেশগুলির উপর অনুন্নত দেশগুলির আর্থিক নির্ভরতা শেষ হয়ে যাবে সেই ধারণাটা ভুল ছিল যেহুতু আমরা দেখি যে দামি প্রযুক্তি এবং সামরিক অস্ত্র কেনার জন্য তাদের উপর নির্ভরতা দিনে-দিনে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.২.৫.৩ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি :

এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে মানুষ আসলে একটা অর্থনৈতিক প্রাণী, আর তাই সে অর্থনৈতিক প্রণোদকগুলিতে যুক্তিযুক্তভাবে সাড়া দেবে এবং লাভের উদ্দেশ্যে যথাযতভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করবে। সেই সময় অর্থনীতিবিদরা দৃঢ়ভাবে উন্নয়ন কর্মসূচির চালকের আসনে বসে ছিলেন। তারা অনুন্নয়নের সমস্যাকে মূলত অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করেন, যার ফলে একটা ধারণা সৃষ্টি হয়ে যে এই সমস্যাগুলি প্রধানত অর্থনৈতিক সমস্যা আর সেই জন্য প্রকৃতভাবে অর্থনীতিবিদদের সাহায্য নিলেই তার সমাধান হওয়া সম্ভব।

সেই সময় কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা উন্নয়নের চেষ্টা ব্যাপকভাবে এক বৈধ এবং যুক্তিসঙ্গত

উপায়ে দেশের উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণ করার মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় প্রতিটি দেশ ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে একটি জাতীয় উন্নয়ন কমিশন গঠন করে। সাধারণত অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকারদেরকে এই কমিশনগুলিতে নিয়োগ করা হয়েছিল। জাতীয় সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যক্রমকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল যা এই দেশগুলিতে উন্নয়নের নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করেছিল। এই ক্ষেত্রে অনেক সময় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এই ধরনের পরিকল্পনাকারীদের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করতো, যেমন হার্ভার্ড উন্নয়ন উপদেষ্টা গ্রুপ (The Harvard Development Advisory Group) আর বিশ্বব্যাংক (World Bank)।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উন্নয়ন সম্পর্কে এক সামগ্রিক পক্ষপাত চোখে পরে যেখানে আমরা দেখি যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সরকারদের পরিকল্পনা এবং কার্যকারিতা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিলো। এই ধরনের উন্নয়ন দ্বারা স্থানীয় সম্প্রদায়গুলি অবশেষে পরিবর্তিত হতে পারবে বলে মনে করা হয়েছিল। সেই সময় এইটাও ভাবা হয় যে তাদের অগ্রগতি অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল উচ্চ স্তর থেকে আসা তথ্য এবং সম্পদ এর সাহায্যের ওপর। আত্ম-উন্নয়নকে অসম্ভব বলে মনে করা হয়েছিল আর যদি কোনোদিন সেইটা সম্ভবও হয় সেই ক্ষেত্রে তা অনেকটাই ধীর-গতিতে হবে বলে মনে করা হয়েছিল।

সেই সময় কিছু পর্যবেক্ষক বৃদ্ধিকে অসীম বলে মনে করেছিলেন আর যারা উল্লেখ করেছিলেন যে কয়লা, তেল বা অন্য কোন সম্পদের সরবরাহ কিছু বছরের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে তাদের আতঙ্কসৃষ্টিকারী বলে মনে করা হয়েছিল। তাদের এই আতঙ্ককে দূর করার উপায় হিসেবে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যা ভবিষ্যতের অভাবের প্রতিরোধ করতে পারবে। আমরা দেখি যে ১৯৭০ এর দশকের প্রথম দিকে মেডউস এবং অন্যান্য গবেষকরা তাদের বই, দ্য লিমিটস টু গ্রোওথ (The Limits to Growth) (১৯৭২) এ অসীম-বৃদ্ধির উৎসাহীদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন আর আমরা প্রথম বার নো-গ্রোথ প্রবক্তাদের নীতি শুনতে পাই।

১.২.৫.৪ পরিমাপ :

উন্নয়নের প্রধান সূচক হিসেবে মাথাপিছু আয়ের উপর নির্ভরতার একটি কারণ ছিল তার পরিমাপের সরলতা। 'জীবনের মান' এই অভিব্যক্তি ১৯৬০ এর শেষর আগে খুব কমই শোনা গিয়েছিল। সেই জন্য সেই সময় এটা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল, যে যদি উন্নয়নের কোনো মাত্রার মাপ এবং সংখ্যায় পরিমাপ না নেওয়া যায় তাহলে সম্ভবত তার অস্তিত্ব নেই। আর যদি অস্তিত্ব থাকেও তাহলে সেইটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমনটাই মনে হয়েছিল ১৯৭২ সালে হওয়া স্টকহলম কনফারেন্স অন দ্য হিউমান এনভায়রনমেন্ট (Stockholm Conference on the Human Environment) এর আগে পর্যন্ত।

উপরন্তু, উন্নয়নের পরিমাপ বিচার করার ক্ষেত্রে আমরা খুব স্বল্প পরিসরের উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ

দেখতে পাই যা সর্বাধিকভাবে ১০, ২০ বা ২৫ বছরের বেশি নয়। উন্নয়নের পরিমাপ ভাবার ক্ষেত্রে ভারত, চীন, পারস্য এবং মিশর এর মতো পুরোনো সভ্যতা, যাদের একটা সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রয়েছে এবং যাদের দ্বারা সমসাময়িক পশ্চিমা সংস্কৃতির বনিয়াদ তৈরি হয়েছে তাদেরকে ভুলে যাওয়া সহজ নয়। এই ধরনের পুরানো সংস্কৃতিকে মূলত অর্থের দিক থেকে এখন দরিদ্র মনে করা হচ্ছিলো আর যদিও তাদের শৈল্পিক জয় বৃহত্তর পরিমানে ছিল (যা ডলার আর পাউন্ড দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়) সেই ক্ষেত্রেও তাকে উন্নয়ন বলে মনে করা হয়নি।

উত্তর আমেরিকার সামাজিক বিজ্ঞানের প্রবক্তারা, উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিমাপ নির্ধারণের এর পথকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যার মাধ্যমে আমরা উন্নয়ন কি ছিল এবং কি ছিল না সেই সংজ্ঞাটা নির্ধারণ করে থাকি। যদিও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বস্তুগত জিনিস মাপা সম্ভব ছিল কিন্তু মর্যাদা, ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতার মতো মূল্যবোধ মাপা সম্ভব ছিল না। আর তাই পরবর্তীকালে অনেকেই মনে করেছিলেন যে উন্নয়নের অর্থকে সেই সময় অনেকটাই অমানবিক ভাবে দেখা হয়েছিল। প্রকৃতভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ঐক্যকে বিস্তৃত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছিল আর আমরা দেখি কর্তৃত্ববাদী নেতৃত্ব ক্রমবর্ধমানভাবে আবির্ভূত হয় মূলত সামরিক একনায়কতন্ত্রের আকারে। সরকারি স্থিতিশীলতা আনার চেষ্টার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই ব্যক্তি স্বাধীনতাকে পদদলিত করা হয়েছিল।

সেই সময় উন্নয়ন সম্পর্কে যা পরিমাপ করা হয়েছিল তা সাধারণত বৃদ্ধি হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল মূলত মোট পরিমাণ বা মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকের উন্নয়নের নীতিগুলি উন্নয়নের উপকারিতার ক্ষেত্রে সমতার দিকে খুব কম মনোযোগ দিয়েছিলো। তাদের 'বৃদ্ধি-প্রথমে-সমতা-পরে' এই মানসিকতাকে প্রায়ই ট্রিকল-ডাউন তত্ত্ব দ্বারা ন্যায়সঙ্গত দেখানো হয়েছিল- যেখানে মনে করা হয়েছিল যে প্রধান বিভাগগুলি একবার অগ্রসর হলে পিছিয়ে থাকা বিভাগগুলি অগ্রসর হবে ও পরবর্তীকালে সেই সুবিধাগুলি সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যকে, ত্যাগ এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রণোদনা প্রদায়ক হিসেবে মনে করা হয়েছিল। আবার আয়ের বৈষম্যতার ফলে ব্যক্তিদের মধ্যে নিজেদের ও তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা একরকম ভাবে প্রেরণাদায়ক ভূমিকা পালন করবে। যদিও পরবর্তীকালে মূলত ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে আমরা দেখি যে পরিমাপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বন্টনে সাম্যতাকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়েছিল।

১.২.৬ উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্তের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রভাবশালী দৃষ্টান্তে উন্নয়নের পশ্চিমা ধারণাগুলির ক্ষেত্রে যান্ত্রিক অনুকরণের আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং একটি দেশের জাতিগত সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এইখানে গণমাধ্যমকে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

১.২.৬.১ ড্যানিয়েল লার্নার

আধুনিকীকরণের দৃষ্টান্তের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন ড্যানিয়েল লার্নার। তার বই , 'দ্য পাসিং অফ দ্য ট্র্যাডিশনাল সোসাইটি অ্যান্ড মডার্নাইজিং দ্য মিডিল ইস্ট" (১৯৫৮) এ আমরা তার ধারণার একটি অভিব্যক্তি পাই। চিরাচরিত কৃষি সম্প্রদায় থেকে আধুনিক শিল্প সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে তিনি নগরায়ণ, সাক্ষরতা, গণমাধ্যমের প্রভাব এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে পরিবর্তনের চাবিকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। লার্নারের মতে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে উন্নয়ন ব্যর্থ হওয়ার কারণ মূলত মানুষজনের আধুনিক সমাজের নতুন ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা না থাকা এবং একটি পরিবর্তিত এবং "উন্নত" জীবনধারার সাথে কল্পনাপ্রসূতভাবে বোঝাপড়া করার অক্ষমতাকে চিহ্নিত করেছিলেন। এর ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মানুষজন নিয়তিবাদী, অনুৎসাহি এবং পরিবর্তন প্রতিরোধী থেকে যায়। লার্নারের মতে গণমাধ্যম মানুষজনের মধ্যে পরিবর্তন আনার ইচ্ছে ও কৌতূহল জোগাতে পারে।

জনগণের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি এবং বিশ্বাসে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে বেশি করে গণমাধ্যমের ব্যবহার একটি পূর্বশর্ত হিসেবে ধরা হয়েছিল। গণমাধ্যমের দ্বারা আধুনিকীকরণের ধারণাকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলা, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো, এবং আধুনিক সমাজে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা শেখানোই ছিল মূল লক্ষ্য। সেইজন্য মিডিয়াকে মাল্টিপ্লাইয়ের এবং এনহ্যান্সের হিসেবে বিবেচিত করা হয়েছিল। লার্নার বিশ্বাস করেছিলেন মিডিয়ার দ্বারা শ্রোতারা একটি সহানুভূতিশীল অবস্থায় রূপান্তরিত হবে যার ফলে তারা আধুনিকতার ধারণাকে আলিঙ্গন করতে পারবেন। নগরায়ণ এবং সাক্ষরতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ গতিশীলতার গুণক হিসেবে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করবে যার ফলে পরিবর্তনের গ্রহণযোগ্যতার একটি পরিবেশ তৈরি হবে।

১.২.৬.২ উইলবার শ্রাম

উইলবার শ্রাম তার বই, "মাস মিডিয়া এন্ড ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট" (১৯৭৯) এ লার্নার এর চিন্তা কে এগিয়ে নিয়ে যান এবং গণমাধ্যমের দ্বারা "আধুনিককরণের" পক্ষে তার বক্তব্য রাখেন। মিডিয়ার এই ভূমিকাকে তিনি ম্যাজিক মাল্টিপ্লায়ার্স হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শ্রাম এর মতে, গণমাধ্যমের মানুষকে শিক্ষিত করার এবং বোঝানোর ক্ষমতা আছে যা এক সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন রীতিনীতি ও অভ্যাসকে রপ্ত করার ক্ষমতা রাখে। তথ্য প্রবাহে দ্রুততা ও বিস্তীর্ণতা একটি দেশেকে উন্নতির পথে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজতর হয়ে যায় এবং জনগণ নতুন অভ্যাসকে মসৃণ এবং দ্রুতভাবে কার্যকর করার চেষ্টা করে।

১.২.৬.৩ এভারেট এম রজার্স

রজার্স (১৯৬২) এর ডিফিউশন অফ ইনোভেশন এর তত্ত্ব আধুনিকীকরণের দৃষ্টান্তে অর্থনীতির সাথে প্রযুক্তিগত দিকের একটি সংযোগের কথা বলে। এখানে পরিকল্পিত উপায়ে বিস্তার ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়া এবং উদ্ভাবন গ্রহণ করার ক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এইখানে বিস্তার এর প্রক্রিয়ার ফলে আধুনিকীকরণ হওয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে ব্যক্তিদেরকে একটি ঐতিহ্যগত জীবনধারা থেকে আরও প্রযুক্তিগতভাবে এবং উন্নত মানের জীবনধারায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এইখানে গণমাধ্যমের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা আনার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম একটা ভূমিকা পালন করে। তাছাড়াও অনুকূল মনোভাব বিকাশ এবং নতুন কোনো ধারণার অভিযোজন এর ক্ষেত্রে গণমাধ্যম ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

রজার্স এর মডেলে মূলত পাঁচটি পর্যায় রয়েছে— সচেতনতা, আগ্রহ, মূল্যায়ন, বিচার এবং গ্রহণ। যেহুতু এই মডেলটিতে জ্ঞাপন অবহিত "উৎস" থেকে অজ্ঞাত "গ্রাহকের"- কাছে নির্দেশিত হয়, সেই জন্য এই মডেলটিকে শ্রেণিবদ্ধ এবং একমুখী বলে মনে করা হয়। রজার্স পরবর্তীকালে পুনর্বিবেচনা করে এই মডেলটিতে "অংশগ্রহণ" এর উপাদান অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রজার্সের দেওয়া "উন্নয়ন" শব্দটির ব্যাখ্যা সাম্য, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির প্রকাশের ধারণাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল যার ফলে পরবর্তীকালে সামাজিক বিজ্ঞান শাখার বিশেষজ্ঞদের কাছে এটি গ্রহণযোগ্যতা পায়।

১.২.৭ উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্তের সমালোচনা

উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্ত উন্নয়নের প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক দিককে বেশি প্রাধান্য এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে অবমূল্যায়ন মনে করার জন্য সমালোচিত হয়েছে। এ ছাড়াও মানবাধিকার, পরিবেশ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ সম্বন্ধে নীরবতা পালন করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্তের তিরস্কার করা হয়েছে। প্রভাবশালী দৃষ্টান্তে মিডিয়ার প্ররোচনামূলক শক্তি, এবং জনগণকে উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণাগুলি গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য মিডিয়ার ব্যবহারকে খুব প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রভাবশালী দৃষ্টান্তের প্ররোচনার পক্ষ নেওয়া এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও তাদের ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করা খুবই সমালোচিত হয়েছে। একাধিক পণ্ডিতের মতে এই দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য উদ্ভাবন, ধারণা এবং মানে মূলত পশ্চিমা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করানো এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির অভ্যন্তরীণ শক্তিকে অবমূল্যায়ন মনে করানোর দিকে ইঙ্গিত দেয়। উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্ত আরও সমালোচিত হয়ে যখন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও বৈষম্য কমাতেও এই ধারণা ব্যর্থ হয়ে।

অনেক বিদ্বানরা মনে করেন যে এই দৃষ্টান্তের ফলে উন্নয়নের নামে বড় আকারের স্থানচ্যুতি এবং পরিবেশগত অধঃপতন হয়েছিল।

জ্যান সারভাইস (Jan Servaes) (১৯৮৬) এর মতে আধুনিকীকরণ দৃষ্টান্তের অন্তর্নিহিত যে "ঐতিহ্য" এবং "আধুনিক" এর দ্বিধাবিভক্তি আছে তা এই দৃষ্টান্তকে একরৈখিক করে তুলেছে। এই দৃষ্টান্তের সীমাবদ্ধতা লুকিয়ে আছে শুধু অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ফলে উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়ার মধ্যে। "বৃদ্ধি"কে প্রগতির ধারণা হিসেবে চিহ্নিত করা এবং সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক মনোভাব, জাতীয়তা, ঐতিহ্যগত শক্তি কে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে এই দৃষ্টান্ত যথেষ্ট সমালোচিত হয়। এই দৃষ্টান্তের সীমাবদ্ধতা এই ধারণার প্রবর্তক রজার্স ও লার্নারও তুলে ধরেন এবং পরবর্তীকালে ব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে জ্ঞাপনের কৌশলগুলি বিকশিত করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১.২.৮ সারাংশ

উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্ত শিল্প, অর্থনীতি, নগরায়ণ এবং গণমাধ্যমকে প্রাধান্য দিয়েছিলো। উন্নত দেশগুলি অনুন্নত দেশগুলিতে পরিবর্তন তক্ষনি আনতে পারবে যখন অনুন্নত দেশগুলি তাদের ঐতিহ্যবাদী মনোভাবকে পিছনে রেখে পাশ্চাত্য ধারণাগুলোকে গ্রহণ করবে। ড্যানিয়েল লার্নার, উইলবার শ্রাম, এভারেট রজার্সরা এই ধারণার প্রবক্তা ছিলেন। উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্তের আভির্ভাবের ফলে সমাজ বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন যে তারা উন্নয়নের প্রকৃতি এবং উন্নয়নে জ্ঞাপনের ভূমিকা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা বুঝতে পারেন যে তাদের উন্নয়নের ধারণা অত্যন্ত সীমিত এবং সম্ভবত সম্পূর্ণ সঠিক নয়। আজ আমরা বুঝতে পেরেছি যে সেই অতীত ধারণাগুলি সমসাময়িক দৃশ্যের বাস্তবতা এবং সম্ভাবনার সাথে পুরোপুরি খাপ খায় না। সেই জন্য পরবর্তীকালে আমরা দেখি যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে জ্ঞাপন ব্যবহারের একটি বিকল্প ধারণা সৃষ্টি হয় যা উন্নয়নের নতুন ধারণার মধ্যে- স্ব-উন্নয়ন, জ্ঞাপনের প্রভাবের ক্ষেত্রে বৈষমতা খুঁজে বার করা, এবং নতুন জ্ঞাপন প্রযুক্তির আবির্ভাবকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলে।

১.২.৯ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন

১. উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্ত কী ?

২. টেকনোক্র্যাটিক স্তর কী ?

৩. মূলধন নিবিড় প্রযুক্তি কী ?

৪. ড্যানিয়েল লার্নার সম্পর্কে লিখুন।

৫. উইলবার শ্রাম সম্পর্কে লিখুন।

৬. বৃদ্ধি ও উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্যগুলি কি ?

বড় প্রশ্ন

১. লার্নারের আধুনিকীকরণ তত্ত্বের মূল উপাদানগুলি কী?

২. উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্তে কিসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে?

৩. উন্নয়নের ধারণা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিল্প বিপ্লবের ভূমিকা কী?

৪. উন্নয়নের প্রভাবশালী দৃষ্টান্ত কেন সমালোচিত হয়েছিল?

১.২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. মেলকোট, এস. আর., এন্ড স্টিভস, এইচ. এল. (২০০১). কমিউনিকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন থার্ড ওয়ার্ল: থিওরি এন্ড প্রাকটিস ফর এমপাওয়ারমেন্ট. সেজ.

২. হ্যানসন, জে., এন্ড নারুলা, ইউ. (২০১৩). নিউ কমিউনিকেশন টেকনোলজিস ইন ডেভেলপিং কান্টিস. রুটলেজ.

৩. রজার্স, ই. এম. (১৯৭৬). কমিউনিকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট: দ্য পাসিং অফ দ্য ডোমিনান্ট প্যারাডাইম। কমিউনিকেশন রিসার্চ, ৩(২), ২১৩-২৪০.

৪. ম্যাকফাইল, টি. এল. (২০০৯). ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন : রিফ্রেমিং দ্য রোলে অফ দ্য মিডিয়া। জন উইলি এন্ড সন্স.

একক ৩ ❑ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্ষেত্র ও সুযোগ-উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের আইওয়া মডেল (IOWA MODEL)

গঠন

১.৩.১ উদ্দেশ্য

১.৩.২ প্রস্তাবনা

১.৩.৩ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের উৎপত্তি

১.৩.৪ উন্নয়ন সহযোগ জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে হেটারোফিলি গ্যাপ

১.৩.৫ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্ষেত্র

১.৩.৫.১. সামাজিক উন্নয়ন

১.৩.৫.২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

১.৩.৫.৩. রাজনৈতিক উন্নয়ন

১.৩.৬ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের সাধনী

১.৩.৭ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্যাম্পেইন

১.৩.৭.১ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্যাম্পেইনের পর্যায়

১.৩.৮ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের সুযোগ

১.৩.৯ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের আইওয়া মডেল (**IOWA MODEL**)

১.৩.১০ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন উন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সম্পদ

১.৩.১০.১ জ্ঞাপন পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ ও উন্নতি

১.৩.১০.২ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে জাতীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

১.৩.১০.৩ জাতীয় তথ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ বা পুনঃপ্রশিক্ষণ

১.৩.১০.৪ সিস্টেম এবং সম্পদের প্রয়োগ

১.৩.১১ উপসংহার

১.৩.১২ সারাংশ

১.৩.১৩ অনুশীলনী

১.৩.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১.৩.১ উদ্দেশ্য

ভারত এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে যে শুধুমাত্র অধিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই ভাল ফলাফল পাওয়াটাই যে প্রয়োজনীয় তা কিন্তু নয়, বরং অবস্থিত কাঠামোকে নতুন ছাঁচে, নতুন করে সাজানো খুবই প্রয়োজনীয় যাতে তারা কার্যকরীভাবে বৃহত্তর জনগণেকে সামাজিক মানগুলির সম্বন্ধে অবহিত করতে পারে। এই ধরনের পন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে এইটা বোঝা জরুরি যে যান্ত্রিকতা এবং পরিণামবাদী বার্তা তৈরির পরিবর্তে মানুষকেন্দ্রিক তৈরি করা প্রয়োজনীয়। এইখানে উন্নয়ন জ্ঞাপনের কাজ শুধুমাত্র উন্নয়নকে সমর্থন করা। এই প্রক্রিয়াটি জনগণের আশা-আকাঙ্খা উত্থাপনের লক্ষ্যে ক্রমাগত এবং ধারাবাহিকভাবে লেগে থাকবে যাতে তাদের উন্নতির ক্ষেত্রে সাহায্য হতে পারে। উন্নয়ন-সহায়ক জ্ঞাপন মানুষদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে সামাজিক চেতনা বাড়ানোর চেষ্টা করে। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের উৎপত্তি উন্নয়নশীল দেশের কৃষি সম্প্রসারণের কাজের সঙ্গে যুক্ত হলেও পরবর্তীকালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার কল্যাণ কর্মসূচির জন্য ও ব্যবহার করা হয়েছে। এই এককে আমরা উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের উৎপত্তি, তার ক্ষেত্র, তার ক্যাম্পেইন তৈরি করার পর্যায় ও তার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবো।

১.৩.২ প্রস্তাবনা

উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের উৎপত্তি বর্তমান শতাব্দীর, পঞ্চাশের দশকে, অনেক উন্নয়নশীল দেশের কৃষি সম্প্রসারণের সময় থেকে শুরু হয়েছিল। ১৯৪২ সালে রায়ান ও ক্রসের হাইব্রিড ভুট্টার বিস্তার সম্পর্কে গবেষণা, চাষ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সামনে আনে। কৃষি বিজ্ঞানের একটি অংশ হিসাবে, কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা, একটি বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে প্রসারিত হয় যার দ্বারা আধুনিক কৃষি পদ্ধতির তত্ত্ব এবং অনুশীলনের বিকাশ ঘটেছিলো। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, যদিও, একটি বড় জনসংখ্যার সিংহভাগই কৃষিকাজে নিয়োজিত, তা সত্বেও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হতে পারেনি, যেহেতু তারা চাষের ক্ষেত্রে শুধু জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতি অবলম্বন করে এসেছে। ভারতবর্ষে মাটি চাষের ঐতিহ্যগত পদ্ধতির সঙ্গে বর্ষাকালের উপর নির্ভরশীলতা চাষের ক্ষেত্রে খুবই প্রচলিত। সেই জন্য এই কৃষকদের তাদের কৃষি পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এইখানে উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের মাধ্যমে কৃষি সম্বন্ধিত উদ্ভাবন, নতুন ধারণা, অনুশীলন এবং প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হয়, যা ১৯৫০ এর দশকে ভারতবর্ষে খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো।

কৃষি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জ্ঞাপনের কৌশল এবং পদ্ধতির ব্যাপক নির্ভরতার পরিপ্রেক্ষিতে, যথাক্রমে, কৃষি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জ্ঞাপনের প্রয়োগ, কৃষি জ্ঞাপন হিসাবে পরিচিতি পায়। এই সময় উন্নয়ন জ্ঞাপন, জ্ঞাপনের একটি বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে, স্বীকৃতি পায় এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

উন্নয়ন জ্ঞাপন ধীরে-ধীরে গ্রামীণ জ্ঞাপনের দিকে এগোতে থাকে যেখানে আমরা দেখি যে কৃষি সম্প্রসারণের বিশেষজ্ঞরা (যাদের জ্ঞাপন নীতি সম্বন্ধে অশেষ জ্ঞান ছিল) স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি, স্যানিটেশন ইত্যাদি নিয়ে মানুষজনের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করছে। আবার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শহরের দিকে থাকা বস্তি এলাকার বসবাসকারী মানুষজনের মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছিলো। এইভাবে জ্ঞাপন তত্ত্ব এবং অনুশীলন জ্ঞাপন বিকাশ প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে সহায়তা করেছিল এবং উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন (development support communication) (DSC) নামের একটি শাখা তৈরি হয়েছিল।

উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ধারণা UNDP (United Nations Development Programme) এবং জাতিসংঘের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন FAO (Food and Agriculture Organization) UNICEF (United Nations Children Fund) দ্বারা জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশ্বব্যাংকও উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনকে সহায়তা করেছিল। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন সমস্ত সংস্থা যারা পরিকল্পিত উন্নয়ন কাজের সাথে জড়িত, যেমন রাজনৈতিক কার্যনির্বাহক, নীতি পরিকল্পনাবিদ, উন্নয়ন প্রশাসক, বিষয় বিশেষজ্ঞ, ক্ষেত্র সমীক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তি, মতামত গঠনকারী, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, গবেষক এবং তথ্য ভোক্তাদের সংযুক্ত করে উন্নয়নমূলক কাজ করে। এইভাবে, জ্ঞাপনের রাস্তা কেবলমাত্র উপর থেকে নীচে এবং নীচ থেকে উপরের দিকে না গিয়ে অনেকটাই সমতলভাবে চলে, যেখানে আমরা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগের গুরুত্ব দেখি।

গবেষক জন এল. উডস (১৯৭৬) উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনকে ত্রিভুজাকারে কল্পনা করেছেন যেখানে উনি তিনটি উপাদানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই তিনটি উপাদান হলো: জ্ঞান উৎপাদক (Knowledge generators), রাজনৈতিক নেতা (political leaders) এবং উন্নয়ন জ্ঞান ব্যবহারকারী (development knowledge users)।

উডসের মতে, উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের কাজ হল এই তিনটি উপাদানকে অন্তর্বর্তী ব্যবহারকারী গোষ্ঠীর (intermediate user groups) সঙ্গে উন্নয়ন সংযোগ ত্রিভুজে সংযুক্ত করা। উডস শুধু কিছু নির্দিষ্ট দর্শকদের দিকে তথ্য এগিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং তিনি বিশ্বাস করতেন যে নির্দিষ্ট দর্শকের তথ্য চাওয়ার ক্ষমতাকেও উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

১.৩.৩ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের উৎপত্তি

উন্নয়ন-সহায়ক জ্ঞাপনের ধারণার ক্ষেত্রে উন্নয়ন শব্দটির অর্থ এবং তার পরিধি বোঝা প্রয়োজন। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছিলো, এবং উন্নয়নকে জিএনপি (GNP) এবং মাথাপিছু আয়ের (per capita income) মতো পরিমাপযোগ্য সূচক দ্বারা মাপা হতো। পরবর্তীকালে লার্নার (১৯৫৮), পাই (১৯৬৩), এবং শ্রাম (১৯৬৪) এর মতো জ্ঞাপন বিশেষজ্ঞরা

গণমাধ্যমের গুরুত্বকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাড়িয়ে তোলার কথা বলেন।

উন্নয়ন কর্মসূচীর মৌলিক উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হলো কারিগরি জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে যে ব্যক্তিদের সেই জ্ঞান নেই তাদের সংযোগ তৈরি করা। উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য ICT (Information and Communication Technology) ব্যবহৃত হয়। প্রযুক্তিগত বদল ও পৰিবর্তন এর সঙ্গেই যে সাফল্য আসে তা কিন্তু নয়, উন্নয়ন কর্মসূচি সফল করার ক্ষেত্রে এটিকে অনুশীলনের মাধ্যমে স্থাপন করা উচিত।

উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন (DSC) সমস্ত উপলব্ধ সম্পদ ব্যবহার করে যাতে তথ্য আদানপ্রদান করা যায়। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের সাফল্যের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমে জ্ঞাপন করা প্রয়োজন অর্থাৎ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের সাফল্য শুধুমাত্র গণমাধ্যম ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল না বরং অনেক অনানুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ যেমন সমিতি, মিটিং, ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল, যেহেতু এখানে মানুষ জড়ো হয়। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের সাফল্য আবার পদ্ধতিগত, ক্রমাগত, পরিকল্পিত, সমন্বিতভাবে তথ্যের অবদানের উপরেও নির্ভরশীল। এইখানে পরিবেশের বিশ্লেষণ এর সঙ্গে দক্ষতা এবং সম্পদের পরীক্ষা করা প্রয়োজন যাতে পদ্ধতিগত তথ্যের প্রবাহে কোনো অসুবিধে না হয়।

ডিফিউশন অফ ইনোভেশন এর ধারণার উপর ভিত্তি করে রজার্স এবং সুমাকের (১৯৭১) উন্নয়নকে "এক ধরনের সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে যেখানে মাথাপিছু বেশি উপার্জন এবং জীবনযাত্রার স্তর উন্নত করার জন্য আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন এবং উন্নত সামাজিক সংগঠন তৈরি করা প্রয়োজন। কিন্তু, ৭০ এর দশকে, এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই ধরনের একটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের একটি ফলপ্রসূ ফলাফল প্রদান করতে ব্যর্থ হচ্ছে। মূলধন প্রতি আয়ের বৃদ্ধির ফলে সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানবজীবন কিন্তু সমৃদ্ধ হয়নি। বেকারত্বের সমস্যা বেড়ে গেছে এবং গরিবরা আরও দরিদ্র এবং বড়োলোকেরা আরও ধনী হয়ে উঠেছে। ট্রিকল ডাউন তত্ত্বের প্রভাব কার্যকরী হয়নি এবং সেই জন্য ১৯৭৬ সালে, রজার্স তার উন্নয়নের সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনলেন। উনি বললেন যে 'উন্নয়ন হল সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের একটি ব্যাপক অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া, যা বেশির ভাগ মানুষের জন্য বৃহত্তর ন্যায়, স্বাধীনতা এবং তাদের মূল্যবান গুণাবলীকে বাড়িয়ে তোলে যার ফলে তারা পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারে।'

উন্নয়নের এই দ্বিতীয় পন্থা, যা উন্নয়নের নতুন দৃষ্টান্ত হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো তা অধিষ্ঠিত আয় বন্টন, বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা, শ্রম নিবিড় প্রযুক্তি এবং উন্নয়নের বহু দেশীয় ও বহিরাগত কারণগুলিকে তুলে ধরেছিলো। এই নতুন পন্থার আদর্শগুলির মধ্যে উপযুক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং প্রচার করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণকে বাড়িয়ে তোলা উচিত। উন্নয়নের অর্থের এই পরিবর্তনের সাথে জ্ঞাপনের অর্থের একটি পুনঃসংজ্ঞা জড়িত ছিল। পুরানো, রৈখিক, যান্ত্রিক একমুখী

জ্ঞাপন মডেল যেটি বেশি করে সূত্র অর্থাৎ জ্ঞাপনকারীর উপর গুরুত্ব দিয়েছিলো সেটি আরো গতিশীল ইন্টারেক্টিভ দ্বি-মুখী জ্ঞাপনের মডেল হয়ে উঠলো। এই নতুন পদ্ধতির কেন্দ্রে ছিল প্রাপক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা।

উন্নয়নের আরেকটি পদ্ধতি যা পরবর্তীকালে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এর কারণ এই পন্থায় উন্নয়ন জ্ঞাপনের মৌলিক নীতি ছিল আত্ম-নির্ভরশীলতা। এই নীতির সমর্থকরা কৃষি নির্ভরশীল সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, স্থানীয় সম্পদের কার্যক্রম ব্যবহার, মৌলিক চাহিদার পূর্তি, পরিবেশগত ভারসাম্যের রক্ষণাবেক্ষণ, এবং উন্নয়নের মধ্যস্থতাকারী শক্তি হিসাবে সংস্কৃতিকে একীভূত করাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেছিলো। উন্নয়নের এই পদ্ধতিটি উন্নয়নশীল দেশগুলির 'পশ্চিমের মতো হওয়ার' প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করেছিল। তার পরিবর্তে, এটি একটি সংস্কৃতি-নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করার কথা বলেছিলো যেখানে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে উন্নয়নশীল দেশগুলি বিষয়গুলি নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে পারবে এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবে। এই পদ্ধতিটি প্রাথমিকভাবে গালতুং (১৯৯০)প্রচার করেছিলেন।

১.৩.৪ উন্নয়ন সহযোগ জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে হেটারোফিলি গ্যাপ

একটা সময় উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মানুষজনের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু তা অনেক সময়ই বাস্তবায়িত হয়নি যেহেতু পরিবর্তনের প্রতিনিধিদের মধ্যে (এক্সটেনশন কর্মী) এবং পরিবর্তনের প্রাপকদের মধ্যে (ছোট কৃষকের পরিবার) একটা দুরুত্ব তৈরি হয়েছিল যার কারণ হিসেবে হেটেরোফিলি গ্যাপকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। জ্ঞাপন বিশেষজ্ঞ, যেমন রজার্স (১৯৬৯, ১৯৮৩) এবং বারলো (১৯৬০) ইঙ্গিত দিয়েছেন যে মানুষের জ্ঞাপন সবচেয়ে কার্যকরী হয় যখন জ্ঞাপন পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত দুই ব্যক্তি বা দল একই রকমের চিন্তাভাবনা করে।

রজার্সের (১৯৮৩) মতে হোমোফিলি হল এমন একটি মাত্রা যার অনুপাতে ব্যক্তিরা একেঅপরের সঙ্গে আলোচনা করে। এই আলোচনা অনেক ক্ষেত্রে কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে যেমন বিশ্বাস, শিক্ষা এবং সামাজিক মর্যাদা। বারলো (১৯৬০) তার সোর্স-মেসেজ-চ্যানেল-রিসীভর (SMCR) মডেলে আরও বিস্তারিত ভাবে এই নিয়ে আলোচনা করেছেন।

SMCR মডেলটিতে জ্ঞাপন প্রক্রিয়াটি একটি উৎস দিয়ে শুরু হয় যার কাছে ধারণা বা তথ্য রয়েছে যেটা সে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিতে চায়। এই ধারণা সমুহ একটি বার্তায়ে রূপান্তরিত করা হয় এবং তারপরে তা একটি মাধ্যমের দ্বারা রিসিভারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। বারলো জ্ঞাপনকারীর কার্যকারিতা এবং বিশ্বস্ততার দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। বারলোর মতে জ্ঞাপনের বিশ্বস্ততা মূলত জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি কারণ যা জ্ঞাপনের কার্যকারিতা নির্ধারণ করে তাকে বিচ্ছিন্ন করার উপর নির্ভরশীল। বারলোর SMCR মডেল উৎস এবং গ্রহণকারীর বৈশিষ্ট্যগুলিকে (যা জ্ঞাপন বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে

পারে) বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করেন। উৎস ও প্রাপকের মধ্যে যত বেশি বৈশিষ্টের মিল থাকবে জ্ঞাপন ব্যবস্থা ততটা বেশি কার্যকরী হবে। কৃষি এক্সটেনশন কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সমস্যা হল যে তারা যাদের সেবা করার কাজে নিযুক্ত তাদের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জ্ঞাপন দক্ষতা এবং জ্ঞানের মাত্রা অনেকটাই ভিন্ন।

রজার্স (১৯৮৩) ব্যাখ্যা করেছেন যে বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে, পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিনিধিরা, যাদের সেবা করার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে, তারা অনেকটাই বেশি দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হলেও তাদের মধ্যে একটা ভাষাগত দুরুত্ব তৈরি হয়েছে যার ফলে তাদের জ্ঞাপন কার্যকরী হচ্ছে না। এর ফলে একটা হেটেরোফিলি (heterophily) তৈরি হচ্ছে। এইটা যতক্ষণ না দূর হবে ততক্ষন উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন কার্যকরী হবেনা। এই দূরত্ব কমানোর ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণের চাহিদা এবং সমস্যাগুলি আবিষ্কার করা প্রয়োজন এবং তার সঙ্গে তাদেরকে অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজনীয়। এই ক্ষেত্রে পেশাদার জ্ঞাপনকারীদের কাজের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। সেই জন্য তৃতীয় বিশ্বের গ্রামীণ উন্নয়নে প্রশিক্ষিত পেশাদার জ্ঞাপনকারীদের প্রয়োজনীয়তা আছে। যদিও অনেক কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীরা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে কিন্তু তাদের জ্ঞাপন দক্ষতা সেটা কার্যকরী করতে সক্ষম হচ্ছেনা। এই কারণে, এক্সটেনশন শ্রমিকরা সাধারণত তাদের জ্ঞাপনের জ্ঞানের তুলনায় কৃষি ক্ষেত্রের জ্ঞান সম্বন্ধে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, যার ফলে তারা নিজেদেরকে প্রকৃতপক্ষে, প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ হিসাবে চিহ্নিত করে এবং নিজেদের জ্ঞান কৃষকদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে তারা কোনোমতেই সাধারণ জ্ঞাপন কৌশলবিদ নয়। মেলকোট (১৯৮৪) এর মতে এরা মূলত দেখানো এবং বলার জন্য প্রশিক্ষিত। তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতার অভাব রয়েছে, যার ফলে তারা তাদের জ্ঞাপন দক্ষতাকে বাড়ানো এবং সচিত্র করে তোলার প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করতে পারে না।

১৯৭০ এর দশকের গোড়ার দিকে বেশ কিছু জ্ঞাপন বিশেষজ্ঞরা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ উন্নয়নের মূল সমস্যাগুলিকে উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের আওতায় ফেলে আলোচনা করেছে। বলা হয় এর্সকিন চিলডর্স (১৯৭৬), যিনি একসময় ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের তথ্য পরিচালক ছিলেন, তিনি প্রথমবার ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট কমিউনিকেশন শব্দটি ব্যবহার করেন। ওনার মতে উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নের একটি শৃঙ্খলা যেখানে উন্নয়ন প্রকল্প এবং তাদের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে মানুষের আচরণগত কারণগুলিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

হেলি পেরেট (১৯৮২), যিনি একসময় বিশ্ব ব্যাংকের যোগাযোগ পরামর্শদাতা ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের প্রধান কাজ হলো এমন একটি মানব পরিবেশ তৈরি করা যা একটি উন্নয়ন প্রকল্প বা প্রোগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয়। এই ধরনের কাজ তথ্য প্রদান করে, অনুপ্রেরণা এবং শিক্ষা কার্যক্রম তৈরি করে যা পরিবর্তন আনার জন্য প্রয়োজনীয় এবং যা স্থানীয় মানুষের আগ্রহ বা প্রকল্পের প্রতি উদাসীনতা বা তাদের জ্ঞানের প্রতি অজ্ঞতা বা গ্রহণের বিরোধিতাকে সক্রিয়ভাবে বদলে দিতে পারে।

যদিও DSC-র ধারণাটি ১৯৬০ এর দশকের শেষের দিক থেকে বিদ্যমান ছিল কিন্তু দেখা যায় যে ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে শিক্ষাদান ও গবেষণায় উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও কানাডা ও ফিলিপিনের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষভাবে এর ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু হয়। প্রকল্পগুলিতে জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ কর্মী এবং DSC-র পেশাদার কর্মীদের মধ্যে একটা জ্ঞাপন স্থাপন করার চেষ্টা চলে।

সেই জন্য ১৯৮৭ সালে রোমে FAO দ্বারা আয়োজিত একটি পরামর্শমূলক সেমিনারে সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞ এবং উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের বিশেষজ্ঞরা সম্মত হয়েছিলেন যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে জ্ঞাপন বিস্তৃত, যার সফল বাস্তবায়নের জন্য কৃষি জ্ঞানের থেকেও বেশি জ্ঞাপনের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এখানকার সদস্যরা আরও উল্লেখ করেছিলেন যে উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন, শুধু পরিবর্তন প্রতিনিধিদের সঙ্গে গ্রামীণ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে প্রতিস্থাপন করে না বরং কৌশল, অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রযোজনা এবং গণমাধ্যম উপস্থাপনার মাধ্যমে এক্সটেনশন বার্তার মান ও প্রভাব বৃদ্ধি করে, যার ফলে জ্ঞাপনের কৌশলগুলি আরো সমৃদ্ধ হতে পারে। এটা সম্প্রসারণ কর্মী বা অন্য ক্ষেত্র উন্নয়ন এজেন্টের কাছ থেকে দায়িত্ব নিয়ে হয় না বরং তাদেরকে উন্নয়ন কৌশল ও কার্যক্রম প্রণয়নে সাহায্য করে, এবং একটি জ্ঞাপন পরিবেশ তৈরি করে হয়, যেখানে ক্ষেত্র উন্নয়ন এজেন্টরা ভালোভাবে কাজ করতে পারে।

সম্মেলন থেকে প্রাপ্ত FAO নীতি নথি, DSC-র প্রকল্পের ভূমিকাকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিল- অংশগ্রহণ এবং গতিশীলতা প্রচার করা - জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে, মানুষ গ্রহণযোগ্যতা, অভিযোজন এমনকি উদ্ভাবনকে প্রত্যাখ্যান করার মতন বিষয়ে সচেতন সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাদের নিজস্ব উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে।

বার্তা উৎপাদন - এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশগ্রহণকারীদের জন্য জ্ঞানের উপস্থাপনা- যা প্রযুক্তিগত, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহ্যগত হতে পারে- পেশ করা নিয়ে ভাবা হয়।

সমন্বয় এবং সংযোগ - জ্ঞাপন নিশ্চিত করে যে মানুষ তথ্যগতভাবে একে অপরের সাথে সংযুক্ত- যেমন পরামর্শ এবং তথ্যের উৎসগুলির সাথে, শিক্ষা এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ও বাইরে অনুভূমিক এবং উল্লম্ব জ্ঞাপন ব্যবস্থার প্রচার করা।

নির্দেশ ও প্রশিক্ষণ - স্থানীয় জ্ঞাপন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া মূলত তাদের পেশার নীতি এবং অনুশীলন সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি; সম্প্রসারণ কর্মীদের অডিও-ভিজ্যুয়াল টুল ব্যবহারের কৌশল সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং উন্নয়নশীল ও উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতি প্রদান করা যা উন্নয়ন কর্মী ও গ্রামীণ জনগণ উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুবিধা প্রদান করবে।

১.৩.৫ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্ষেত্র

উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন তিনটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কাজ করে- সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক।

১.৩.৫.১. সামাজিক উন্নয়ন

সামাজিক উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার ফলে সমাজ কাঠামোর বিপ্লব ঘটে যা সমাজকে তার লক্ষ্য পূরণের জন্য একটি পদ্ধতি প্রদান করে। এটি সাধারণত সমাজের উন্নতির জন্য প্রয়োগ করা হয় যাতে সমাজের অবহিত অনিশ্চিত জীবনধারাকে সরিয়ে রেখে একটি ইতিবাচক জীবনধারার দিকে প্রবেশ করা যেতে পারে।

১.৩.৫.২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

একটি সংগঠনের দক্ষতা ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন খুবই প্রয়োজনীয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে IC-র ব্যবহার দেশের সম্পদ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তথ্য ও জ্ঞাপন প্রযুক্তি দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে, যা বৃহত্তর সুযোগের দিকে মানুষকে পরিচালিত করতে পারে বিশেষত ডিজিটাল মাধ্যমের সুযোগ যার ফলে মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক মানের উন্নতি হতে পারে।

১.৩.৫.৩. রাজনৈতিক উন্নয়ন

তথ্য ও জ্ঞাপন প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষকে ডিজিটাল সুযোগ প্রদান করে যার ফলে উদ্যোগের বৃদ্ধি হয় এবং তথ্যের কাছে পৌঁছনো আরো সহজ হয়ে যায়। এটি আরও ভাল করে সরকারি সিদ্ধান্ত এবং একটি তথ্য সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হচ্ছে যেহেতু তার তথ্য সংগ্রহ, সঞ্চয় এবং প্রেরণ করার ক্ষমতা রয়েছে।

১.৩.৬ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের সাধনী

এখন পর্যন্ত রেডিও, টেলিভিশন ও প্রিন্ট এর মতো প্রথাগত গণমাধ্যম, মানুষের কাছে তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে, ডিজিটাল জ্ঞাপন মাধ্যমগুলির বিবর্তনের (যার ফলে কম্পিউটারের সঙ্গে স্যাটেলাইট এবং টেলিকমিউনিকেশনের কনভারজেন্স হয়েছে) জন্য জ্ঞাপন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে যার ফলে তথ্য বিনিময় এর গতি বৃদ্ধি পেয়েছে যা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সংযুক্ত করেছে। দেশে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বৃদ্ধির কারণে, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স বা ই-গভর্নেন্স মৌলিক স্তরে সরকার-সম্পর্কিত সেবা প্রদানের জন্য IC-র ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন নীতি সম্বন্ধিত তথ্য আদান-প্রদানের কাজ করে যা সরকার-নাগরিক সম্পর্ককে উপকৃত করে।

১.৩.৭ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্যাম্পেইন

উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের মূল লক্ষ্য হলো পারস্পরিক বোঝাপড়া অর্জন করা যাতে ভালোভাবে উন্নয়ন হতে পারে। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের সাথে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রাথমিক ধাপ হিসেবে প্রয়োজনীয়।

উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্যাম্পেইন ভাবার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত লোকেদের সাহায্য প্রয়োজনীয় :

১. পরিকল্পনাকারী : উন্নয়ন বিষয়সূচি পরিকল্পনার জন্য একজন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে উন্নয়নের যথাযথ লক্ষ্য এবং ভূমিকার ক্ষেত্রে বোধগম্য ডেটা ও তথ্য তৈরি করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনাকারীদের বড় অবদান রয়েছে।

২. প্রাপক : প্রাপক এমন একজন ব্যক্তি যিনি উন্নয়ন আলোচ্যসূচি এবং এর সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হন। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন তার প্রাপকদের জন্য সুযোগ প্রদান করে যাতে উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত হতে পারে।

৩. বাস্তবায়নকারী : প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একজন ব্যক্তির প্রয়োজন। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন নিশ্চিত করে যে তাদের সম্প্রদায় যাতে উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাফল্য বা সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ক্রমাগত সচেতন থাকে।

১.৩.৭.১ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্যাম্পেইনের পর্যায়

উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের প্রচারাভিযান তিনটি পর্যায়ে হতে পারে :

● উদ্দেশ্য সনাক্তকরণ

● সমস্যার বিশ্লেষণ (নির্ধারিত শ্রোতা, পরিস্থিতি, ইত্যাদি)

● পরিকল্পনা প্রণয়ন (উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন, স্লোগান ব্যবহার এবং মনোযোগের জন্য আকর্ষণীয় বাক্যাংশ ব্যবহার, বার্তাগুলিকে আগে পরীক্ষা করা, চ্যানেল সরবরাহ করে তথ্য খোঁজা এবং মানুষকে কাজে নিযুক্ত করা।

১.৩.৮ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের সুযোগ

উন্নয়নের সুবিধার্থে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে সর্বাধিকভাবে যা প্রয়োজনীয় তা হল জ্ঞান এবং তথ্য। ঐতিহ্যগত মিডিয়া যেমন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক তথ্য প্রচারে সহায়তা করে। সাম্প্রতিক যুগে কম্পিউটিং প্রযুক্তির উন্নতির ফলে জ্ঞান এবং তথ্য উভয়ের প্রচার আরো সহজ হয়ে উঠেছে। ICT র আবির্ভাবের সাথে সাথে, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণমূলক এবং ইন্টারেক্টিভ আদর্শগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ICT কে গ্রামীণ ও শহুরে এলাকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ICT ইতিমধ্যে উন্নয়ন ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ICT সীমানা অতিক্রম করে লাভজনক এবং সফল উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হচ্ছে এবং মানুষজনের মধ্যে বেশি করে সংযোগ এবং নেটওয়ার্কিং এ দ্রুততা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে, যার ফলে অনেক রকমের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে আমরা সক্ষম হচ্ছি। এর ফলে মানুষজন এক প্রকারের স্বায়ত্তশাসন এবং ভার্চুয়াল স্বাধীনতার অনুভূতি উপভোগ করছে। ICT ব্যবহারের ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আরও শক্তিশালী করে উন্নয়নমূলক পরিবর্তন আনা সম্ভব, যেহেতু এর ব্যবহারের ফলে মানুষরা তাদের মতামত জানানোর একটা সুযোগ পাচ্ছে।

গ্রামীণ জনগণকে তথ্য ও জ্ঞাপন প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষিত করা প্রয়োজনীয় যাতে তারা ডিজিটাল অর্থনীতির অংশ হয়ে উঠতে পারে। ICT যে কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারত এমন একটি দেশ যেখানে কৃষিক্ষেত্রে, ভাষায় এবং সাংস্কৃতিক দিকে অনেক রকমের পার্থক্য রয়েছে। আমাদের দেশ বৈচিত্র্যের দেশ যেখানে কৃষি-জলবায়ু সংক্রান্ত উদ্বেগ, পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা, আর্থিক অস্থিরতা, ইত্যাদির জন্য একটি উন্নয়নমূলক পরিবর্তন প্রয়োজন যা দ্রুততার সঙ্গে পরিবর্তন আনতে পারবে এবং যা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রদান করতে সক্ষম হবে। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র সামাজিক উন্নয়ন দ্বারাই সম্ভব যা সমাজের সক্ষমতা ও সামর্থ্যকে উন্নত করতে পারে। সমাজের এমনই একটি সামাজিক উন্নয়ন হল ICT যা গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্ভাবনী পদ্ধতির মাধ্যমে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মাধ্যমে বিকাশ আনার চেষ্টা করে, যাতে তাদের ক্ষমতায়ন করা যেতে পারে এবং তারা উন্নত মানের জীবনযাপন করতে পারে।

উন্নয়ন সমস্যা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রযুক্তিগত তথ্য প্রদান করা এবং তার সঙ্গে তথ্য প্রচার করা। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন এবং বিদ্যমান উন্নয়ন কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে সংযোগ তৈরি করা যাতে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুবিধা হতে পারে।

যারা সুবিধা প্রদান করার কাজে নিযুক্ত এবং যাদের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে তাদের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ভাগ করে নেওয়াটা প্রয়োজনীয়। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন নিচ থেকে উপরে, অনুভূমিকভাবে জ্ঞাপন প্রদান করার কাজ করে যার ফলে এটিকে উন্নয়নের একটি অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টান্ত হিসেবে ভাবা হয়।

উদ্ভাবন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন একটি সীমিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করে যাতে ভালোভাবে পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

জীবনযাত্রার মান বাড়ানো এবং উপস্থিতির উপর গুরুত্ব দেওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের চেষ্টা থাকে সম্পদের উপস্থিতি বাড়িয়ে তোলা এবং খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, ইত্যাদির বিতরণ আরও প্রশস্ত করা।

জনগণ এবং রাষ্ট্রের কাছে উপলব্ধ বিকল্পগুলিকে বাড়িয়ে তোলা জরুরি। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন যে শুধুমাত্র জীবনযাপনের বস্তুগত বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করে তাই নয় বরং এইটা ব্যক্তির মান উৎপাদনের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলারও চেষ্টা করে।

জনমত এবং জনসমাবেশ তৈরি করার জন্য উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন ব্যবহার করা হয়। জনসমাবেশ হলো এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে নাগরিকরা তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে একত্রিত হয় যার ফলে সম্মিলিতভাবে সামাজিক পরিবর্তন আনতে সুবিধা হয়। এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার ক্ষেত্রে নাগরিক কর্ম এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয়।

যে কোনো সমাজে দারিদ্র্য দূর করে প্রগতিশীল পরিবর্তন আনা প্রয়োজনীয় কারণ এর ফলে ব্যক্তির বৃহত্তর ন্যায়বিচার এবং তার কার্যকারিতার উদ্ঘাটন আরও বেশি করে প্রগতি আনতে পারে। এর জন্য পরিকল্পিত ভাবে রূপান্তর আনা প্রয়োজন যার জন্য উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের মধ্যে প্রেরণা জাগানোর ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন খুবই জরুরি কারণ এর ফলেই পরিবর্তন আনা সম্ভব। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন এইটা সহজেই করতে পারে যেহেতু এইটা অনেক বেশি ইন্টারেক্টিভ।

১.৩.৯ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের আইওয়া মডেল

বহু দশক আগে, জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচীর ধারণা হিসেবে উন্নয়ন জ্ঞাপনকে ভাবা হয়েছিল, কিন্তু ১৯৮০-এর দশকে, আইওয়া স্কুল প্রথমবার উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনকে উন্নয়নের একটি সহায়ক সাধন হিসেবে ভাবে। অ্যাশক্রফট (Ascroft) (১৯৮৫) কৃষি উন্নয়নের কাজটি তাদের সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে পূর্ণ করার কথা বলেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এই কারিগরি কর্মীদের ঐতিহ্যগত এবং প্রযুক্তিগত কৃষি কাজ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় কিন্তু তাদের জ্ঞাপন দক্ষতা নেই, যার ফলে তারা ফসল থেকে বেশি লাভ করতে পারছে না। তারা নিজেদের আপগ্রেড করছেন না বা নতুন প্রযুক্তির সাথে কোনো ভাবে সজ্জিত হতে পারছেন না। সেই জন্য গ্রামীণ উন্নয়নে প্রশিক্ষিত পেশাদার জ্ঞাপনকারীর প্রয়োজন রয়েছে যাতে তাদের জ্ঞাপন দক্ষতা বাড়িয়ে তোলা যায়।

এই উদ্যোগটি সম্প্রসারণ কর্মীদের তাদের অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে এবং একটি নির্দিষ্ট জায়গায়

বিকাশ করতে সহায়তা করবে যার ফলে তারা তাদের জ্ঞান এবং তথ্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবে। তাই এই উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের মূল হাতিয়ার হল মানুষের বিকাশের জন্য একটি প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করা। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন শুধুমাত্র প্রেরক থেকে গ্রাহকের কাছেই বার্তা পাঠাচ্ছে না কিন্তু বিভিন্ন পদ্ধতি, সরঞ্জাম এবং কৌশলের সঙ্গে বার্তাকে সজ্জিত করে তুলছে যাতে তারা তাদের উন্নয়ন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

১৯৮২ সালে, আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষকরা ইন্টারেক্টিভ ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট এর একটি ট্রায়াডিক মডেল তৈরি করেছিলেন। উন্নয়ন সহযোগিতার তিনটি বিস্তৃত অংশ সম্বন্ধে এই মডেলে বর্ণনা করা হয়েছিল :

ক) প্রযুক্তিগত সহায়তার শাখা

খ) স্থানীয় প্রসঙ্গ এবং স্টেকহোল্ডারদের সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান

গ) প্রকল্প পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষার অবদান

এই মডেলটি ত্রিভুজাকারে পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং শীর্ষের ত্রিভুজগুলি প্রযুক্তিগত প্রয়োজনের নমুনার বিভাগগুলির বর্ণনা করে, এগুলিকে অধিষ্ঠিত করা হয় যাতে তথ্য, জ্ঞান বা দক্ষতা ভাগ করে নেওয়ার মতো সাধারণ একটি বিষয়কে চিত্রিত করা যেতে পারে। কেন্দ্রে থাকা আয়তক্ষেত্র উন্নয়নমূলক ক্ষেত্র এবং স্টেকহোল্ডারদের প্রাসঙ্গিক জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে। নীচের ত্রিভুজগুলি একটি ক্ষেত্রফল চিহ্নিত করে, যার বিভিন্ন জ্ঞানের ভিত্তি আছে আর যার ফলে আন্তঃবিভাগীয় আলোচনা হতে পারে।

ট্রায়াডিক মডেলটি মূলত আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রণীত যা বিভিন্ন সেক্টর, সম্প্রদায় এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অবস্থিত আন্তঃসংযোগ কল্পনা করে। প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা যা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সেটাকে শীর্ষে থাকা অধিষ্ঠিত ত্রিভুজের মাধ্যমে দেখানো হয়, এবং কেন্দ্রে থাকা আয়তক্ষেত্র স্থানীয় সম্প্রদায় এবং স্টেকহোল্ডারদেরকে চিত্রিত করে যাদের উন্নয়নের প্রয়োজন আছে। নীচে থাকা ত্রিভুজগুলি ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক বিজ্ঞানকে চিত্রিত করে।

সাধারণভাবে এই মডেলটির দ্বারা আমরা জানতে পারি যে একটি নির্দিষ্ট উন্নয়ন কর্মসূচীর সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত দিক মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

১.৩.১০ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন উন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সম্পদ

জাতীয় সম্পদ উন্নতির জন্য চারটি ভাগে উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনকে ব্যবহার করা যায়।

১.৩.১০.১ জ্ঞাপন পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ ও উন্নতি :

সহায়ক জ্ঞাপনের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এইখানে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া খুবই প্রয়োজনীয়। কোনো সময়ে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন হতে পারে সাধারণত সিনে-প্রজেক্টর, স্লাইড-প্রজেক্টর, ডার্করুম গিয়ার এবং টেপ রেকর্ডারের প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে।

১.৩.১০.২ উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে জাতীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা :

উন্নয়ন সহায়ক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পকে আরও কার্যকর করে তোলার জন্য উন্নয়ন কর্মকর্তাদের অনুপ্রেরণা প্রদানের কাজ জাতীয় কর্তৃপক্ষদের নিতে হবে যাতে প্রকল্পগুলি সফল হতে পারে।

১.৩.১০.৩. জাতীয় তথ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ বা পুনঃপ্রশিক্ষণ :

উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন প্রতিটি দেশের জন্যই প্রয়োজনীয়। এর ক্ষেত্রে মানুষের পদমর্যাদা, মান, সম্পদ ব্যবহার, ইত্যাদি সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের তথ্যমূলক কাজে পেশাদারি দক্ষতার প্রয়োজন।

১.৩.১০.৪. সিস্টেম এবং সম্পদের প্রয়োগ :

উন্নয়ন সহায়ক সংস্থায় জ্ঞাপন কৌশল এর ক্ষেত্রে পেশাদারি দক্ষতার প্রয়োজন। অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে যে কোনো ধরনের গণমাধ্যমের বেশি ব্যবহার উদ্ভাবনের জন্য উপযোগী নাও হতে পারে, গণমাধ্যম দ্বারা প্রেরিত তথ্য কার্যকরী এবং স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। তা ছাড়াও সেটি দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর নিদর্শনের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। তথ্যকে উপযোগী হিসাবে তখনি বিবেচিত করা হয় যখন এটি প্রদত্ত পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য, সময়োপযোগী এবং নির্দিষ্ট থাকে।

স্থানীয় জ্ঞাপন পদ্ধতির গুরুত্বকে সবসময়ই জোর দেওয়া হয়েছে। উন্নতির ক্ষেত্রে স্থানীয় চাহিদা মেটানো প্রয়োজনীয় আর সেই জন্য কার্যক্রমগুলি অবশ্যই স্থানীয় হতে হবে। এই কার্যক্রমগুলি একটি বড় উন্নয়নশীল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং উপ-অঞ্চলে আলাদা হতে পারে, যেহেতু এইরকম বড় দেশে অনেকরকমের ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষরা বসবাস করে। জ্ঞাপনের বিশেষজ্ঞরা যুক্তি দিয়েছেন যে স্থানীয় পদ্ধতির মাধ্যমে একটি সক্ষম বার্তা পরিকল্পনা সাজানো সম্ভব যা মানুষের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, সময়োপযোগী, প্রযোজ্য,ও নির্দিষ্ট হবে। এরকম এক পদ্ধতি পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারে এবং দর্শকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দ্বিমুখী জ্ঞাপন প্রক্রিয়া আরো সহজতর করতে পারে।

১.৩.১১ উপসংহার

আলোচনার মাধ্যমে এটি বোঝা যায় যে উন্নয়ন জ্ঞাপন মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য উন্নয়ন বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন, উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বাস্তব করার

ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। উন্নয়ন জ্ঞাপন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যার দ্বারা পরিকল্পিত ভাবে উন্নয়ন আনা সম্ভব। উন্নয়নকে সাংস্কৃতিক ছাঁচের মধ্যে তথ্য, শিক্ষা, জ্ঞাপন হিসাবে ধারণা এবং মানুষের উন্নয়নে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা প্রদান করার যন্ত্র হিসেবে ভাবা হয়। উন্নয়ন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে জ্ঞাপন ব্যবস্থার পরিকাঠামো তৈরি করা এবং তার ব্যবহারের ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহ দেওয়াটা খুবই জরুরি। উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা, বর্তমান উন্নয়ন পরিস্থিতির সাথে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা, উন্নয়নের দাবি করা এবং মানুষকে অংশগ্রহণ এবং উন্নয়ন অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করা হিসেবে ভাবা হয়। বিভিন্ন রকমের উন্নয়ন জ্ঞাপনের পদ্ধতিগুলি সম্প্রসারণ, বিস্তার, গণমাধ্যম, উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন, এবং উন্নয়ন জ্ঞাপনের পরিকল্পিত কৌশলগুলির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই পন্থাগুলি উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে কার্যকর জ্ঞাপন কৌশল বিকশিত করার ক্ষেত্রে কাজগুলিকে আরও সহজতর করে তোলে।

১.৩.১২ সারাংশ

একটি ধারণা হিসেবে উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন, সর্বক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞাপনের নীতি ও অনুশীলনের অনুসন্ধান করে। কৃষি সম্পসারণ ক্ষেত্রে প্রসার মানুষকে তার নিজের সাহায্য করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলো। নতুন ধারণা, অনুশীলন এবং প্রযুক্তি চালু করার ক্ষেত্রে মানুষের সম্মতির প্রয়োজনীয়তা আছে। এই ক্ষেত্রে মানুষকে একটি নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে বোঝানোটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যেই কোনো উদ্ভাবনের অভিযোজন একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। সাংস্কৃতিক অসামঞ্জস্যতা অনেক সময়ই উদ্ভাবন গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধার কারণ হিসাবে কাজ করে। সুতরাং, আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে নতুন ধারণা, নতুন অনুশীলন এবং নতুন প্রযুক্তি ভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থা সাংস্কৃতিক অনুশীলনের সাথে মিলে কাজ করে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিক্ষা ও পরিবেশের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজে বাড়তি শিল্পায়নের জন্য বেশ কিছু পরিবেশগত সমস্যা উঠে আসছে আর এই ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন মানুষের মধ্যে তথ্য পৌঁছে দেওয়া ও সচেতনতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে মানুষের মনোভাব এবং আচরণে পরিবর্তন আনা সম্ভব হচ্ছে। এই পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করে, যাতে, তাদের ক্যাম্পেইনগুলি মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে। উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন মূলত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে, যাতে একটি দেশে দ্রুত উন্নয়ন আনা যেতে পারে।

১.৩.১৩ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন

১. উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপন কী?

২. SMCR মডেল কী?

টাকা লিখুন

৩. ডিফিউশন অফ ইনোভেশন

৪. হোমোফিলি

৫. হেটেরোফিলি

৬. FAO

৭. উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্ষেত্র

৮. সামাজিক উন্নয়ন

৯. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

১০. উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্যাম্পেইন

১১. উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের আইওয়া মডেল

বড় প্রশ্ন

১. উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করুন?

২. উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে হেটেরোফিলি গ্যাপ বলতে আমরা কী বুঝি?

৩. উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের ক্যাম্পেইনের পর্যায়গুলি কী?

৪. উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞাপনের কাজের ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন?

৫. ICT র উৎপত্তির সঙ্গে উন্নয়ন কিভাবে জড়িত?

১.৩.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১. আগুঙ্গা, আর. (১৯৯০). ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট কমিউনিকেশন এন্ড পপুলার পার্টিসিপেশন ইন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস. গেজেট (লেইডেন, নেদারল্যান্ডস), ৪৫(৩), ১৩৭-১৫৫.

২. হর্নিক, আর. সি. (১৯৯৩). ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন: ইনফরমেশন, এগ্রিকালচার, এন্ড নিউট্রিশন ইন দ্য থার্ড ওয়ার্ল. ইউনিভার্সিটি প্রেস অফ আমেরিকা.

৩. বাভা, এন. (১৯৮১). অপপ্রয়াচেস টু ডেভেলপমেন্ট. দ্য ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স, ৪২(২), ৪১-৫৭.

একক ৪ ❑ লার্নার ও তার আধুনিকীকরণের তত্ত্ব

গঠন

১.৪.১ উদ্দেশ্য

১.৪.২ প্রস্তাবনা

১.৪.৩ উন্নয়ন জ্ঞাপন কী?

১.৪.৪ লার্নার ও তার আধুনিকীকরণের তত্ত্ব

১.৪.৪.১ লার্নারের আধুনিকীকরণের তত্ত্বে গণমাধ্যমের ভূমিকা

১.৪.৪.২ সহানুভূতি এবং মানসিক গতিশীলতা (**Empathy and Psychic Mobility**)

১.৪.৪.৩ স্বাক্ষরতা (**Literacy**)

১.৪.৫ লার্নারের আধুনিকীকরণ তত্ত্বের সমালোচনা

১.৪.৬ আধুনিকীকরণ তত্ত্বে লার্নার দ্বারা আনা পরিবর্তন

১.৪.৭ সারাংশ

১.৪.৮ অনুশীলনী

১.৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১.৪.১ উদ্দেশ্য

ড্যানিয়েল লার্নারের মতে আধুনিকীকরণ হল পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া যা মূলত চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, নগরায়ণ বৃদ্ধি, সাক্ষরতার বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। আধুনিকীকরণের ফলে নতুন ধারণার সৃষ্টি হয় যার জন্য মানুষজনদের মধ্যে একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। আধুনিকীকরণের এই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক পরিবর্তন ও গতিশীলতার ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সেই জন্য লার্নারের আধুনিকীকরণের তত্ত্ব উন্নয়ন জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই এককে আমরা তার বই 'দ্য পাসিং অফ ট্রাডিশনাল সোসাইটি: মডার্নাইজিং দ্য মিডল ইস্ট' এ দেওয়া তার আধুনিকীকরণের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো।

১.৪.২ প্রস্তাবনা

ড্যানিয়েল লার্নারের (১৯১৭-১৯৮০) বই 'দ্য পাসিং অফ ট্র্যাডিশনাল সোসাইটি: মডার্নাইজিং দ্য মিডল ইস্ট (১৯৫৮) হলো প্রথম কোনো বই যেখানে আমরা বিস্তীর্ণ রূপে উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলির আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারি। এই বইতে মূলত মিশর, ইরান, জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া এবং তুরস্কের কথা বলা হয়েছে। উন্নয়নের সাধারণ তত্ত্বতে আমরা দেখে এসেছি যে দরিদ্র দেশগুলির সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে পশ্চিমি দেশে উৎপাদিত প্রযুক্তি, রাজনৈতিক কাঠামো, মূল্যবোধ এবং গণজ্ঞাপন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়ে এসেছে। লার্নারের মডেলে উনি নগরায়ণের ফলে গণমাধ্যম এবং সাক্ষরতায়ে বৃদ্ধির কথা বলেছেন যার কারণে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং রাজনীতিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ অনেক বেশি পরিমানে হয়েছিল।

গণমাধ্যম এবং সাক্ষরতায় বৃদ্ধি মূলত মানুষের সংবাদ ও তথ্যের চাহিদা এবং অনেক পরিমাণে স্কুল তৈরি হওয়ার জন্য হয়েছিল। লার্নারের মতে গণমাধ্যমই ঐতিহ্যবাহী সমাজকে আধুনিক হতে সাহায্য করতে পারে। আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে লার্নারের তত্ত্ব অনুযায়ী রেডিও, টেলিভিশন, ম্যাগাজিন এবং সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যমের ফলেই উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলি পাশ্চাত্যের আধুনিকতা এবং তাদের আধুনিক জীবনধারার বিস্তৃত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে পারে। এর ফলে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ব্যক্তিত্বের শ্রোতারা এমনভাবে চিন্তা এবং আচরণ করতে পারে যার ফলে তাদের দেশগুলি প্রথাগত সমাজ থেকে আধুনিক সমাজে রূপান্তরিত হতে পারে যা মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদলে তৈরি হবে। লার্নারের আধুনিকীকরণের তত্ত্বের মূল অবদান হলো সহানুভূতি (empathy), যাকে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে একটি মূল মনোসামাজিক গুণক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে আর এইটাই সম্ভবত উন্নয়ন জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে লার্নারের মূল অবদান।

১.৪.৩ উন্নয়ন জ্ঞাপন কী?

উন্নয়ন জ্ঞাপনকে একপ্রকারের আধুনিকীকরণের মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য জ্ঞাপন প্রযুক্তি ব্যবহারের শিল্প ও বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আমরা দেখি যে ১৯৭০ এর দিকে 'গণমাধ্যম এবং আধুনিকীকরণ' এর বদলে 'উন্নয়ন জ্ঞাপন' কথাটা ব্যবহৃত হতে থাকে। উন্নয়নের জন্য জ্ঞাপনের ধারণাটা প্রাথমিকভাবে বার্তার চালনা 'উপর-নিচ' (top-down) বলে মনে করতো। গভীর ভাবে বুঝতে গেলে পশ্চিম দেশগুলি থেকে অন্যান্য দেশগুলিতে যেমন অভিজাত থেকে অ-অভিজাত, বিশেষজ্ঞ থেকে অ-বিশেষজ্ঞ, রাজধানী শহর থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে প্রসারিত বার্তা হিসেবে উন্নয়নকে বোঝা হতো। এই বার্তাগুলির উদ্দেশ্য ছিল একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা যেখানে মানুষজনেরা তাদের চিন্তাধারার বাইরের ধারণা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

আমরা দেখি যে ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে, নতুন উদ্যোগ, এবং উন্নয়নের তাত্ত্বিক পদ্ধতি, যেটা জনগণের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের ধারণার উপর নির্ভরশীল তাকে বোঝার জন্য নতুন একটি ধারণা সৃষ্টি হয় যাকে 'উন্নয়ন-সমর্থন জ্ঞাপন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ধারণায় অনুভূমিকভাবে যৌথ-সম্প্রচারিত তথ্য প্রবাহ (যা টপ-ডাউন মডেলের বিপরীত) ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে যা জনগণের সম্পদ এবং মৌলিক চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করার আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করবে। উন্নয়ন-সহযোগী জ্ঞাপন উন্নয়ন জ্ঞাপনের থেকে খুব বেশি আলাদা ছিল না। অনেক বিশেষজ্ঞরাই মনে করেন যে উন্নয়ন-সহযোগী জ্ঞাপন, টপ-ডাউনের বদলে 'বাইরে-ভিতরে' (outside-in) ছিল, যার অর্থ হলো যে পশ্চিমি বিশেষজ্ঞদের মূল্যবোধ এবং প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাত তখনও অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল।

১.৪.৪ লার্নার ও তার আধুনিকীকরণের তত্ত্ব

লার্নার এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতে 'আধুনিক' এর অর্থ 'পশ্চিমা' ছিল। লার্নারের বইতে ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালে করা তিনশোটা সমীক্ষার ফল ছিল এবং এই সমীক্ষা মূলত ছটা দেশে- মিশর, ইরান, জর্ডান, লেবানন, তুরস্ক, এবং সিরিয়াতে করা হয়েছিল। সেখানকার লোকেদেরকে তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা, রাজনীতি এবং বিদেশী দেশ সম্পর্কে তাদের মতামত, তাদের গণমাধ্যম ব্যবহার, তাদের সুখের মাত্রা এবং তাদের মৌলিক জনসংখ্যা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। লার্নার তার বইতে তিন বিভাগে মানুষ এবং দেশকে বিভক্ত করেছিলেন- ঐতিহ্যগত, ক্রান্তিকালীন এবং আধুনিক।

ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার ইতিহাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে লার্নার বললেন যে আধুনিকীকরণের আদ্যস্থল হলো দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলের দিকে গমন করা। নগরায়ণের ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়তে থাকে যার ফলে স্কুলের চাহিদা, গণমাধ্যম, মুক্ত বাণিজ্যের বাজার এবং অন্যান্য আধুনিক এবং গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের চাহিদাও বাড়তে থাকে। অবশেষে, সাক্ষরতা এবং গণমাধ্যমের ব্যবহারের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ (উচ্চ স্তরের উপাদান ভোগ) এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (মুক্ত নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার) বেড়ে যায়। লার্নারের জন্য, জিনিস কেনার ক্ষমতা এবং ভোটাধিকার একটি আধুনিক দেশের সূচক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

লার্নারের আধুনিকীকরণ তত্ত্বে তিনি তার অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ছিলেন যে যে কোনও দেশ আধুনিক হতে পারে। কোনো দেশই ঐতিহ্যগত ও অনগ্রসর হিসেবে নির্ধারিত নয়। আধুনিক হওয়ার ক্ষেত্রে, যে কোনো দেশের নাগরিকদের পশ্চিমা দেশগুলির মানুষদের কর্ম এবং ধারণা অনুকরণ করতে হবে যেহেতু তারা পূর্বে ঐতিহ্যবাহী অনগ্রসরতা থেকে সরে গিয়ে আধুনিক হতে পেরেছে। মানুষ (এবং দেশ) যারা পশ্চিমা অভিভাবকত্ব এবং পশ্চিমের 'নতুন পথ' গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তনে অক্ষম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি কিন্তু তাদের প্রথাগত সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার ফলে তাদের অনগ্রসরতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ ঔপনিবেশিকতার আগের সময় থেকে

আলাদা ছিল কারণ সেই সময় অনেক ইউরোপীয় দেশ ঔপনিবেশিক জনসংখ্যাকে জাতিগতভাবে অর্থাৎ, জৈবিকভাবে তাদের সাদা চামড়ার কাছে নিকৃষ্ট মনে করতো। বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি যে এই ধারণাটি পাল্টে যায় যেহেতু বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনী এমন এক শত্রুকে পরাজিত করেছিল যার দর্শন মূলত জিনগতভাবে নিকৃষ্ট জনগণকে ধ্বংস করার উপর নিযুক্ত ছিল, সেই জন্য আধুনিকীকরণ তত্ত্বে মানুষের পার্থক্যের মূল হিসেবে পরিবর্তনশীল সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ধারণার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১.৪.৪.১ লার্নারের আধুনিকীকরণের তত্ত্বে গণমাধ্যমের ভূমিকা

ড্যানিয়েল লার্নারের বই 'দ্য পাসিং অফ ট্র্যাডিশনাল সোসাইটি: মডার্নাইজিং দ্য মিডল ইস্ট (১৯৫৮), মূলত ১৯৪০ এর দশকের শেষের দিকে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের অর্থায়নের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। এই বইটির গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা ভয়েস অফ আমেরিকার (VOA) সম্প্রচার শুনছেন কিনা তা নির্ধারণ করা এবং যদি শুনে থাকেন তাহলে তাদের প্রোগ্রামিংয়ের প্রতি প্রতিক্রিয়ার অবধারণ করা। লার্নারের বইয়ের প্রথম এপিগ্রাফে তিনি পাঠকদের বালগাটের প্রধানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। বালগাটের প্রধান একজন ঐতিহ্যগত মূল্যবোধে নিমজ্জিত ব্যক্তি যার প্রাচীন মূল্যবোধ আধুনিক বিশ্বের সাথে খাপ খায় না। লার্নার বালগাটের প্রধানকে আশাহীনভাবে সংকীর্ণ দেখিয়েছেন, যেখানে তিনি সমস্ত সমস্যা এবং ঘটনাকে তার 'ঐতিহ্যগত গুণাবলীর' দৃষ্টিকোণের দ্বারা বিচার করেছেন। প্রধানের তার গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই এবং তিনি শুধুমাত্র তার ছেলেদের ভালো সৈনিক করতে চান এবং তার মেয়েদের ভালো জায়গায় বিয়ে দিতে চান। প্রধানের কাছে গ্রামের একমাত্র রেডিও ছিল এবং তিনি তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক হয়ে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতেন। যদিও তিনি আঙ্কারা থেকে সংবাদ শোনার জন্য গ্রামের অভিজাতদেরকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি একাই সেই সংবাদের অর্থ ও তাৎপর্য সমবেত জনতার জন্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই পরিবেশের বিপরীতে, লার্নার প্রথাগত থেকে আধুনিক সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন যা গণমাধ্যমের দ্বারা চালিত হবে।

রূপান্তরের অন্তর্নিহিত যুক্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল :

১. উন্নতমানের গণমাধ্যম ব্যবস্থা ছাড়া কোন আধুনিক সমাজ দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে না।

২. গণমাধ্যম মানবজাতির কাছে আধুনিক ধারণা এবং অভিজ্ঞতার এক অসীম দ্বার খুলে দেয়।

৩. গণমাধ্যমের সংস্পর্শে আসলে মানুষের মধ্যে পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় আর যখন অনেক মানুষ এই আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে, তখন আমরা বলতে পারি যে আধুনিকীকরণের দিকে একটি উত্তরণ দেখা দিচ্ছে।

৪. একটি যুক্তিবাদী এবং ইতিবাচক চেতনা যা কিনা পশ্চিমা-শৈলীর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংগঠিত আছে, সেই চেতনা মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলিতে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।

৫. আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিযোজন, যেমন নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা, শিক্ষা এবং আধুনিক প্রযুক্তি, পশ্চিমের 'প্রাকৃত' পরিধি ছিল, যা কিনা মধ্যপ্রাচ্যের মানুষজনেরা একগুঁয়েভাবে প্রতিরোধ করেছিল।

১.৪.৪.২ সহানুভূতি এবং মানসিক গতিশীলতা (Empathy and Psychic Mobility)

লার্নারের সহানুভূতির মূল ধারণাটি অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা নতুনভাবে সচল ব্যক্তিদের একটি পরিবর্তিত বিশ্বে দক্ষতার সাথে কাজ করতে সক্ষম করে। সহানুভূতি হল অন্য সহকর্মীর পরিস্থিতিতে নিজেকে দেখার ক্ষমতা বা অন্য ব্যক্তির জায়গায় নিজেকে কল্পনা করার ক্ষমতা যে জায়গাটা তার নিজের চেয়ে ভালো। লার্নারের তত্ত্বের প্রধান অনুমান হল যে উচ্চ সহানুভূতিশীল ক্ষমতা শুধুমাত্র আধুনিক সমাজের প্রধান ব্যক্তিগত শৈলী, যেই সমাজ স্বতন্ত্রভাবে শিল্পজাত, শহুরে, শিক্ষিত এবং অংশগ্রহণকারী। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সহানুভূতি তৈরি করার পিছনে আছে মানসিক গতিশীলতা। তাই সহানুভূতি হল মানসিক গতিশীলতা; প্রথম পর্যায়ে, শারীরিক গতিশীলতা এটি তৈরি করে। ফলস্বরূপ, একটি গতিশীল মানসিকতা একজন মনস্তাত্ত্বিকভাবে গতিশীল ব্যক্তি তৈরি করে, যা আধুনিক সমাজের একটি মূল উপাদান এবং যার বিস্তারের পিছনে গণমাধ্যম এর ভূমিকা রয়েছে। লার্নারের মতে জ্ঞাপনের গণমাধ্যমগুলি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর, কারণ তারা বাস্তবতাকে সরল করে, এমন একটি প্রেক্ষাপটে তথ্য উপস্থাপন করে যা উপলব্ধি এবং শিক্ষার সুবিধা দেয়। লার্নারের মতে মানুষের মধ্যে যদি সহানুভূতি থাকে তাহলে প্রথাগত উদাসীনতা থেকে লোকেরা বেরিয়ে আসতে পারবে যার ফলে তারা তাদের পুরানো পদ্ধতি ও শ্রেণিবিন্যাসকে প্রশ্ন করতে পারবে এবং নতুন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে পূর্ণ ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

১.৪.৪.৩ স্বাক্ষরতা (Literacy)

লার্নারের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি মূল কারণের কথা বলেন। তিনি তার সংজ্ঞা প্রদান করেন এবং ব্যাখ্যা করেন যে সেগুলি কী ক্রমে ঘটে। তিনি নগরায়ণ, সাক্ষরতা, গণমাধ্যমে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, এই চারটি পরিবর্তনশীল বিষয়কে বিবেচনা করেন। মানুষের একাগ্রতা গণশিক্ষাকে সম্ভব করে তোলে যা সাক্ষরতার দক্ষতা প্রদান করে। এই দক্ষতার ফলে গণমাধ্যমের জন্য একটি বাজার তৈরি হয়। সাক্ষরতার ফলে গণমাধ্যমের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। লার্নারের মতে মিডিয়ায়ে অংশগ্রহণ মানে হলো সংবাদপত্র কেনা, রেডিওর মালিক হওয়া এবং সিনেমা দেখতে যাওয়া- এই কাজগুলি বোঝায়। যত বেশি করে মানুষ গণমাধ্যম ব্যবহার করবে তত বেশি তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক যোগদান বাড়বে। লার্নারের যুক্তি অনুযায়ী বেশি করে গণমাধ্যমে অংশগ্রহণ করা ক্রমে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকে বাড়িয়ে তুলবে।

১.৪.৫ লার্নারের আধুনিকীকরণ তত্ত্বের সমালোচনা

লার্নারের বইটিকে অনেক সমালোচনার মুখোমুখিও হতে হয়েছিল। কিছু গবেষকের মতে তার আধুনিকীকরণের তত্ত্ব শুধুমাত্র তুরস্কের অবস্থাকে কিছুটা ঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলো কিন্তু লেবানন, মিশর, সিরিয়া, জর্ডান এবং ইরানের মতো দেশের ব্যাখ্যা মোটেও ভালোভাবে করতে পারেনি। লার্নার তার বইতে নাকি সামান্য বিবরণের ভিত্তিতে সবকিছুর সাধারণীকরণ করে দিয়েছেন। লার্নারের বইয়ের এই প্রাথমিক সমালোচনাগুলির সঙ্গেই আমরা এক স্থির সমালোচনার প্রবাহ লক্ষ্য করি যা সবসময় লার্নারকে এবং তার বই কে নির্দিষ্ট করে ছিল না কিন্তু তার সাধারণভাবে তার বই এর প্রাঙ্গন, অনুমান, এবং আধুনিকীকরণ তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী কে কেন্দ্র করে ছিল। বামপন্থী পণ্ডিতদের কাছ থেকে আমরা তার বই সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা শুনতে পাই কারণ তারা আধুনিকীকরণের তত্ত্বের উপর একটি নব্য ঔপনিবেশিক ছাপ পান।

অন্যান্য রক্ষণশীল চিন্তাবিদরা তার তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। যেমন এডওয়ার্ড বানফিল্ড ঘোষণা করেছিলেন যে গণতন্ত্র এবং তার সঙ্গে আসা স্বাধীনতা উত্তর-ঔপনিবেশিক বিশ্বের অনগ্রসর মানুষদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে খুব বিচ্ছিন্ন তত্ত্ব আর সেই জন্য পশ্চিমের মধ্যপ্রাচ্যের আধুনিকায়নের প্রচেষ্টা বা অন্যান্য দরিদ্র এলাকার উন্নয়নের প্রচেষ্টাতে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বানফিল্ড এর মতে কিছু সমাজ পিছিয়ে থাকার ভাগ্য করেই এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ উনি বলেছেন যে আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা কয়েক দশক ধরে ব্যাপক সহায়তা পাওয়া সত্ত্বেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আধুনিক বিশ্বের নিয়মকায়দা থেকে বহু দূরে আছে। স্যামুয়েল হান্টিংটন মনে করেছিলেন যে আধুনিকীকরণ উত্তর-ঔপনিবেশিক বিশ্বে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সহজে অস্থিতিশীলতা তৈরি হতে পারে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে কার্যকরী নাও হতে পারে, আর সেই জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিকীকরণ প্রচারের বদলে আধুনিকীকরণের প্রতিরোধ করা উচিত।

সম্ভবত সবচেয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচনা উত্তর-ঔপনিবেশিক বিশ্বের বিশেষজ্ঞরা কাছ থেকে এসেছে। পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদ ইনায়াতুল্লাহর মতে আধুনিকীকরণের তত্ত্ব অনুমান করে যে যেহুতু পশ্চিমা সমাজের তুলনায় 'প্রথাগত' সমাজ প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উচ্চ স্তরে পৌছায়নি সেই জন্য তারা অনুৎপাদনশীল, অসৃজনশীল, এবং সেই জন্য বর্জনযোগ্য। এই তত্ত্ব ঐতিহ্যগত বিশ্বের সৃজনশীলতার পরিমাপ কিছু সীমিত মানের ভিত্তিতে করে যেমন নগরায়ণ এবং শিল্পায়ন যা দেখলে মনে হয় যেন একটা মানুষ নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে সবার যোগ্যতা বিচার করছে। এটি ভীষণভাবে জাতিকেন্দ্রিকতা দেখায় যেখানে মনে হচ্ছে যেন আধুনিক সমাজ স্বর্গ সমান যেখানে তারা নিজেদের সংকটের বিবেচনা করতে ব্যর্থ, বিশেষ করে তাদের ব্যক্তিত্বের সংকট। একই রকম মন্তব্য করেছেন, কেনিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক আলী মাজরুই। তার মতে আধুনিকীকরণের তত্ত্ব উত্তর-ঔপনিবেশিক জনগণকে অনুকরণ করার ক্ষমতা দেয়

কিন্তু তৈরি করার ক্ষমতা দেয় না। সাম্প্রতিক দিনে, আশিস নন্দী বলেছেন এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে পশ্চিমা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনিবার্যভাবে যারা আধুনিকীকরণে অংশ নিয়েছেন তাদের উপকৃত করেছে, বরং নন্দীর মতে ভারতে আধুনিকীকরণের ইতিহাস যথেষ্ট হিংস্র এবং নিপীড়ক। তার যুক্তি অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হিসাবে আধুনিকীকরণকে দেখানো হয়েছে এবং প্রায়শই দরিদ্র, সংখ্যালঘু এবং অপেক্ষাকৃত সামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেদের শোষণকে ন্যায্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

যদিও অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিকীকরণের তত্ত্ব সমালোচিত হয়েছে যে উত্তর-ঔপনিবেশিক বিশ্বের সামাজিক রূপান্তরের ব্যাখ্যা ও পূর্বাভাস এই তত্ত্ব ভালোভাবে দিতে সক্ষম হয়নি তা সত্ত্বেও লার্নারের ধারণাগুলি অবিরতভাবে গণমাধ্যম এবং আধুনিকীকরণের একাডেমিক অধ্যয়নকে প্রভাবিত করে এসেছে। উদাহরণস্বরূপভাবে বলা যেতে পারে যে আধুনিকীকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে লার্নারের ধারণা পরবর্তীকালে উন্নয়ন জ্ঞাপন এর ধারণা সৃষ্টি করতে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

অনেক বিশেষজ্ঞরাই লার্নারের লেখা বইটির প্রশংসা করেছিলেন যেহেতু সেই সময় উনি দক্ষতার সাথে সাধারণ পরিবর্তনের তত্ত্বের সাথে প্রয়োগিক নির্দিষ্টতা মিলিত করেছিলেন। অনেকেই বলেছিলেন যে তার বইটি মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত অর্থপূর্ণ অধ্যয়ন এবং অন্যান্য আধুনিকীকরণ সংস্কৃতির পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ প্রভাব ফেলবে। পরবর্তী গবেষণার ক্ষেত্রে লার্নারের বই যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিলো আর সেই জন্য এই বইটিকে উন্নয়ন জ্ঞাপন শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে মনে করা হয়।

১.৪.৬ আধুনিকীকরণ তত্ত্বে লার্নার দ্বারা আনা পরিবর্তন

পরবর্তীকালে সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে, লার্নার তার তত্ত্বে কিছু ক্ষুদ্র পরিবর্তন আনেন। ১৯৬০ সালে তুরস্কের সামরিক অভ্যুত্থানের পরে, তিনি স্বীকার করেন যে খুব দ্রুত নগরায়ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার দিকে মানুষজনকে যার ফলে উদীয়মান হতাশার বিপ্লব আসতে পারে যেখানে আকাঙ্খা অর্জনকে ছাড়িয়ে যায়। অন্যান্য সংশোধনের মধ্যে ঐতিহ্যগত ও আধুনিকতায় অন্তর্ভুক্ত দ্বিধাবিভক্তির মধ্যে এই গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমে বদল আনা যে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া না সার্বজনীন না রৈখিক। পরবর্তীকালে লার্নার এও স্বীকার করেন যে আধুনিকীকরণের তত্ত্বের প্রথম ধাপ, নগরায়ণ বিপরীতমুখী হতে পারে।

১৯৭৫ সালে লার্নার নিজের আধুনিকীকরণের চিন্তায় একটা গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন আনেন। সেই সময় হনোলুলুতে আয়োজিত একটি কনফারেন্সে উনি তার একটি গবেষণা পত্রে তার আধুনিকীকরণের তত্ত্বের সঙ্গে ফার্দিনান্দ টনিসের সমাজ এবং সম্প্রদায়ের দ্বিধাবিভক্তিকে সংযুক্ত করেন। ফার্দিনান্দ টনিসের গ্রামীণ অভিবাসী সম্পর্কে বর্ণনা, যারা তাদের গ্রাম ছেড়ে শহরে শিল্প শ্রমিক হতে তাদের সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে চলে এসেছে যাতে তারা তাদের জীবনধারা পরিবর্তন করে সমাজের অঙ্গ হতে পারে, এই

চিন্তার সঙ্গে লার্নারের আধুনিকীকরণ-তত্ত্বের ধারণা যা উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে ঐতিহ্যগত থেকে আধুনিকতায় রূপান্তরের একটা পথ দেখায়, এই দুটো তত্ত্বের মধ্যে লার্নার একটি সম্পর্ক খুঁজে পান। উনি বলেন যে টনিস সমাজের ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগকে কেন্দ্র করে আমাদের মনোযোগ সম্প্রদায়ের অবিরত জীবন থেকে বিমুখ করেছেন। তিনি আরো বলেন যে সম্প্রদায় ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায়নি বরঞ্চ বৃহত্তর সমাজে গুরুত্বপূর্ণ নতুন ভূমিকা নিয়ে টিকে থেকেছে। লার্নারের এই যুক্তি তার আধুনিকীকরণের তত্ত্বে একটা আমূল পরিবর্তন আনে। তার এই স্বীকারোক্তি যে সম্প্রদায় সমাজ থেকে চলে না গিয়ে সমাজে কোনো রকমভাবে টিকে যায়, তা ঐতিহ্যগত সমাজের অস্তিত্বের কথা জানান দেয়। এই যুক্তির ফলে আমরা দেখি যে লার্নারের বইয়ের আধুনিকীকরণের ধারণাকে উনি অনেকটাই ভিন্ন ভাবে হোনোলুলুর এই সম্মেলনে আলোচনা করেছেন।

আজকের দিনে যেই কারণে লার্নারের বক্তব্য- গণজ্ঞাপন আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার একটি মূল উপাদান-প্রাধান্য পেয়েছে তার কারণ উন্নয়নের বিশেজ্ঞরা মনে করেন যে যদি আমরা প্রযুক্তিগত সমস্যার অবসান ঘটাতে পারি তাহলে গণজ্ঞাপন যথার্থভাবে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া পূর্ণ করতে পারবে।

১.৪.৭ সারাংশ

ড্যানিয়েল লার্নারের ১৯৫৮ সালের বই দ্য পাসিং অফ ট্র্যাডিশনাল সোসাইটি ছিল গণমাধ্যম এবং আধুনিকীকরণ তত্ত্বের একটি ভিত্তিমূলক পাঠ্য। তত্ত্বটি, উন্নয়ন জ্ঞাপনের প্রাথমিক আলোচনার ভিত্তি ছিল। লার্নারের ধারণাগুলি কিছু বিশেষজ্ঞরা যেমন গ্রহণ করেছেন তেমনি কিছু বিশেষজ্ঞরা এই তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জও জানিয়েছেন। পরবর্তীকালে, লার্নার নিজেই তার তত্ত্বের ধারাবাহিক সংশোধন করেন। তার আলোচনার মধ্যে আমরা আধুনিকীকরণের সর্বজনীনতা এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ক্ষমতার একটা বর্ণনা পাই। তার এই ধারণাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এখনো উন্নয়ন জ্ঞাপনের ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে আসছে।

১.৪.৮ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন

১. 'দ্য পাসিং অফ ট্র্যাডিশনাল সোসাইটি: মডার্নাইজিং দ্য মিডল ইস্ট' কার লেখা বই?

টাকা লিখুন

১. ড্যানিয়েল লার্নার

২. উন্নয়ন জ্ঞাপন

বড় প্রশ্ন

১. উন্নয়ন জ্ঞাপন বলতে আমরা কী বুঝি?

২. লার্নারের আধুনিকীকরণের তত্ত্বে সাক্ষরতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল? আলোচনা করুন।

৩. আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে গণজ্ঞাপন কী ভূমিকা পালন করতে পারে?

৪. লার্নারের তত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা কী সমালোচনা করেছেন?

৫. লার্নার তার তত্ত্বে পরবর্তীকালে কী পরিবর্তন এনেছিলেন?

১.৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. লার্নার, ডি. (১৯৫৮). দ্য পাসিং অফ ট্রাডিশনাল সোসাইটি: মডার্নইজিঙ দ্য মিডল ইস্ট.

২. শাহ, এইচ. (২০১১). দ্য প্রোডাকশন অফ মডার্নিজশন:ড্যানিয়েল লার্নার, মাস মিডিয়া, এন্ড দ্য পাসিং অফ ট্রাডিশনাল সোসাইটি। টেম্পল ইউনিভার্সিটি প্রেস.

৩. হ্যানসন, জে., এন্ড নারুলা, ইউ. (২০১৩). নিউ কমিউনিকেশন টেকনোলজিস ইন ডেভেলপিং কান্টিস. রুটলেজ.

৪. মেলকোট, এস. আর., এন্ড স্টিভস, এইচ. এল. (২০০১). কমিউনিকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন থার্ড ওয়ার্ল: থিওরি এন্ড প্রাকটিস ফর এমপাওয়ারমেন্ট. সেজ.

মডিউল ২

উন্নয়নের সূক্ষ্মতা (The Nuances of Development)

একক ১ ❑ গ্রামীণ উন্নয়নের ধারণা, গ্রামীণ উন্নয়নের সরঞ্জাম, গান্ধীবাদী মডেল এবং গ্রাম স্বরাজ

গঠন

২.১.১ উদ্দেশ্য

২.১.২ প্রস্তাবনা

২.১.৩ গ্রামীণ উন্নয়নের ধারণা

২.১.৪ গ্রামীণ উন্নয়নের সরঞ্জাম

২.১.৫ গান্ধীবাদী মডেল এবং গ্রাম স্বরাজ

২.১.৬ সারাংশ

২.১.৭ অনুশীলনী

২.১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.১.১ উদ্দেশ্য

আমরা এই এককে যে বিষয়ে জানবো, সেইগুলি হল :

- গ্রামীণ উন্নয়নের ধারণা
- গ্রামীণ উন্নয়নের সরঞ্জাম
- গান্ধীবাদী মডেল
- গ্রাম স্বরাজ

২.১.২ প্রস্তাবনা

বর্তমানে আমরা এমন এক পৃথিবীতে বসবাস করি, যেখানে আমরা প্রতিনিয়ত তথ্যের বিস্ফোরণ দেখতে পাচ্ছি। প্রফেসর মার্শাল ম্যাকলুহান পাঁচ দশক আগে কল্পনা করেছিলেন যে আমাদের পৃথিবী যোগাযোগ নেটওয়ার্কগুলির সাথে এতটা আন্তঃসম্পর্কিত হবে যে এটি একটি 'বিশ্ব গ্রামে' রূপান্তরিত হবে। ডিজিটাল মিডিয়ার আগমনে, বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যম দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং আমাদের দেশ আজ তথ্য, শিক্ষা, বিনোদন, এবং জনমত গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে

যোগাযোগ বিপ্লবের সাক্ষী হচ্ছে। ভিন্নধর্মী জনগণের কাছে প্রচণ্ড গতিতে পৌঁছানোর ক্ষমতার কারণে নেতারা গ্রামীণ উন্নয়নে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে মিডিয়ার ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

২.১.৩ গ্রামীণ উন্নয়নের ধারণা

কোনো দেশের যদি সত্যিকার অর্থে উন্নয়ন করতে হয়, তাহলে অবশ্যই গ্রামীণ পর্যায়ের উন্নয়ন সবার আগে প্রযোজ্য। আমাদের দেশের গ্রামগুলো শহরের তুলনায় সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়ন সর্বদাই ভারতে সরকারের প্রধান উদ্বেগের বিষয় হয় আসছে। এবং এই বিষয়ে সরকার কিছু এলাকা ভিত্তিক, সম্পদ এবং সম্প্রদায় নির্দিষ্ট কিছু উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের একটি বিস্তৃত বর্ণালী নিম্নে দেওয়া হল :

অর্থনৈতিক উন্নয়ন: কৃষি ও সহযোগী কার্যক্রম: কৃষি কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ফসল উৎপাদন, সেচ উন্নয়ন, শুকনো জমি চাষ, জলাবদ্ধতা ব্যবস্থাপনা, ভূমি সংস্কার এবং জমি পুনরুদ্ধার। সহযোগী কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পশুপালন, পশুসম্পদ উন্নয়ন, দুগ্ধ খামার, রেশম চাষ, মৎস্য, উদ্যানপালন, বৃক্ষরোপণ, বনায়ন ইত্যাদি।

গ্রামীণ ও কুটির শিল্প: খাদি ও গ্রামীণ শিল্প, তাঁত হস্তশিল্প, কয়ার পণ্য ইত্যাদি।

কাঠামোগত উন্নয়ন: শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, যোগাযোগের জন্য রাস্তা, পানীয় জল ইত্যাদি বিপণন সুবিধা, পরিবার কল্যাণ এবং কৃষির জন্য বিদ্যুৎ।

সামাজিক উন্নয়ন: একটি সামগ্রিক গ্রামীণ উন্নয়নের চেতনার সাথে সঙ্গতি রেখে, বৈজ্ঞানিক মেজাজ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সম্প্রদায়ের সচেতনতা এবং সামাজিক গতিশীলতার শক্তিকে শক্তিশালী করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

গ্রামীণ জনগণের সর্বোচ্চ সামাজিক কল্যাণের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এটা অবশ্যই উপলব্ধি করা উচিত যে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার জীবন যথেষ্ট উন্নত না হলে, এটা বলা ভুল হবে যে ভারত তার সামাজিক কল্যাণ লক্ষ্যগুলিকে পূর্ণ করতে অগ্রসর হয়েছে।

তথ্য একটি মূল সম্পদ :

ঐতিহ্যময় গ্রামীণ সমাজে ধীরে ধীরে, সুশৃঙ্খল পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় তথ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। উন্নয়নের সাথে যোগাযোগের একীকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়, যোগাযোগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি জনগণকে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করে এবং তাদের শিক্ষিত করে। তথ্য তাদের উন্নয়নের জন্য অনুপ্রাণিত করে।

উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগের ভূমিকা: ভারত প্রধানত একটি গ্রামীণ অর্থনীতি যেখানে জনসংখ্যার ৭০% এরও বেশি গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে। এটি অত্যন্ত হাস্যকর এবং দুঃখজনক যে ভারতের বেশিরভাগ দরিদ্ররা গ্রামীণ এলাকায় বাস করে।

গ্রামীণ জনসংখ্যার জীবনযাত্রার উন্নতির লক্ষ্যে, ভারত সরকার দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য এবং বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি চালু করেছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন : প্রকৃত অর্থে গ্রামীণ উন্নয়ন মানে অর্থনৈতিক, শিল্প বা কৃষির উন্নয়ন। ১৯৭৫ সালের বিশ্বব্যাংকের গ্রামীণ উন্নয়ন নীতি সেক্টর স্টাডি গ্রামীণ উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করে এই ভাবে '—a strategy designed to improve the economic and social life of a specific group—the rural poor—and involves extending the benefits of development to the poorest among them who seek livelihood in rural areas.' অন্য একটি সংজ্ঞায়, 'গ্রামীণ উন্নয়নকে পরিকল্পিত করা হয়েছে, "গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং প্রক্রিয়াটিকে স্বাবলম্বী করে তোলা।" (Lele, 1975)।

উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **শারীরিক বিকাশ:** যোগাযোগ, পরিবহণ, সেচ, শক্তি, বনায়ন, প্রাণী সংরক্ষণ, পরিবেশ

২. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** কৃষি, ব্যবসা, শিল্প

৩. **সামাজিক উন্নয়ন:** শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, রাজনৈতিক কার্যক্রম; এবং

৪. **স্বাস্থ্য উন্নয়ন:** পুষ্টি, স্যানিটেশন, সম্প্রদায় স্বাস্থ্য, জল এবং বায়ু দূষণ প্রতিরোধ, মাতৃত্ব স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত এই সমস্ত উপরোক্ত কারণগুলির অর্থ হল শোষণ ও সহিংসতা ছাড়াই স্থায়ী ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা জনগণের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন।

গ্রামীণ উন্নয়নের অর্থ সমাজ, সংস্কৃতি এবং পরিবেশ জুড়ে পরিবর্তিত হয়। উন্নত দেশগুলির প্রেক্ষাপটে, গ্রামীণ উন্নয়নের ফোকাস পরিবেশগত অখণ্ডতা সংরক্ষণের উপর; উপযুক্ত ভূমি ব্যবহার; স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা; নান্দনিকভাবে আনন্দদায়ক পরিবেশ; কার্যকর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠান; ন্যূনতম অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরের অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত মানবকল্যাণ।

গ্রামীণ উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মানবসম্পদ। ভারতে মানব সম্পদ প্রচুর, এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য এটিকে সর্বাধিক ব্যবহার করা আবশ্যক। জনগণের অংশগ্রহণেই উন্নয়নের পূর্ণ সুফল পাওয়া সম্ভব।

২.১.৪ গ্রামীণ উন্নয়নের সরঞ্জাম

পরিকল্পিত পরিবর্তন : আমাদের কর্মসূচিগুলি কার্যকরভাবে পরিকল্পনা করার জন্য পরিকল্পিত পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পিত পরিবর্তন এমন কিছু যা একটি পৃথক ব্যবস্থা বা সামাজিক ব্যবস্থায় উন্নতির জন্য একটি উদ্দেশ্যমূলক সিদ্ধান্ত থেকে উদ্ভূত হয় এবং পেশাদারদের নির্দেশনায় অর্জিত হয়। পরিবর্তনের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ না করে, কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তাদের অংশগ্রহণ সীমিত হবে। যেকোনো কর্মসূচিকে জনগণের কর্মসূচী করতে হলে সেই কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

পরিকল্পিত পরিবর্তনের পদক্ষেপ :

কার্ট লেউইন (১৯৪৩) তিনটি ধাপ চিহ্নিত করেন :

১. বর্তমান স্তর আনফ্রিজ করুন

২. নতুন স্তরে যান

৩. নতুন স্তরে ফ্রীজ বা স্থিতিশীল করুন

লিপিট, ওয়াটসন এবং ওয়েস্টলি (১৯৫৮) সালে লেউইনের তিনটি ধাপকে পাঁচটিতে প্রসারিত করেছেন, সেগুলি হল :

১. পরিবর্তনের প্রয়োজনের বিকাশ

২. একটি পরিবর্তন সম্পর্ক স্থাপন

৩. পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করা

৪. পরিবর্তনের সাধারণীকরণ এবং স্থিতিশীলতা

৫. একটি টার্মিনাল সম্পর্ক অর্জন

মিডিয়া চ্যানেল নির্বাচন : উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিবেশন করার জন্য মিডিয়া চ্যানেলগুলির উপযুক্ততা গ্রামীণ দর্শকদের প্রতি তাদের অভিযোজনের উপর নির্ভর করে। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ডিজিটাল মিডিয়া ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলিকে গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে।

পারস্পরিক চ্যানেল: এগুলি হল সেই মাধ্যম যার উপর গ্রামীণ এলাকার মানুষ বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, কারিগর এবং কৃষি শ্রমিকরা উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলির তথ্যের জন্য ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। এই পদ্ধতিতে একজন এক্সটেনশন এজেন্ট প্রতিটি ব্যক্তির পৃথক পরিচয় বজায় রেখে

পৃথকভাবে মানুষের সাথে যোগাযোগ করেন। যেমন খামার এবং বাড়িতে পরিদর্শন, স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিদর্শন ইত্যাদি।

গ্রাম পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মীরা গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বহুমুখী ভূমিকা পালন করে। লোকেদের নতুন ধারণা এবং উদ্ভাবন গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করা এবং তাদের নিজেদেরকে উন্নয়নমূলক সহায়তা পেতে তাদের প্রধান কাজগুলি সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কখনও কখনও তারা জনসংযোগ এজেন্ট এবং কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্য ও ব্যবহৃত হন।

গোষ্ঠী পদ্ধতি : এখানে এক্সটেনশন এজেন্ট ব্যক্তিদের সাথে গোষ্ঠীতে যোগাযোগ করে এবং কোনো পৃথক ব্যক্তি হিসাবে নয়। এই পদ্ধতিটি গৃহীত হয় যখন একই সাথে অনেক লোকের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, ফলাফল প্রদর্শন, পদ্ধতি প্রদর্শন, গ্রুপ মিটিং, ছোট গ্রুপ প্রশিক্ষণ দিবস বা কৃষক দিবস, অধ্যয়ন সফর, সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

গণ পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে, একজন এক্সটেনশন এজেন্ট ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী পরিচয় বিবেচনা না করেই বিশাল এবং ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করে। এই পদ্ধতিগুলি জ্ঞানের বিস্তারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় কমিউনিটি রেডিও এবং টেলিভিশনের প্রসার, সাক্ষরতার বিস্তার, জনস্বাস্থ্য সচেতনতা এবং কৃষকদের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রেরণা বৃদ্ধির কারণে এগুলি ভারতে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই পদ্ধতিগুলি বিপুল সংখ্যক কৃষকদের উন্নত অনুশীলন গ্রহণে সহায়তা করছে।

গ্রামীণ উন্নয়নের নেপথ্যে বিভিন্ন মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও ২টি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হলো:

১) গণমাধ্যম

২) শিক্ষা

গণমাধ্যম : গণমাধ্যম হলো এমন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে খবর দ্রুত বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রামীণ উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা : গণমাধ্যমের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণেই গ্রামীণ সমাজগুলোর জীবনমাত্রার মানোন্নয়ন থেকে শুরু কার অবকাঠামোগত বিভিন্ন উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

১) কৃষি ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা : ভারতের মতো দেশে কৃষি হচ্ছে সম্পদ। ভারতীয় কৃষি সমগ্র অর্থনীতির মেরুদণ্ড। ভারতের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক রূপান্তর অত্যন্ত নির্ভর করে তার কৃষি এবং এর সহযোগী খাতের কর্মক্ষমতার উপর। এই খাত গ্রামীণ জীবিকা, কর্মসংস্থান এবং জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ভারতে জীবিকা নির্বাহের সবচেয়ে বড় উৎস। কর্মসংস্থানের সুযোগের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল ভারতীয় জনসংখ্যার অনুপাত

ভারতের যে কোনও সেক্টরের তুলনায় বেশি কারণ গ্রামীণ পরিবারের ৭০ শতাংশ এখনও তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রাথমিকভাবে কৃষির উপর নির্ভর করে, ৮২ শতাংশ কৃষক ছোট এবং প্রান্তিক। গ্রামের অধিকাংশ পরবারই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আবার গ্রামের অধিকাংশ মানুষই নিরক্ষর। তারা উন্নত প্রযুক্তি, উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশক এর ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে গ্রামীণ দারিদ্র কৃষকদের কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিভিন্ন আঞ্চলিক মিডিয়া কৃষি সম্পর্কিত খবর ছাপানোর মাধ্যমে এবং ইলেকট্রিক মিডিয়া কৃষি সম্পর্কিত খবর সম্প্রচারের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ বিভাগ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান উন্নত করতে নিম্নলিখিত ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করে কৃষকদের শিক্ষিত করছে:

'Mass Media Support to Agriculture Extension of—Sub-Mission on Agriculture Extension'— প্রকল্পটি কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে এবং কৃষকদের উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষিত করার জন্য বাস্তবায়নাধীন। অনুষ্ঠানগুলি ডিডি কিষাণ, ডিডি আঞ্চলিক কেন্দ্রের (১৮টি) মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয় এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওর ৯৬টি এফএম স্টেশনের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়। কৃষির প্রযুক্তিগত দিকগুলিতে কৃষক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমেও 'কেন্দ্রীভূত প্রচার ও সচেতনতা প্রচারণা' চালানো হচ্ছে। টুইটার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি কৃষকদের শিক্ষিত করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

ICAR ইনস্টিটিউট এবং কে ভি কে কৃষকদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উপর ২৮৩টি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে। ICAR একটি ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্ম 'কিষাণ সারথি'ও তৈরি করেছে।

২) শিক্ষা-সম্প্রসারণে গণমাধ্যমের ভূমিকা : নিরক্ষর গ্রামবাসীদের অধিকাংশই মিডিয়ার সুবাদে শিক্ষিত। আমাদের দেশে, প্রায় সব সংবাদপত্রের শিক্ষার জন্য একটি নিবেদিত বিভাগ আছে। এই অংশে শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু ছাপিয়ে গ্রামের বাসিন্দাদের শিক্ষিত করা যেতে পারে। উপরন্তু, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে গ্রামের বাসিন্দাদের শিক্ষিত করে, গ্রামীণ উন্নয়নকে সম্ভবপর করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা, কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি বাধ্যতামূলক শিক্ষা, মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা, ইত্যাদি খবরাখবর গ্রামীণ মানুষ গণমাধ্যমের মাধ্যমে জানতে পারে।

৩) অর্থনীতিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা: গ্রামীণ অর্থনীতিও গণমাধ্যম থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়। গ্রামীণ কৃষকের বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক তথ্যের প্রয়োজন হয়, যেমন বিভিন্ন ফসলের দেশীয় এবং বৈশ্বিক বাজার মূল্য। মিডিয়া বিভিন্ন ধরনের কৃষি পরামর্শ প্রদান করতে পারে, যেমন জমির দাম, বীজের

দাম এবং কীটনাশকের খরচ ইত্যাদি। এতে করে কৃষক তার পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে মধ্য ভোগীদের হাত থেকে রক্ষা পায়।

৪) **জননীতি নির্ধারণ সম্পর্কিত তথ্য জানতে :** দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি ইত্যাদির জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং কার্যকর করে। কিন্তু এটা খুবই পরিষ্কার যে এই সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা থেকে গ্রামীণ জনগণকে বঞ্চিত হতে হয়ে। গণমাধ্যমের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এসব কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারে।

৫) **আইনি এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত তথ্য:** গ্রামীণ বাসিন্দারা বিভিন্ন তথ্য এবং অধিকার সম্পর্কে অবগত নয়। আইন ও মানবাধিকার সম্পর্কিত তথ্য তার মধ্যে অন্যতম। যাইহোক, বর্তমানে বেশ কয়েকটি সংস্থা এই তথ্য সরবরাহ করে। ফলস্বরূপ, গ্রামগুলি অসংখ্য অবিচার, শোষণ, বাল্যবিবাহ, অন্যান্য ধরনের অপরাধ, ইত্যাদি হ্রাসের সম্মুখীন হচ্ছে। গ্রামবাসীরা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে এবং অন্যায়ের বিরোধিতা করতে আগের তুলনায় অনেকটাই প্রস্তুত।

৬) **স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা :** গ্রামবাসীদের অধিকাংশই তাদের স্বাস্থ্যের গুরুত্ব এবং স্বাস্থ্যসেবার সম্পর্কে অবগত নয়। উপরন্তু, দারিদ্র্য এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধার অভাবের কারণে, গ্রামীণ বাসিন্দারা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত। এ ক্ষেত্রে মিডিয়া বেশ সহায়ক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সংবাদপত্র গ্রামীণ বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ খবর বা তথ্য স্বাস্থ্য-ভিত্তিক পৃষ্ঠাগুলিতে ছাপিয়ে অবহিত করতে পারে। টিভি, রেডিও এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে আরও স্বাস্থ্য সচেতন করার উদ্যোগ নিতে পারে।

৭) **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন :** গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিডিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত গ্রাম বাংলার রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট এবং অন্যান্য অবকাঠামো উন্নত করতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। যোগাযোগ খাতে নেটওয়ার্কিংয়ের সুবিধার কারণে আজকাল কৃষকদের হাতেও মোবাইল ফোন এসে গেছে।

৮) **কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে :** কর্মসংস্থানের অভাবের ফলে গ্রামের বেকারত্বের হার প্রতিদিন বাড়ছে। মিডিয়ার সুবাদে গ্রামাঞ্চলের যুবকরা অনেকাংশে কর্মসংস্থান খুঁজে পেতে সক্ষম হচ্ছে। সংবাদপত্র এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে সরকারি এবং বেসরকারি নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন কর্মচারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়। যার মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষিত যুবক এবং শ্রমিকরা কর্মসংস্থান খুঁজে পেতে পারে। অতএব, এটা দাবি করা যেতে পারে যে বেকারত্বের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নে মিডিয়ার উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে।

গ্রামীণ উন্নয়নের মধ্যে সামাজিক ও গ্রামীণ উন্নয়নের সমস্ত দিক অন্তর্ভুক্ত। এই উন্নয়নে গণমাধ্যমের

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। গ্রামের অবহেলিত বাসিন্দারা আগে গণমাধ্যম সম্পর্কে অসচেতন ছিল, কিন্তু বিভিন্ন মাধ্যম এখন বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াচ্ছে।

পূর্বোক্ত বিতর্ক এবং সাধারণ আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে গণমাধ্যম গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কীভাবে যোগাযোগ কার্যকর করা যায় : যোগাযোগ কার্যকর করার জন্য বার্তাটি মনের মধ্যে পরিষ্কার হতে হবে। এর পাশাপাশি কথার চেয়ে কাজের ওপর জোর দিতে হবে। আবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে উভয় পক্ষের (প্রেরক এবং গ্রহণকারী) যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা উচিত এবং প্রেরককে সেই অনুযায়ী বার্তার সময় এবং চ্যানেলের পরিকল্পনা করতে হবে। বিষয়বস্তু অবশ্যই প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। যোগাযোগের চ্যানেলটি উন্মুক্ত ও জীবন্ত রাখতে হবে। গ্রহণকারীর চোখে প্রেরকের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকা উচিত।

গ্রামীণ উন্নয়নে লোক মিডিয়ার ভূমিকা : লোক মিডিয়া মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে আমাদের সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ। গ্রামীণ জনগণের হৃদয়ের কাছাকাছি হওয়ায় এগুলোকে লোক মিডিয়া বলা হয়। গ্রামীণ জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনধারার সাথে সাদৃশ্য থাকায় এই মিডিয়াগুলি প্রকৃত অর্থে অনন্য।

লোক মাধ্যমগুলি বিভিন্ন ধরনের নিয়ে গঠিত—লোকনাট্য, পুতুল নাচ, গল্প বলা, লোক চিত্রকলা, লোকসংগীত এবং মাইম। লোক মিডিয়ার প্রথাগত ব্যবহার ছিল মূলত বিনোদন, সামাজিক পর্যায়ে পারস্পরিক অংশগ্রহণ, ধর্মীয় কর্মকান্ড ইত্যাদির জন্য। তবে গ্রামীণ শ্রোতাদের কাছে যোগাযোগ উন্নয়নমুখী বার্তা প্রদানে লোক মিডিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে এবং আধুনিক গণমাধ্যমের সাথে একীভূত হতে পারে। যোগাযোগের কার্যকারিতা বাড়াতে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশগ্রহণের জন্য লোক মিডিয়াকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

লোক মিডিয়ার সুবিধা :

১. নমনীয়তা : ঐতিহ্যগত মিডিয়া সকলের জন্য উপলব্ধ এবং সাধারণভাবে খুব কম খরচে বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিরা উপভোগ করেন। লোক মিডিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল দৈনন্দিন জীবনে এর নমনীয়তা এবং এটিকে ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প যেমন দেয়ালচিত্র, পুতুলশিল্প, লোকগীতি, নৃত্য, মেলা, বায়োস্কোপ ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্রামীণ উন্নয়নে এর ভূমিকা অপরিসীম।

২. উন্নয়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে : উন্নয়নের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য লোক মিডিয়াকে বিনোদন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৫৪ সালে দেশের পারফরমিং আর্টকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার দায়িত্ব নিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের একটি বাহু হিসাবে Songs and Drama Division এর স্থাপন করা হয়েছিল। Songs and Drama Division বিভাগটি ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসারদের সাথে সহযোগিতায় কাজ করে

যাদের কাজ বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা।

৩. সম্প্রসারণ শিক্ষা : সম্প্রসারণ শিক্ষায় ঐতিহ্যবাহী মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

লোক মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে দেওয়া হল :

১. লোক মিডিয়ার খুব সহজেই গ্রাম বাংলায় পৌঁছানো সম্ভব।

২. এতে একাধিক অনুভূতিপ্রবণ অঙ্গ জড়িত।

৩. জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে কার্যকর পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুবই বেশি।

৪. আগ্রহ জাগানোর ক্ষমতা খুব বেশি।

৫ নতুন নতুন থিম সংযোগ করার ক্ষেত্রে নমনীয়।

৬. অত্যন্ত কম খরচের মিডিয়া।

২.১.৫ গান্ধীবাদী মডেল এবং গ্রাম স্বরাজ

মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে ভারতকে গ্রামে বাস করতে হবে, শহর বা প্রাসাদে নয়। তিনি আরও বলেছিলেন যে, কেন্দ্রে বসে বিশজন লোক দিয়ে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, তবে প্রতিটি গ্রামের মানুষকে নীচে থেকে কাজ করতে হবে। তিনি চেয়েছিলেন প্রতিটি গ্রাম একটি সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র হোক। ভারতের গ্রামীণ উন্নয়নে গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সামগ্রিক এবং জনকেন্দ্রিক। তিনি নৈতিকতার উপর বেশি জোর দিয়েছেন এবং সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের চেয়ে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি দেখতে পান যে দেশের অগ্রগতি নিহিত রয়েছে গ্রামীণ উন্নয়নের উপর। ব্রিটিশ শাসনকালে গ্রামীণ ভারত ছিল অবহেলিত।

তিনি মনে করতেন, গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অর্থ হল ভারতবর্ষ ধ্বংস হয়ে যাওয়া। তিনি সঠিক বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সাথে গ্রামীণ পুনর্গঠন ঘটাতে চেয়েছিলেন। ১৮-দফা গঠনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে, গান্ধীজি ১৯৩৫ সালে ওয়ার্ধার কাছে সেবাগ্রাম কেন্দ্রে তাঁর গ্রামীণ পুনর্গঠন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন।

গ্রামীণ পুনর্গঠনে গান্ধীবাদী কৌশল ছিল গ্রাম স্বরাজ এবং স্বদেশী আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে। গান্ধীজি দ্বারা বর্ণিত গ্রাম স্বরাজের মূল নীতি হল ট্রাস্টিশিপ, স্বদেশী, পূর্ণ কর্মসংস্থান, শ্রম, স্বাবলম্বন , বিকেন্দ্রীকরণ, সমতা প্রভৃতি। এইভাবে গান্ধীবাদী স্বপ্নের আদর্শ গ্রামের ধারণাটি ছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাজনিত। গান্ধীজি মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসার উপর জোর দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আমার মতের স্বরাজ তখনই আসবে যখন আমরা সবাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করব যে আমাদের স্বরাজকে জয় করতে, কাজ করতে এবং বজায় রাখতে শুধুমাত্র সত্য ও অহিংসার

মাধ্যমেই সম্ভব।

গ্রামীণ উন্নয়নের গান্ধীবাদী মডেল নিম্নলিখিত মূল্যবোধ এবং প্রাঙ্গণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে:

১. গ্রামীণ ভারত তার শহরে নয়, তার গ্রামে পাওয়া যায়।

২. গ্রামের পুনরুজ্জীবন তখনই সম্ভব যখন গ্রামবাসীরা আর শোষিত হবে না। গান্ধীজীর মতে শহরবাসীদের দ্বারা গ্রামবাসীদের শোষণ ছিল 'হিংসা'।

৩. সরল জীবনযাপন এবং উচ্চ চিন্তা, বস্তুবাদী চাহিদার স্বেচ্ছায় হ্রাস, এবং জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতিগুলির অনুসরণকে বোঝায়।

৪. শ্রমের মর্যাদা: প্রত্যেককে শারীরিক শ্রম দিয়ে তার রুটি উপার্জন করতে হবে।

৫. (স্বদেশী) পণ্য, পরিষেবা এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারে অগ্রাধিকার।

৬. শেষ এবং উপায়ের মধ্যে ভারসাম্য: গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে শেষ এবং উপায়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় না থাকলে অহিংসা এবং সত্য টিকিয়ে রাখা যায় না।

গান্ধীবাদী মডেলের প্রধান উপাদান : গান্ধীবাদী মডেলের প্রধান উপাদানগুলো নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে:

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম অর্থনীতি : গান্ধীজি ভারতীয় গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর জোর দিয়েছিলেন। স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে তিনি জীবনের একটি মৌলিক নীতি হিসাবে সমর্থন করেছিলেন কারণ নির্ভরতা শোষণ নিয়ে আসে। স্বয়ংসম্পূর্ণতার অভাবে গরীব ধনী দ্বারা, গ্রাম শহর দ্বারা এবং অনুন্নত দেশ উন্নত দেশ দ্বারা শোষিত হয়। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে গ্রামগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উচিত অর্থাৎ তাদের নিজেদের খাদ্য, পোশাক এবং তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরি করা উচিত। তিনি গ্রাম বা কুটির শিল্প এবং হস্তশিল্পের প্রচারের জন্য জোর দিয়েছিলেন কারণ এইগুলি কর্মসংস্থান, গ্রামবাসীদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে এবং গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয়।

গান্ধীজীর স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং অহিংস গ্রাম সমাজ শুধুমাত্র সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে, সংঘাতের ভিত্তিতে নয়। তার মতে যতদূর সম্ভব গ্রামের প্রতিটি কার্যক্রম সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। এমনকি কৃষিক্ষেত্রেও গান্ধীজি সমবায় চাষের প্রস্তাব দেন যা শ্রম, পুঁজি, সংরক্ষণ করবে এবং সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক গ্রামবাসীদের কর্মসংস্থান দেবে এবং উৎপাদনও বাড়াবে। তিনি আরো বলেন, আমাদের অবশ্যই জমির আরও বিভাজন রোধ করতে এবং সমবায় চাষে জনগণকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করতে হবে।'

বিকেন্দ্রীকরণ : গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে মানসিক ও নৈতিক বিকাশের সাথে মানুষের সুখই সমাজের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং এই লক্ষ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের

মাধ্যমে অর্জন করা উচিত। গান্ধীজি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমেই গ্রামীণ প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব। এ ধরনের ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে গ্রাম পঞ্চায়েত এর হাতে রাজ্য এবং জাতীয় রাজধানীতে নয়। প্রতিনিধিরা পাঁচ বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সকল প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা নির্বাচিত হবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পঞ্চায়েত নামে একটি পরিষদ গঠন করবেন।

পঞ্চায়েত আইন প্রণয়ন, কার্যনির্বাহী এবং বিচার বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করবে। এটি গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নিকাশি ব্যাবস্থা দেখাশোনা করবে। পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব হবে 'অস্পৃশ্য' এবং অন্যান্য দরিদ্র লোকদের রক্ষা ও উন্নতি করা। গ্রামের বিষয়গুলি পরিচালনা করার জন্য গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সংস্থানগুলি গ্রাম থেকে উত্থাপিত হবে। গ্রামের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব ও বিবাদের সমাধান করা হবে। এবং যতদূর সম্ভব একটি মামলাও গ্রামের বাইরের আদালতে পাঠানো হবে না।

গ্রামটি তার নিজস্ব বিষয়গুলি পরিচালনা করার পাশাপাশি যে কোনও আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতেও সক্ষম হবে। গ্রাম রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের একটি অহিংস শান্তি বাহিনী সংগঠিত হবে। এই বাহিনী সাধারণ সামরিক গঠন থেকে ভিন্ন হবে। তাদের কাজ অহিংসা এবং ঈশ্বরের প্রতি পরম বিশ্বাস স্থাপন করা।

ন্যায়ে তালিম : গান্ধীজির আধুনিক শিক্ষার প্রতি কোন আস্থা ছিল না, যা শুধুমাত্র সাক্ষরতা এবং তথ্য অর্জনের উপর জোর দেয়। তাই তিনি উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন যাকে তিনি ন্যায়ে তালিম নামে অভিহিত করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ন্যায়ে তালিম শিশুদের এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিকাশে সাহায্য করবে।

সমবায় : গান্ধীজি গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায়কে একটি হাতিয়ার হিসাবে দেখেছিলেন। তিনি কৃষিক্ষেত্রে সমবায়কে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা অর্পণ করেন, সমবায় চাষের প্রচারের প্রশংসা করেন এবং এর ফলে উনি জমির আরও বিভাজন রোধ করতে সফল হন। গান্ধীজি ক্রেডিট, তাঁতি এবং স্পিনার সমবায়ের মতো অন্যান্য ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন।

ট্রাস্টিশিপ: গান্ধীজির বেশিরভাগ অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব্যবহারিক এবং সক্রিয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে দেশের অর্থনৈতিক ভাগ্য গ্রামীণ অর্থনীতির উপর অনেক বেশি নির্ভর করে। ওনার ধারণা ছিল যে জমিদারদের সমাজের বাকি অংশের প্রতি আস্থাভাজন এবং কৃষিক্ষেত্রে নিজেদের প্রজা এবং ভূমিহীন মনে করা উচিত। তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, 'এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। গান্ধীজির অর্থনৈতিক চিন্তার কেন্দ্র ছিল গ্রাম। চরকা, কুটির এবং গ্রামীণ শিল্পের প্রতি তার জেদকে এই পটভূমিতে দেখা উচিত। তিনি কায়িক শ্রমের ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন এবং যন্ত্রের প্রবর্তনের বিরোধিতা করেছিলেন, এই ভয়ে যে তারা মানব শ্রমকে

স্থানচ্যুত করতে পারে। তবে তিনি উপযুক্ত নতুন প্রযুক্তির ভূমিকার প্রশংসা করেছিলেন যদি কিনা সেটা কর্মসংস্থানের স্তর এবং জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।

স্যানিটেশন : গান্ধীজির গ্রামে জনস্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন এর উপর জোর দিয়েছিলেন। স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ সামগ্রী দিয়ে যে বাড়িগুলি তৈরি করা হবে সেগুলিতে পর্যাপ্ত আলো এবং বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি বাড়ি বা কুটিরে গৃহপালিত পশুর জন্য শাক-সবজি চাষের জন্য একটি উঠান থাকতে হবে। গ্রামের রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার রাখতে হবে।

২.১.৬ সারাংশ

আমরা এই এককে যে বিষয়গুলি জানলাম, সেইগুলি হল :

- গ্রামীণ উন্নয়নের ধারণা
- গ্রামীণ উন্নয়নের সরঞ্জাম
- গান্ধীবাদী মডেল
- গ্রাম স্বরাজ

২.১.৭ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

টীকা লিখুন :

ক. সামাজিক উন্নয়ন

খ. উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগের ভূমিকা

গ. গ্রামীণ উন্নয়ন

ঘ. মিডিয়া চ্যানেল নির্বাচন

ঙ. পারস্পরিক চ্যানেল

চ. কৃষি ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা

ছ. শিক্ষা-সম্প্রসারণে গণমাধ্যমের ভূমিকা

জ. স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা

ঝ. গণমাধ্যমের ভূমিকা

ঞ. গ্রামীণ উন্নয়নে লোক মিডিয়ার ভূমিকা

ট. লোক মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি

ঠ. গ্রাম স্বরাজ

ড. গান্ধীবাদী মডেলের প্রধান উপাদানগুলি

বড় প্রশ্ন

ক. গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন?

খ. 'কোনো দেশের যদি সত্যিকার অর্থে উন্নয়ন করতে হয়, তাহলে অবশ্যই গ্রামীণ পর্যায়ের উন্নয়ন সবার আগে প্রযোজ্য' আপনি কী এই বাক্যের সাথে সহমত? উদাহরণ সাপেক্ষে উত্তর দিন।

গ. গ্রামীণ উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করুন।

ঘ. গ্রামীণ উন্নয়ন কাকে বলে? এর বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন।

ঙ. গ্রামীণ উন্নয়নে যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমগুলি বর্ণনা করুন।

চ. গ্রামীণ উন্নয়নে লোক মাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করুন।

ছ. গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর ধারণা আলোচনা করুন।

২.১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. লার্নার, ডি. (১৯৫৮). দ্য পাসিং অফ ট্রাডিশনাল সোসাইটি: মডার্নইজিঙ দ্য মিডল ইস্ট.

২. শাহ, এইচ. (২০১১). দ্য প্রোডাকশন অফ মডার্নিজশন:ড্যানিয়েল লার্নার, মাস মিডিয়া, এন্ড দ্য পাসিং অফ ট্রাডিশনাল সোসাইটি। টেম্পল ইউনিভার্সিটি প্রেস.

৩. হ্যানসন, জে., এন্ড নারুলা, ইউ. (২০১৩). নিউ কমিউনিকেশন টেকনোলজিস ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিস. রুটলেজ.

৪. মেলকোট, এস. আর., এন্ড স্টিভস, এইচ. এল. (২০০১). কমিউনিকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন থার্ড ওয়ার্ল: থিওরি এন্ড প্রাকটিস ফর এমপাওয়ারমেন্ট. সেজ.

একক ২ ❑ টেকসই উন্নয়ন, মানব উন্নয়ন পদ্ধতি, উন্নয়নের বাহক হিসেবে সংস্কৃতি

গঠন

২.২.১ উদ্দেশ্য

২.২.২ প্রস্তাবনা

২.২.৩ টেকসই উন্নয়ন কাকে বলে?

২.২.৪ মানব উন্নয়ন পদ্ধতি

২.২.৫ উন্নয়নের বাহক হিসেবে সংস্কৃতি

২.২.৬ সারাংশ

২.২.৭ অনুশীলনী

২.২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.২.১ উদ্দেশ্য

আমরা এই এককে যে বিষয়ে জানবো, সেইগুলি হল :

- টেকসই উন্নয়ন
- মানব উন্নয়ন পদ্ধতি
- উন্নয়নের বাহক হিসেবে সংস্কৃতি

২.২.২ প্রস্তাবনা

টেকসই উন্নয়ন হল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশের গুণাগুণ বিসর্জন না করে একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি কৌশল। অর্থনৈতিক অগ্রগতির নামে বায়ু ও জল দূষণ, মাটির ক্ষয় এবং অন্যান্য পরিবেশগত অবনতির কারণে ক্ষতির মূল্য পরিশোধ করা হয়। টেকসই উন্নয়ন মূলত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে গৃহীত একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা।

২.২.৩ টেকসই উন্নয়ন কাকে বলে?

টেকসই উন্নয়ন হলো একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন যা বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজনীয়তা পূরণের পাশাপাশি

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণে বিশেষ জোর দেয়। মোটকথা, টেকসই উন্নয়ন হল একটি উন্নয়ন কৌশল যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের ফলে যেন প্রাকৃতিক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ প্রকৃতিকে ঠিক রেখে উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদন করা হয়। টেকসই উন্নয়ন পরিবেশ সংরক্ষণ এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক ও মানব উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ মানের শিক্ষা দিয়ে দারিদ্র্য হ্রাস করা। পুরুষ ও মহিলা সহযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজ থেকে লিঙ্গ ভারসাম্যহীনতা দূর করা।

প্রেক্ষাপট : পরিবেশগত ও উন্নয়নমূলক সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সেসব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য ১৯৮৩ সালে United Nations, নরওয়ের ২৯তম প্রধানমন্ত্রী গ্রো হারলেম ব্রুন্ডল্যান্ডকে প্রধান করে একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে Brundtland Commission গঠন করে। সরকারি নথিতে এটির শিরোনাম ছিল 'World Commission on Environment and Development'. এই কমিশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সমস্ত স্বাধীন দেশের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের প্রচার করা। এই কমিশন ১৯৮৭ সালে 'Our Common Future' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে 'টেকসই উন্নয়ন' সম্পর্কে প্রথম সংজ্ঞা প্রদান করা হয়।

"Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

অর্থাৎ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা পূরণের সম্ভাবনা বা সক্ষমতার সাথে কোন ধরনের আপোস না করে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করাকে টেকসই উন্নয়ন বলা হয়। তারপর থেকে, টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আবির্ভূত হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ: টেকসই উন্নয়ন হল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশ ব্যবহার করে জীবনযাত্রার মান বাড়ানো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করা। কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে, স্থিতিশীল উন্নয়ন অর্জন করতে নিম্নলিখিত বিষয় গুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া খুব জরুরী—

১) স্থিতিশীল পরিবেশ

২) স্থিতিশীল পৃথিবী

৩) স্থিতিশীল মানব উন্নয়ন

৪) স্থায়ী শান্তি ও বিকাশ

৫) স্বল্প অপচয়

৬) টেকসই প্রযুক্তি

রিও ডি জেনেইরো 'আর্থ সামিট' (এছাড়াও জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়নের সম্মেলন নামে

পরিচিত) আনুষ্ঠানিকভাবে টেকসই উন্নয়নকে ১৯৯২ সালে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়।

সম্মেলনের ফলাফল নিম্নলিখিত নথি ছিল:

The Framework Convention on Climate Change

The Convention on Biological Diversity

The Statement on Forest Principles

The Rio Declaration

Agenda 21

২০৩০ সালের মধ্যে ১৭টি আন্তঃসংযুক্ত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কৌশল ২০১৫ সালে নেওয়া হয়ে। এই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য দূরীকরণ বিশুদ্ধ জল, মানব স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং টেকসই শক্তি।

টেকসই উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য: স্থিতিশীল বা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয় কয়েকটি লক্ষ্য অনুসরণ করে।

১. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার

২. জীববৈচিত্র্যর সংরক্ষণ

৩. সামাজিক ন্যায় বজায় রেখে সম্পদের ব্যবহার করা

৪. সম্পদের পুনঃব্যবহার

৫. মানুষের গুণগত মানের বিকাশ — ভালো স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উচ্চ মাথা পিছু আয়

৬. পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলির উপর একটি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা

৭. বিশ্বের সম্পদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জনগণকে বোঝান।

৮. স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য সকলের অংশগ্রহণ আবশ্যক

সৌজন্য : টেকসই উন্নয়ন কি? টেকসই উন্নয়নের উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য Grammar Hub (grammarbd.com)

২.২.৪ মানব উন্নয়ন পদ্ধতি

উন্নয়ন একটি সামাজিক কর্মকান্ড। সমাজকে ঘিরে যে ব্যক্তিরা রয়েছেন তাদের কর্মকান্ডই পতিফলিত হয় তাদের সমাজ বিন্যাসে। সুতরাং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ যে জরুরি সে কথা বলার

অপেক্ষা রাখে না। জ্ঞাপন বা যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে বাদ দিয়ে এই বিশাল কর্মকান্ড সুষ্ঠভাবে পরিচালনা এবং উন্নয়নকে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। মানব উন্নয়নের নিরিখে মানুষই প্রধান বিচার্য। মানুষের বৈচিত্র্য ও যে পরিসরে তারা কাজ করছেন তার স্বশাসনের বিচারে মানব উন্নয়নের অভিমুখ ক্রমশ বস্তুমুখিনতা থেকে ব্যক্তিমুখীনতায় প্রবর্তিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের অভিমত, উন্নয়ন-এর যে ধারা লক্ষ্য করা গেছে তার সিংহভাগই উঁচু থেকে নিচুতে পর্যবসিত যেখানে মানুষের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ কম।

মানব অভিমুখী উন্নয়ন এক প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের আহ্বান জানায় যেখানে রাষ্ট্র সমাজের তৃণমূলস্তর থেকে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে আসবে। বস্তুত সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নই উন্নয়নকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায়। মানুষের ন্যূনতম ও মৌলিক সক্ষমতা ও স্বাধীনতার ভিক্তিতে এজাতীয় উন্নয়ন মানুষকেই মানব উন্নয়নের বাহক হিসেবে চিহ্নিত করে।

১৯৯০ সালে প্রকাশিত উদ্বোধনী মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন মানব কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য একটি অভিনব কৌশল প্রবর্তন করে। যে অর্থনীতিতে মানুষ বাস করে তার সম্পদের দিকে মনোযোগ না দিয়ে, মানব উন্নয়ন বা মানব উন্নয়ন পদ্ধতি মানুষের অস্তিত্বকে সমৃদ্ধ করতে চায়। এটি একটি জন-কেন্দ্রিক কৌশল। মানব বিবর্তন মানুষের জীবনকে উন্নত করাকে অগ্রাধিকার দেয় এই অনুমান করে যে বর্ধিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সকলের জন্য আরো বেশি উপযোগী হবে।

মানব উন্নয়নের জন্য চারটি পদ্বতি রয়েছে। যেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল:

আয়ের পদ্বতি (Income Approach) : মানুষের বৃদ্ধির প্রথম দিকের একটি পদ্ধতি হল আয়ের পদ্ধতি। আয় পদ্ধতির ভিত্তি হল যে আয় এবং উন্নয়ন একে অপরের সাথে জড়িত। ফলস্বরূপ, একজন ব্যক্তির স্বাধীনতার পরিমাণ তার আর্থিক স্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

কল্যাণমূলক পদ্ধতি (Welfare Approach) : মানব উন্নয়নের জন্য কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে না দেখে সুবিধাভোগী হিসেবে দেখে। উন্নয়নের জন্য কল্যাণমূলক পদ্বতি সরকারকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং আরো অনেক ক্ষেত্রে আরও বেশি ব্যয়ের জন্য ইঙ্গিত দেয়। কল্যাণ পদ্ধতি অনুসারে, সরকারের সামাজিক ব্যয় বাড়ানোর মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বাড়ানো এবং উন্নয়নকে উতাহিত করার দায়িত্বে রয়েছে।

মৌলিক চাহিদা পদ্ধতি (Basic Needs Approach) : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা মানব উন্নয়নের জন্য মৌলিক চাহিদা পদ্ধতির প্রস্তাব করেছে। আবাসন, জল সরবরাহ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং শিক্ষা এই পদ্ধতির অধীনে তালিকাভুক্ত ছয়টি অপরিহার্য বিষয়। পূর্বে উল্লিখিত ছয়টি ক্ষেত্র মৌলিক প্রয়োজনীয়তার পদ্ধতির দ্বারা লক্ষণীয়, যা মানুষের পছন্দের বিষয়টিকে উপেক্ষা করে।

সক্ষমতা পদ্ধতি (Capability Approach) : অমর্ত্য সেন, বিখ্যাত ভারতীয় অর্থনীতিবিদ, মানব

উন্নয়নে সক্ষমতার পদ্ধতির বিকাশের জন্য কৃতিত্বপ্রাপ্ত। সক্ষমতা পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সম্পদ সংগ্রহের মতো ক্ষেত্রগুলিতে মানুষের সক্ষমতা তৈরি করা মানুষের বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানব উন্নয়ন পরিমাপ : মানব উন্নয়ন সূচক তৈরি করেছেন অর্থনীতিবিদ মাহবুব উল হক। আয়ু সূচক, শিক্ষা সূচক এবং আয় সূচকের উপর ভিত্তি করে সূচকটি দেশগুলিকে মানব উন্নয়নের চারটি স্তরে স্থান দেয়। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি, ২০১০ সালে, মানব উন্নয়ন সূচক গণনা করার জন্য একটি নতুন পদ্ধতি ব্যবহার শুরু করে। এইচডিআই গণনা করতে ব্যবহৃত তিনটি সূচক হল— আয়ু সূচক, শিক্ষা সূচক (মানে স্কুলে পড়ার বছর এবং স্কুলে পড়ার প্রত্যাশিত বছর), এবং আয় সূচক।

মানব উন্নয়ন সূচক Human Development Index (HDI): HDI মূলত জনগণ এবং তাদের ক্ষমতার ফলে একটি দেশের উন্নয়নের মূল্যায়ন করে। এইখানে একা অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে দেখা হয় না। HDI মানব উন্নয়নের মূল মাত্রাগুলির গড় অর্জনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিমাপ প্রদান করে যেমন একটি দীর্ঘ এবং স্বাস্থ্যকর জীবন, মানুষের জ্ঞান অর্জন এবং একটি পরিমিত জীবনযাত্রার মান। HDI এই তিনটি মাত্রার প্রতিটির স্বাভাবিক সূচকের জ্যামিতিক গড় দ্বারা নির্ধারিত হয়। স্বাস্থ্যের মাত্রা জন্মের সময় আয়ুর দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়, শিক্ষার মাত্রা ২৫ বছর বা তার বেশি বয়সের মানুষজনদের স্কুলে পড়ার বছর এবং স্কুলে প্রবেশকারী বাচ্চাদের স্কুলে পড়ার প্রত্যাশিত বছরগুলির গড়ের মাধ্যমে মাপা হয়। জীবনযাত্রার মান মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (gross national income per capita) দ্বারা মাপা হয়। HDI আয়ের লগারিদম ব্যবহার করে, যার ফলে GNI বৃদ্ধির সাথে আয়ের কমতি গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়। এই তিনটি HDI এর সূচকগুলির ফলাফলগুলিকে জ্যামিতিক গড় ব্যবহার করে একটি যৌগিক সূচকে একত্রিত করা হয়। HDI কে জাতীয় নীতি নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। এইখানে প্রশ্নটা মূলত দুটি দেশকে কেন্দ্র করে হতে পারে যাদের মাথাপিছু GNI একই স্তরের কিন্তু তাদের মানব উন্নয়ন ফলাফল একে ওপরের থেকে আলাদা এই বৈপরীত্যগুলি সরকারের নীতি অগ্রাধিকার সম্পর্কে বিতর্ক তৈরি করতে পারে। HDI মানব উন্নয়ন বলতে আমরা যা বুঝি তার শুধুমাত্র একটি অংশকে সহজ ভাবে তুলে ধরে। এটি বৈষম্য, দারিদ্র্য, মানব নিরাপত্তা, ক্ষমতায়ন ইত্যাদির প্রতিফলন তুলে ধরে না।

HDRO মানব উন্নয়ন, অসমতা, লিঙ্গ বৈষম্য এবং দারিদ্র্যের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিস্তৃত প্রতিনিধিত্ব করে একটা সংযুক্ত সূচক প্রদান করে। অন্যান্য সূচক যেমন লিঙ্গ বৈষম্য সূচক Gender Inequality Index (GII) এবং মানব স্বাধীনতা সূচক Human Freedom Index (HFI) প্রায় একই ভাবে কাজ করে।

(সৌজন্য—সুস্মিতা পণ্ডিত)

এটি দেখা যায় যে, একটি দেশের আকার এবং মাথাপিছু আয় তার মানব উন্নয়নের স্তরের উপর

সামান্য প্রভাব ফেলে। যখন মানব উন্নয়নের কথা আসে, ছোট দেশগুলি প্রায়শই ধনী দেশগুলিকে ছাড়িয়ে যায়। মানব উন্নয়ন সূচক হিসাবে আন্তর্জাতিক তুলনা ব্যবহার করে অন্যান্য দেশের সাথে একটি দেশের বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন মূল্যায়ন করা হয়।

মানব উন্নয়ন পদ্ধতির স্তর : মানব বিকাশের তিনটি স্তর রয়েছে। দেশগুলি উচ্চ-স্তরের উন্নয়ন গোষ্ঠী, মাঝারি-স্তরের উন্নয়ন গোষ্ঠী এবং নিম্ন-স্তরের উন্নয়ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত।

উচ্চ-স্তরের উন্নয়ন গোষ্ঠী :

যে দেশগুলো মানব উন্নয়ন সূচকে শীর্ষে রয়েছে তারা এই উন্নয়ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

- এই দেশগুলি উচ্চতর স্থান পেয়েছে কারণ তারা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ করেছে।
- জনগণকে সুশাসন প্রদানে উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চতর বিনিয়োগ রয়েছে।
- এই জাতীয় দেশের উদাহরণ হল— নরওয়ে, আয়ারল্যান্ড, আইসল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি এবং সুইডেন।

মাঝারি উন্নয়ন গোষ্ঠী :

- মানব উন্নয়নের মাঝারি স্তরে অন্তত ৪০টি দেশ রয়েছে।
- এই দেশগুলির বেশিরভাগই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গঠিত হয়েছিল। এই দেশগুলির অনেকগুলি হয় উপনিবেশ ছিল বা সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হওয়ার পরে গঠিত হয়েছিল।
- সামাজিক বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে এই দেশগুলি এইচডিআইতে উচ্চতর স্থান পেয়েছে।
- এই উন্নয়ন গোষ্ঠীর অনেক দেশই আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার সঙ্গে লড়াই করেছে।
- মাঝারি স্তরের উন্নয়ন গোষ্ঠীর উদাহরণ হল— ব্রাজিল, মেক্সিকো, ভারত, তিউনিসিয়া, ভিয়েতনাম এবং মরক্কো।

নিম্ন-স্তরের উন্নয়ন গ্রুপ :

- চল্লিশটি দেশ নিম্ন-স্তরের উন্নয়ন গ্রুপের অংশ।
- এগুলি ছোট দেশ যারা সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।
- নিম্ন-স্তরের উন্নয়ন গোষ্ঠীর উদাহরণ হল- সুদান, লাইবেরিয়া, আফগানিস্তান, সিরিয়া এবং পাকিস্তান।

মানব উন্নয়ন বলতে এমন উন্নয়ন বোঝায় যা মানুষের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং তাদের সুযোগ প্রসারিত করে। মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে চারটি পন্থা রয়েছে যেগুলি হল আয় পদ্ধতি, কল্যাণ পদ্ধতি, সক্ষমতা পদ্ধতি এবং মৌলিক চাহিদা পদ্ধতি। মানব উন্নয়ন সূচক মানব উন্নয়ন পরিমাপের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সূচক।

২.২.৫ উন্নয়নের বাহক হিসেবে সংস্কৃতি

সংস্কৃতি বলতে প্রচলিত আমরা বুঝি গান, বাজনা, নাটক, চলচ্চিত্র, নানা-আঙ্গিকের নৃত্যশিল্পী অথবা সংস্কৃতি বলতে বুঝি সংস্কৃত মানুষের আচরণ। অর্থাৎ সভ্যতা, আদাব-কায়দা, এবং দেশজ রীতি-নীতি ইত্যাদি। কিন্তু পাশ্চাত্য সংজ্ঞানুসারে মানুষের সমস্ত জীবনচর্চাই সংস্কৃতি।

'সংস্কৃতি' শব্দটি জ্ঞানের পরিধি, লোককাহিনী, ভাষা, নিয়ম, আচার, অভ্যাস, জীবনধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস এবং রীতিনীতির জটিল সংমিশ্রণকে বোঝায় যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছু বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষের সাথে সংযুক্ত ও তাদেরকে একটি সাধারণ পরিচয় দেয়।

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'সংস্কৃতি হল সভ্যতার তরুর পুষ্প ফুল দিয়ে যেমন গাছ চেনা যায়, তেমনি সংস্কৃতি দিয়ে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ নিবিড়। সংস্কৃতির রূপ দেখে চেনা যায় সমাজকে। যেমন বাঙালি সমাজ চেনা যায় বাঙালি সংস্কৃতি দিয়ে। পয়লা বৈশাখ, দুর্গাপূজা, জামাই ষষ্ঠীর মধ্যে লুকিয়ে আছে বাঙালি সংস্কৃতি। এর পরিচয় যদি বুঝতে পারো তাহলে বাঙালির পরিচয় বোঝা হবে সহজ।

মানব সমাজে সংস্কৃতির ভূমিকা কী, তা অনুধাবন করা যায় সামাজিকীকরণের মধ্যে দিয়ে। মানুষ নিজেকে যত সমাজের সঙ্গে একাত্ব করে, ততো.....করে সংস্কৃতিকে। ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আচার-আচরণ, অভ্যাস, রুচি পছন্দের সঙ্গেও প্রতিদিন পরিচয় ঘটতে থাকে, সামাজিক শিক্ষার প্রক্রিয়া হলো সংস্কৃতি পাঠের ক্লাসরুম। সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও লোকাচার। উন্নততরো জীবনযাপনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই হলো প্রধান লক্ষ্য।

সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রথা, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ। উত্তরাধিকার পরম্পরায় বহে চলে এই সংস্কৃতি চেতনা। তবে সমাজ যেহেতু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে তাই সাংস্কৃতিক চালচিত্রও পাল্টে যায়। মূল্যবোধের, সত্তাবোধেরও বদল ঘটে। ফলে চেতনাও পরিবর্তিত হয়। বিশ্ব .... সীমান্ত বিস্তৃত হয়ে নতুন পরিবতনের দিশা দেখা যায়।

সমস্ত সামাজিক সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি বিকশিত করে। এমনকি দুইজন ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যেও সময়ের সাথে সাথে তাদের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। যেমন দুজন মানুষের ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব কিংবা আবেগপ্রবণ প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। যেখানে দুই

ব্যক্তির তাদের নিজস্ব অতীত, তাদের অভিজ্ঞতা, ভাষা, আচার, অভ্যাস এবং রীতিনীতি তৈরি করে আর এই রীতিনীতিগুলি সম্পর্কটিকে একটি বিশেষ চরিত্র দেয় এমন একটি চরিত্র যা তাকে অন্যান্য সম্পর্কের থেকে ভিন্ন করে বা আলাদা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বিশেষ তারিখ, স্থান, গান বা কিছু ঘটনাসমূহ যা দুটি ব্যক্তির জন্য অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু তারা কিছু প্রতীকী অর্থ তাদের কাছে নিয়ে আসে। একই রকম ভাবে গোষ্ঠীগুলিও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ করে, যা নিয়ম, আচার, রীতিনীতি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সংগ্রহের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং সামাজিক পরিচিতি গড়ে তোলে। সংস্থাগুলিরও নিজের সংস্কৃতি রয়েছে, যা প্রায়শই তাদের পোশাকের নির্দিষ্ট প্যাটার্ন, কর্মক্ষেত্রের বিন্যাস, মিটিং শৈলী এবং নেতৃত্বের পদ্ধতি, সংগঠনের প্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ইত্যাদির দ্বারা স্পষ্ট হয়। সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং জটিল সংস্কৃতি হল সেগুলি যেগুলি একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত। 'সংস্কৃতি' শব্দটি সাধারণত ভাষা এবং ভাষা-ব্যবহারের ধরণ, আচার, নিয়ম এবং রীতিনীতি সহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। একটি সামাজিক বা জাতীয় সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা এবং চরিত্র, সরকারের ধ্যানধারণা, সামাজিক রীতিনীতি, পারিবারিক অনুশীলন, ধর্ম, অর্থনৈতিক দর্শন এবং অনুশীলন, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এবং আইনের ধারণা ও ব্যবস্থার মতো উপাদানগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

যে কোনও সামাজিক ব্যবস্থা তা একটি সম্পর্ক, গোষ্ঠী, সংস্থা বা সমাজ যাই হোক না কেন সময়ের সাথে সাথে তাদের একটি সংস্কৃতি তৈরী হয়ে ওঠে। যদিও প্রতিটি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অনন্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত সংস্কৃতির কিছু প্রচলিত বৈশিষ্ট আছে যা তারা একে ওপরের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। এই ধরনের তিনটি বৈশিষ্ট যা জ্ঞাপনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা হলঃ (১) ব্যক্তিদের একে অপরের সাথে সংযুক্ত করা, (২) একটি সাধারণ পরিচয়ের ভিত্তি প্রদান করা এবং (৩) সদস্যদের মধ্যে আলোচনার জন্য একটি প্রেক্ষাপট তৈরি করা।

সংস্কৃতি আত্মবাদী। নিজের সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে সবথেকে যৌক্তিক, স্বাভাবিক এবং বোধগম্য বলে ধরে নেওয়ার একটি প্রবণতা মানুষজনের মধ্যে রয়েছে। এটি ধরে নেওয়া হয় যে যদি কোনো সংস্কৃতি, তা অন্য কোনো গোষ্ঠী, সংস্থা অথবা সমাজের থেকে কিছুটা ভিন্ন হয়, সেই ক্ষেত্রে ওই পার্থক্যগুলি প্রায়শই নেতিবাচক, অযৌক্তিক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থহীন বলে বিবেচনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি এমন এক সাংস্কৃতিক পরিবেশে অভ্যস্থ হন যেখানে আবেগপ্রবণ সম্পর্কের মধ্যে থাকলে জনসমক্ষে স্নেহের প্রদর্শন খুবই প্রচলিত, তবে সেই ব্যক্তির অন্যান্য ব্যক্তিদের, বিশেষত যারা মূলত বেশি রক্ষণশীল সংস্কৃতি থেকে এসেছেন, তাদের আচরণগুলি অদ্ভুত, এমনকি অনুপযুক্ত বলেও মনে হতে পারেনা সাংস্কৃতিক ভিন্নতার জন্য। একই রকম ভাবে, যে ব্যক্তিরা কোনো একটি সংস্থার লৌকিকতাবর্জিত সভায় অংশগ্রহণ করে অভ্যস্ত তারা মনে করতে পারে যে আনুষ্ঠানিক বৈঠকের নিয়ম অত্যন্ত কৃত্রিম এবং তা মেনে চলাটা অত্যন্ত বিস্ময়কর। আবার, একটি প্রতিষ্ঠানে যেখানে

কর্মচারীরা প্রতিদিন স্যুট-টাই পরেন তারা যখন এমন একটি প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে যেখানে কর্মচারীরা নিজের ইচ্ছা মতো যে কোনো পোশাক পড়তে পারে, সেই ক্ষেত্রে তারা এই নতুন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা বিষয়ে সমালোচনা করতে পারে। অর্থাৎ যদিও সমস্ত সাংস্কৃতিক উপাদান মূলত একই যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসে, তবুও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, অনেক ব্যক্তির প্রবণতা হল 'ভিন্ন' কে 'ভুল' হিসেবে মনে করা সময়ের সাথে সাথে সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়। প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃতিতে সবসময়ই একটা রূপান্তর ঘটছে— যদিও এই পরিবর্তনটি কখনও কখনও খুব ধীর এবং অপ্রত্যক্ষ ভাবে হয়। অনেকরকমের শক্তি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে। আমরা যেমন আগেই উল্লেখ করেছি যে সংস্কৃতি যোগাযোগ বা জ্ঞাপনের মাধ্যমে তৈরি হয়, এবং ব্যক্তিদের মধ্যেকার যোগাযোগের ফলে সংস্কৃতি আবার সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিতও হয়। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সময় প্রতিটি ব্যক্তি আবার অন্য (অতীত ও বর্তমান) সংস্কৃতির সদস্যতা থেকে তার নিজের অভিজ্ঞতাগুলির একটি কাঠামো নিয়ে আসে। এক অর্থে, নতুন সম্পর্ক, গোষ্ঠী, সংস্থা বা সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যেকার যে কোনো আলোচনা আসলে একটি আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগের ঘটনা, এবং এই বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানগুলি সময়ের সাথে ব্যক্তি এবং সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতি এক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে অন্য সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বার্তাগুলির গতিবিধিকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তোলে। একইসাথে, সংস্কৃতি স্বল্প পরিসরে বা ব্যাপক উপায়ে একে অপরকে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রভাবিত করে। 'ওয়ার্ল কমিউনিটি' এবং 'গ্লোবাল ভিলেজ' এই সব বাক্যাংশের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিই আন্তঃসাংস্কৃতিক প্রভাব এবং পরিবর্তনের অনিবার্যতার প্রমাণ দেয়।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে 'স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ' করার কথা বলা হয়েছে তা শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা উন্নয়ন নয়। সেই সমৃদ্ধি এমন সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিধা নিশ্চিত হবে।

২.২.৬ সারাংশ

আমরা এই এককে যে বিষয়গুলি জানলাম, সেইগুলি হল :

- টেকসই উন্নয়ন
- মানব উন্নয়ন পদ্ধতি
- উন্নয়নের বাহক হিসেবে সংস্কৃতি

২.২.৭ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

টীকা লিখুন :

i. Brundtland Commission

ii. রিও ডি জেনেইরো 'আর্থ সামিট'

iii. টেকসই উন্নয়ন

iv. টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য

v. উন্নয়ন

vi. মানব উন্নয়ন

vii. মানব উন্নয়ন পরিমাপ

viii. মানব উন্নয়ন সূচক Human Development Index (HDI)

ix. সংস্কৃতি

বড় প্রশ্ন

i. টেকসই উন্নয়ন কাকে বলে? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

ii. মানব উন্নয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

iii. 'সময়ের সাথে সাথে সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়।' উন্নয়নের বিচারে এই বাক্যের সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২.২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. লার্নার, ডি. (১৯৫৮). দ্য পাসিং অফ ট্রাডিশনাল সোসাইটি: মডার্নইজিঙ দ্য মিডল ইস্ট.

২. শাহ, এইচ. (২০১১). দ্য প্রোডাকশন অফ মডার্নিজশন:ড্যানিয়েল লার্নার, মাস মিডিয়া, এন্ড দ্য পাসিং অফ ট্রাডিশনাল সোসাইটি। টেম্পল ইউনিভার্সিটি প্রেস.

৩. হ্যানসন, জে., এন্ড নারুলা, ইউ. (২০১৩). নিউ কমিউনিকেশন টেকনোলজিস ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিস. রুটলেজ.

৪. মেলকোট, এস. আর., এন্ড স্টিভস, এইচ. এল. (২০০১). কমিউনিকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন থার্ড ওয়ার্ল: থিওরি এন্ড প্রাকটিস ফর এমপাওয়ারমেন্ট. সেজ.

একক ৩ ❑ উন্নয়নে অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি

গঠন

২.৩.১ উদ্দেশ্য

২.৩.২ প্রস্তাবনা

২.৩.৩ উন্নয়নে অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি

২.৩.৪ সারাংশ

২.৩.৫ অনুশীলনী

২.৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২.৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা উন্নয়নে অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করবো। আমরা জানবো:

- প্রত্যেক স্টেকহোল্ডারের কাছে অংশগ্রহণ কী?
- উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ, এবং
- কাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ?
- কাদের অংশগ্রহণ করার কথা বলা হচ্ছে?
- অংশগ্রহণ কখন প্রাসঙ্গিক, এবং কাদের জন্য?

২.৩.২ প্রস্তাবনা

অংশগ্রহণ মানে অনেক মানুষের কাছে অনেক কিছু হতে পারে। টেকসই এবং সফল উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণ একটি অপরিহার্য বিষয়, কিন্তু কোথা থেকে শুরু করতে হয় সেখানেই সমস্যা। এতে অনেকেই নিশ্চিত অংশগ্রহণ আবশ্যক, কিন্তু কিভাবে এটি সহজতর করা যায় সে সম্পর্কে তাদের কাছে খুব কম তথ্য উপলব্ধ আছে।

অংশগ্রহণ এর সংজ্ঞা— স্টেকহোল্ডারদের কাছে উন্নয়নে অংশগ্রহণের সম্পর্কে খুব ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। তাই, উন্নয়ন অনুশীলনকারীদের অংশগ্রহণের বিষয়ে তাদের ধারণাগত পদ্ধতির বিষয়ে স্পষ্ট হওয়ার জন্য, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন :

প্রত্যেক স্টেকহোল্ডারের কাছে অংশগ্রহণ কী?

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ, এবং কাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ?

কাদের অংশগ্রহণ করার কথা বলা হচ্ছে?

অংশগ্রহণ কখন প্রাসঙ্গিক, এবং কাদের জন্য?

অংশগ্রহণের জন্য সবচেয়ে সাধারণ সীমাবদ্ধতা কী?

কিভাবে একটি সফল অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করা সম্ভব?

অংশগ্রহণের সংজ্ঞা সম্পর্কে কোনো ঐক্যমত নেই: এটির প্রয়োগ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। কিছু স্টেকহোল্ডার অংশগ্রহণকে সংজ্ঞায়িত করে জ্ঞান, ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক বন্টনের অন্যায্য শ্রেণীবিন্যাস দূর করতে জনগণের ঐক্যচেতনা হিসাবে। অন্যরা এটিকে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের নকশা এবং বাস্তবায়নে প্রাসঙ্গিক গোষ্ঠীর নাগাল এবং অন্তর্ভুক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে।এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি প্রধানত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের দিকে ইঙ্গিত করে। তবে তাদের সুযোগ এবং পদ্ধতি, ভিন্ন হতে পারে।

কেন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির প্রয়োজন? এই বিষয় বেশ কিছু উত্তর দেওয়া যেতে পারে। উপরে উল্লিখিত প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে, অংশগ্রহণকে একটি সম্প্রদায়ের বাইরের কারো দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উপরে উল্লিখিত সামাজিক আন্দোলনের জন্য, অংশগ্রহণ নিজেই একটি ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া হিসাবে একটি লক্ষ্য হতে পারে।

অংশগ্রহণ কমপক্ষে তিনটি স্তরের ফলাফল তৈরি করে:

(ক) ব্যক্তিগত মনো-সামাজিক স্তর

(খ) জীবন দক্ষতার স্তর, দক্ষতা অর্জনের উপর জোর দেয়

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক স্তর বা সম্প্রদায়ের উন্নয়নের স্তর

উন্নয়ন প্রকল্পে একটি পদ্ধতি হিসেবে অংশগ্রহণ

এই এককটি অন্বেষণ করবে যে কীভাবে অংশগ্রহণকে আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে শুরু করে সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সংস্থাগুলি ব্যবহার করতে পারে। এটা সবাই বুঝতে পেরেছে যে অংশগ্রহণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলির একটি অপরিহার্য হাতিয়ার।

কার্যকরভাবে মৌলিক পরিষেবা প্রদান : সরকারি বা বেসরকারি পরিষেবার ব্যবস্থার প্রক্রিয়া—যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন, কৃষি সম্প্রসারণ এবং জল। এটি এমন কৌশলগুলি অন্তর্ভুক্ত করে যা প্রান্তিক কমিউনিটির জন্যও সাশ্রয়ী এবং অন্তর্ভুক্ত।

অ্যাডভোকেসি লক্ষ্যগুলি অনুসরণ করা : সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ভালো প্রভাব ফেলে। এই তথ্যে অর্জনের জন্য একটি মূল উপাদান হল সুশীল সমাজ এবং স্থানীয় শাসন উদ্যোগের সমর্থন, যেমন জনসাধারণের বাজেটে জনপ্রিয় অংশগ্রহণ এবং ব্যক্তি ও

সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন কর্মসূচি যা প্রান্তিক গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করে। অধিকন্তু, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এনজিও কার্যকলাপ হিসাবে অ্যাডভোকেসি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

লক্ষ্যের দিকে নিরীক্ষণ : এই কার্যক্রমগুলির মধ্যে রয়েছে স্ব-প্রতিবেদন স্কিম এবং নিরীক্ষণ প্রক্রিয়াগুলিতে সরাসরি সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা।

স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির শেখার সুবিধা প্রদান— কথোপকথন, শেখার এবং সমালোচনার সুযোগগুলি একটি প্রকল্প বা প্রোগ্রামের মূল্যায়নের কেন্দ্রীয় উপাদান হয়ে ওঠে।

কাদের অংশগ্রহণ করার কথা বলা হচ্ছে?

অংশগ্রহণকারীরা পরিবার, সম্প্রদায় ভিত্তিক স্বার্থ গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকার, সরকারি এবং বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান, জাতীয় নীতি নির্ধারক, আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় দাতা প্রতিষ্ঠান, সেইসাথে সিভিল সোসাইটি সংস্থাগুলি।

কিভাবে অংশগ্রহণ ঘটছে?

এটি অংশগ্রহণের গুণগত মাত্রাগুলিকে নির্দেশ করে, যার মধ্যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জড়িত—অংশগ্রহণের পিছনে অনুপ্রেরণা কী? প্রক্রিয়ার অসুবিধা কী এবং কিভাবে সেটার থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে? এবং এটাতে কি নির্ভরতা কমছে এবং দায়িত্বকে উৎসাহিত করছে?

সাধারণ পরামর্শ থেকে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অংশগ্রহণের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের নির্দিষ্ট মাত্রা একটি আলোচনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

অংশগ্রহণ ঘটছে--কোন পর্যায়ে?

অংশগ্রহণের প্রকৃত চেতনা তখনই অর্জিত হতে পারে যখন জনগণ শুরু থেকেই জড়িত থাকে।

একটি গবেষণা পরীক্ষায় জানা গেছে, লোকেরা অংশগ্রহণের চারটি পর্যায়ে জড়িত থাকে:

—প্রয়োজন সনাক্তকরণে অংশগ্রহণ;

—প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য, সুবিধা এবং খরচ, অবস্থান ইত্যাদির মতো প্রোগ্রাম ডিজাইনে অংশগ্রহণ;

—বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ; এবং

—ভাগাভাগিতে অংশগ্রহণ

কিভাবে অংশগ্রহণ সহজতর হয়?

অংশগ্রহণমূলক পন্থা, পদ্ধতি, সরঞ্জাম, কার্যকলাপ এবং মনোভাব সম্পর্কিত পরিবর্তনগুলি ন্যায়সঙ্গত এবং চাহিদা চালিত অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সহজতর করতে পারে। অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করার জন্য এবং সম্মিলিত কার্যক্রম অব্যাহত আছে তা নিশ্চিত করার জন্য, স্টেকহোল্ডারদের ক্ষমতা, বিশেষ করে স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে জোরদার করা উচিত। এ ক্ষেত্রে সরকার ও দাতা সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.৩.৩ উন্নয়নে অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি

১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে, উন্নয়নজীবীরা বুঝতে শুরু করেছিলেন যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সাথে যুক্ত বেশিরভাগ ব্যর্থতা প্রকল্পগুলির নকশা, প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া থেকে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে বাদ দেওয়ার সাথে যুক্ত ছিল। এটি আবিষ্কৃত হয়েছে যে সমস্ত ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকেরা সক্রিয়ভাবে উন্নয়ন প্রকল্পে অংশ নিয়েছিলেন, সেখানেই কম সম্পদের মাধ্যমে অনেক বেশি উন্নয়ন সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল।

এই আবিষ্কারটি দুটি চিন্তাধারার বিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে: প্রথমটি এই ধারণার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যে যখন স্থানীয় লোকেরা একটি উন্নয়ন প্রকল্পে জড়িত থাকে, তখন তাদের উন্নয়ন বা পরিষেবার সাথে সমর্থন ও সম্মত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং তাই সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ অনুভূত হয়। দ্বিতীয়টি একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে উপলব্ধি করে, যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ক্ষমতায়ন, সম্মিলিত পদক্ষেপ এবং প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য একত্রিতকরণের সূচনা।

১৯৮৩ সালে রেপিড রুরাল অ্যাপপ্রাইসল (RRA) প্রবর্তনের সাথে সাথে, উন্নয়ন সংস্থাগুলি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মধ্যে তাতণিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বছরের পর বছর ধরে উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সাফল্যের জন্য অংশগ্রহণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, আজ, 'জনগণের অংশগ্রহণ' বা 'জনপ্রিয় অংশগ্রহণ'-এর মতো শব্দগুলি সরকারি বিভাগ, এনজিও, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সহ একাধিক উন্নয়ন সংস্থার অভিধানের একটি সাধারণ অংশ হয়ে উঠেছে।

আর্নস্টাইনের টাইপোলজি : উন্নয়ন প্রকল্পে 'অংশগ্রহণ'কে প্রথম শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল শেরি আর্নস্টাইন দ্বারা প্রস্তাবিত 'ল্যাডার অফ সিটিজেন পার্টিসিপেশন' এ (আর্নস্টেইন, ১৯৬৯)। এখানে আর্নস্টাইন সম্প্রদায় অংশগ্রহণের আটটি স্বতন্ত্র এবং বিস্তৃত স্তরকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

আর্নস্টাইনের যুক্তি ছিল যে অংশগ্রহণ, ক্ষমতার পুনর্বণ্টনের অভাবে, যারা ক্ষমতাধারী তাদের জন্য একটি হতাশাজনক এবং একটি শূন্য প্রক্রিয়া।

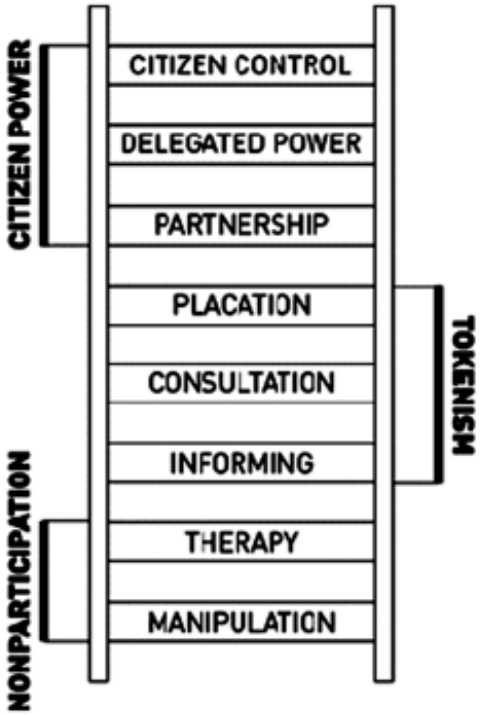

Figure 1 The Ladder of Citizen Participation, Arnstein, (1969)

আর্নস্টেইন তার নাগরিক অংশগ্রহণের টাইপোলজিকে একটি রূপক মই হিসাবে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে প্রতিটি আরোহী স্তর একটি উচ্চ স্তরের নাগরিক সংস্থা, ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণের প্রতিনিধিত্ব করে। অংশগ্রহণের আটটি স্তরের সাথে, তিনি অংশগ্রহণমূলক ক্ষমতার জন্য একটি বর্ণনামূলক ধারাবাহিকতা অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা 'অ-অংশগ্রহণ' (কোনও ক্ষমতা নেই), 'টোকেনিজম' (জাল ক্ষমতা) থেকে 'নাগরিক শক্তি' (অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত ক্ষমতা) স্তরে চলে যায়। অংশগ্রহণ সবচেয়ে অনুকূল হয়ে ওঠে যখন এটি আর্নস্টাইনের মইতে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য পদক্ষেপ অর্জন করতে সক্ষম হয়। যাইহোক, এটা অবশ্যই লক্ষ করা উচিত যে এই অর্জনের স্তর প্রতিটি সমস্যার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে, এবং সমস্যাগুলির পার্থক্যের উপর নির্ভর করে একই এলাকার মধ্যে আরও কয়েকটি স্তর সহ-অস্তিত্ব করতে পারে।

অ-অংশগ্রহণ (Non-Participation)

ম্যানিপুলেশন : অংশগ্রহণের এই রূপটি অলীক, এবং তখন ঘটে যখন কর্মকর্তারা, সরকারি প্রতিষ্ঠান বা প্রশাসকরা সক্রিয়ভাবে জনগণকে এই বিশ্বাসে বিভ্রান্ত করে যে তাদের একটি পদ্ধতির অংশ হিসাবে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে নাগরিকদের ক্ষমতাহীন করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে।

থেরাপি : অ-অংশগ্রহণের এই রূপটি ঘটে যখন প্রশাসক এবং সরকারি কর্মকর্তারা 'অনুমান করে যে মানসিক অসুস্থতা শক্তিহীনতার সমার্থক' এবং ছদ্ম-অংশগ্রহণমূলক প্রোগ্রামগুলি বিকাশ করে যা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে নাগরিকরা নিজেরাই এই সমস্যাটি তৈরি করে, যখন এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত যে প্রতিষ্ঠানগুলি এবং তাদের নীতি নাগরিকদের জন্য সমস্যা তৈরি করে।

টোকেনিজম

তথ্য প্রদান : অর্ধ-অংশগ্রহণের এই রূপের মধ্যে নাগরিকদের 'আইনসম্মত শব্দচয়ন, অসারতা এবং' আধিকারিকদের মর্যাদার মাধ্যমে কর্মকর্তাদের দ্বারা ভয় দেখানো হয় যাতে তারা তাদের দেওয়া তথ্যগুলিকে 'সত্য' হিসাবে গ্রহণ করতে বা উত্থাপিত প্রস্তাবগুলিকে অনুমোদন করতে রাজি হয়। যদিও আর্নস্টেইন স্বীকার করেছেন যে বৈধ জনগণের অংশগ্রহণের দিকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ যেখানে তারা বিকল্প এবং সংশ্লিষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে, কিন্তু তিনি এটাও বলেন যে তথ্যের এই প্রবাহ প্রায়শই একমুখী প্রকৃতির হয়— কর্মকর্তা থেকে মানুষ বা নাগরিক যেখানে কোনো প্রতিক্রিয়া মাধ্যমের উপস্থিতি বা আলোচনার সুযোগ নেই।

পরামর্শ : আর্নস্টেইন উল্লেখ করেছেন যে নাগরিকদের মতামত আমন্ত্রণ জানানো তাদের সম্পূর্ণ অংশগ্রহণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তা সত্ত্বেও, যখন নাগরিকদের সাথে পরামর্শের প্রক্রিয়াগুলি অংশগ্রহণের অন্যান্য মাধ্যমগুলিকে জড়িত করে না, তখন এই স্তরটি জাল শক্তির একটি অংশ থেকে যায় কারণ নাগরিকদের ধারণা এবং উদ্বেগগুলিকে বিবেচনায় নেওয়া হবে কিনা সে সম্পর্কে কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না। প্রায়শই, ক্ষমতাধারীরা জনসাধারণের শুনানি, আশেপাশের মিটিং বা মনোভাব

সমীক্ষার জন্য নাগরিকদের পরামর্শের জন্য আধা-পদ্ধতি ব্যবহার করে। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপে, নাগরিকরা, যাদের প্রাথমিকভাবে পরিসংখ্যানগত বিমূর্ততা হিসাবে দেখা হয়, 'অংশগ্রহণে অংশগ্রহণ করে', যখন ক্ষমতাধারীরা সফলভাবে 'জনগণের অংশগ্রহণের' প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি অতিক্রম করার লক্ষ্য সুরক্ষিত করে।

স্থানান্তর : লোকেদের একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমিত স্তরের প্রভাব মঞ্জুর করা হলে স্থানান্তর ঘটে,

কিন্তু তাদের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে বা বহুলাংশে টোকেনিস্টিক যেখানে নাগরিকরা তাদের সম্পৃক্ততাকে 'প্রদর্শন' করার জন্য সামান্যভাবে জড়িত। যদি এই লোকেদের একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার কাছে দায়বদ্ধ না রাখা হয়, এবং যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন ঐতিহ্যগতভাবে শক্তিশালী অভিজাতদের দখলে থাকে, তাহলে 'কোনো ভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব নয়।

নাগরিক শক্তি

অংশীদারিত্ব : অংশীদারিত্ব হিসাবে অংশগ্রহণ তখন ঘটে যখন কর্মকর্তা, প্রশাসক বা পাবলিক প্রতিষ্ঠানগুলি নাগরিকদের আরও ভাল চুক্তি পেতে, তহবিল ভাগ করে নিতে, ভেটো সিদ্ধান্ত বা অনুরোধ জানানোর সুযোগ দেয় যা আংশিকভাবে পূরণ হয়। পাওয়ারহোল্ডার এবং নাগরিকদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এই স্তরে ক্ষমতা পুনরায় বিতরণ করা হয়। তারা অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে পরিকল্পনা কমিটি এবং যৌথ নীতি বোর্ডের মতো প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে সম্মত হয়। আর্নস্টেইন উল্লেখ করেছেন যে অংশীদারিত্বের অনেক পরিস্থিতিতে, ক্ষমতাধারীদের দ্বারা স্বেচ্ছায় ভাগ করার পরিবর্তে সম্প্রদায়ের প্রচারণা, প্রতিবাদ এবং এমনকি বিপ্লব সংগঠিত করার মাধ্যমে 'জনগণের দ্বারা ক্ষমতা নেওয়া হয়।'

অর্পিত ক্ষমতা : অর্পিত ক্ষমতা হিসাবে অংশগ্রহণ তখন ঘটে যখন প্রশাসক, কর্মকর্তা বা সরকারি প্রতিষ্ঠান কিছু স্তরের নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ব্যবস্থাপনা, বা নাগরিক তহবিল ত্যাগ করে। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষমতার অর্পণ ঘটে যখন একটি নাগরিক বোর্ডকে শুধুমাত্র কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত একটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের পরিবর্তে একটি কমিউনিটি প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রদান করে। নাগরিক নিয়ন্ত্রণ আর্নস্টেইনের মতে, যখন বাসিন্দারা বা অংশগ্রহণকারীরা একটি প্রোগ্রাম বা একটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যখন ব্যবস্থাপনা এবং নীতিগত দিকগুলির সম্পূর্ণ দায়িত্বে থাকে, সেই সাথে এমন শর্তগুলির সাথে আলোচনা করার ক্ষমতা রাখে যার অধীনে 'বহিরাগতরা' তাদের পরিবর্তন করতে পারে, তখনই অংশগ্রহণ নাগরিক নিয়ন্ত্রণ স্থান নেয়। উদাহরণস্বরূপ, নাগরিক নিয়ন্ত্রণের পরিস্থিতিতে, জনসাধারণের তহবিল আদর্শভাবে একটি কমিউনিটি সংস্থার কাছে প্রবাহিত হবে, যা তহবিলের বরাদ্দের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখবে।

প্রিটির টাইপোলজি : আর্নস্টাইনের ধারণা কে আরো বিস্তারিত করে, জুলস এন. প্রিটি অংশগ্রহণের

আরেকটি টাইপোলজির প্রস্তাব করেছেন যেখানে অংশগ্রহণমূলক যোগাযোগের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রদর্শন করা হয় এবং অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াটি টোকেনিজম থেকে স্বাধীন নাগরিক কর্মের দিকে অগ্রসর হওয়ার উপায় প্রদর্শন করে। প্রস্তাবিত অংশগ্রহণের টাইপোলজির শ্রেণিবিন্যাস নিচে দেওয়া হল :

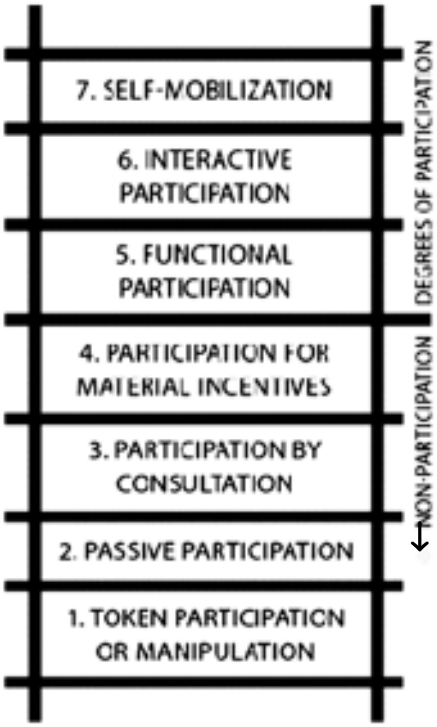

Figure 2 Pretty's Typology of Participation– Pretty. J.N. (1995)

অ-অংশগ্রহণ

টোকেন অংশগ্রহণ বা ম্যানিপুলেশন :

এক্সট্রাক্টিভ গবেষকরা জরিপ, প্রশ্নাবলী বা অনুরূপ পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রশ্ন করেন যার উত্তর নাগরিকরা দেন। এই নাগরিকদের কোন কার্যধারাকে প্রভাবিত করার সুযোগ দেওয়া হয় না, কারণ ফলাফলগুলির সঠিকতা যাচাই করা হয় না এবং সেটি সম্প্রদায়ের সাথে ভাগও করা হয় না। প্যাসিভ অংশগ্রহণ প্রশাসক বা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তারা নাগরিকদের কোনো প্রতিক্রিয়া বিবেচনা না করেই একতরফাভাবে নাগরিকদের কাছে ঘোষণা করেন কী কী ইতিমধ্যে ঘটেছে বা ঘটবে। যে তথ্য ভাগ করা হয় তা শুধুমাত্র বহিরাগত পেশাদারদের জন্য সীমিত।

পরামর্শ দ্বারা অংশগ্রহণ : এই অংশগ্রহণটি বাইরের এজেন্টদের দ্বারা পরামর্শ নেওয়া নাগরিকদের

দ্বারা সঞ্চালিত হয়, যারা সমস্যা এবং তার সমাধান উভয়ই সংজ্ঞায়িত করে। এই পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া জনগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো অংশগ্রহণ করে না এবং প্রশাসকদের নাগরিকদের উপলব্ধি বিবেচনা করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। উপাদান প্রণোদনার জন্য অংশগ্রহণ নাগরিকরা সম্পদ প্রদান করে অংশগ্রহণ করে, উদাহরণস্বরূপ, নগদ, বা অন্যান্য উপাদান প্রণোদনা। অনেক সময় দেখা যায় কৃষকরা জমি প্রদান করে, কিন্তু কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে শেখার প্রক্রিয়ায় তাদের বিবেচনা করা হয় না।

অংশগ্রহণের মাত্রা

কার্যকরী অংশগ্রহণ : নাগরিকরা একটি প্রকল্পের সাথে যুক্ত পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য গোষ্ঠী তৈরি করে অংশগ্রহণ করে, যা বহিরাগত সংস্থাগুলির দ্বারা সূচিত প্রচার বা উন্নয়নে জড়িত থাকতে পারে। সাধারণত, এই অংশগ্রহণ প্রকল্প চক্রের প্রাথমিক পর্যায়ে ঘটে না, বরং পরবর্তী পর্যায়ে ঘটে যখন প্রধান সিদ্ধান্তগুলি ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে।

ইন্টারেক্টিভ অংশগ্রহণ : নাগরিকদের দ্বারা গঠিত দলগুলি যৌথ বিশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে, যা কাজের পরিকল্পনা এবং নতুন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করে, বা যা বিদ্যমান সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করে। এই অংশগ্রহণের মধ্যে আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতি রয়েছে যা একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নজর দেয় এবং কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত শিক্ষার প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যবহার করে। গোষ্ঠীগুলি স্থানীয় সিদ্ধান্তগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাই, নাগরিকরা স্থানীয় অনুশীলন বা কাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণে অংশীদারিত্ব উপভোগ করে।

স্ব-সংহতকরণ : পদ্ধতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নাগরিকরা বাহ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাধীন উদ্যোগ গ্রহণ করে অংশগ্রহণ করে। নাগরিকরা প্রযুক্তিগত পরামর্শ এবং তাদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সংস্থানগুলির জন্য বহিরাগত সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ তৈরি করে, তবে কীভাবে সংস্থানগুলি ব্যবহার করা হবে তার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। এই ধরনের সম্মিলিত পদক্ষেপ এবং স্ব-প্রবর্তিত সংহতকরণ ক্ষমতা বা সম্পদের বিদ্যমান ন্যায়সঙ্গত বণ্টনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে বা নাও পারে।

২.৩.৪ সারাংশ

অংশগ্রহণের একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। অংশগ্রহণমূলক যোগাযোগের বিভিন্ন পদ্ধতির জটিল গতিশীলতা বোঝার জন্য আর্নস্টাইন এবং প্রিটির প্রস্তাবিত বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল অংশগ্রহণমূলক যোগাযোগের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়।। সংক্ষেপে, অংশগ্রহণমূলক যোগাযোগ জনগণ বা নাগরিকদের উন্নয়নের নিউক্লিয়াস হিসাবে বিবেচনা করে। এই ধরনের উন্নয়নের লক্ষ্য হল নাগরিকদের উন্নতি প্রক্রিয়ায় সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ করা এবং শিক্ষিত করা যাতে তারা সমষ্টিগতভাবে তাদের সম্প্রদায়কে উন্নীত করতে সক্ষম হয়।

২.৩.৫ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন

১. আর্নস্টাইন প্রস্তাবিত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি কী?

২. প্রিটির প্রস্তাবিত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি কী?

৩. ইন্টারেক্টিভ অংশগ্রহণ কী?

৪. উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণের তাৎপর্য কী?

বড় প্রশ্ন

১. আর্নস্টাইনের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. প্রিটির অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. উন্নয়নে নাগরিক অংশগ্রহণ বলতে আমরা কি বুঝি?

২.৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. Alam, M. J. (2023). Restoration of degraded peat swamp forest through community participation: the case of Raja Musa Forest Reserve, North Selangor, Malaysia (Doctoral dissertation, University of Nottingham).

২. Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of planners, 35(4), 216-224.

৩. Barahona, C. (2022). Participatory numbers. In Revolutionizing Development (pp. 197-202). Routledge.

৪. Cornish, L., Dunn, A. (2009). Creating knowledge for action: the case for participatory communication in research. Development in Practice, 19(4-5), 665-677.

৫. Egiwirantia, E. D., Destrity, N. A. (2023). Participatory Development Communication for Family Food Security during the Covid-19 Pandemic. Jurnal ASPIKOM, 8(1), 29-44.

৬. Fox, S. (2014). Is it time to update the definition of political participation?.

৭. Huesca, R. (2008). Tracing the history of participatory communication approaches to development: A critical appraisal. Communication for development and social change, 180.

৮. Jodoi, K., 2023. The Correlations Between Parliamentary Debate Participation, Communication Competence, Communication Apprehension, Argumentativeness, and Willingness to Communicate in a Japanese Context. Argumentation, pp.1-28.

৯. Koskimaa, V., Rapeli, L., Himmelroos, S. (2023). Decision-makers, advisers or educable subjects? Policymakers perceptions of citizen participation in a Nordic democracy. Governance.

১০. Mason, G., Niewolny, K. L. (2022). Participation and empowerment as emancipatory praxis: an ethnographic study of an NGO in Chiapas, Mexico. Development in Practice, 32(5), 671-683.

১১. McLean, I., McMillan, A. (2009). The concise Oxford dictionary of politics. OUP Oxford.

১২. Mefalopulos, P., Kamlongera, C. (2004). Participatory communication strategy design: A handbook. Food Agriculture Org.

১৩. Méndez, M., Zuñiga, M. E. (2023). Understanding Challenges to Health Equity in Climate Action and Land Use Planning. American Journal of Public Health, 113(2), 177-178.

১৪. Nyama, V., Mukwada, G. (2023). Factors Affecting Citizen Participation in Local Development Planning in Murewa District, Zimbabwe. Journal of Asian and African Studies, 58(3), 421-437.

১৫. Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. World development, 23(8), 1247-1263.

১৬. Pretty, J., Attwood, S., Bawden, R., Van Den Berg, H., Bharucha, Z. P., Dixon, J., ... Yang, P. (2020). Assessment of the growth in social groups for sustainable agriculture and land management. Global Sustainability, 3, e23.

১৭. Servaes, J., Malikhao, P. (2005). Participatory communication: The new paradigm. Media global change. Rethinking communication for development, 91-103.

১৮. Srampickal, J. (2006). Development and participatory communication. Communication Research Trends, 25(2), 3-33.

১৯. Termansen, T., Bloch, P., Tørslev, M. K., Vardinghus-Nielsen, H. (2023). Spaces of participation: Exploring the characteristics of conducive environments for citizen

participation in a community-based health promotion initiative in a disadvantaged neighborhood. Health Place, 80, 102996.

২০. Tufte, T., Mefalopulos, P. (2009). Participatory communication: A practical guide (Vol. 170). World Bank Publications.

২১. Varwell, S. (2023). Valhalla and Nirvana: Views of Arnstein's ladder of citizen participation in further and higher education. In Advancing Student Engagement in Higher Education (pp. 262-280). Routledge.

২২. Waisbord, S. (2008). The institutional challenges of participatory communication in international aid. Social identities, 14(4), 505-522.

২৩. Willness, C. R., Boakye-Danquah, J., Nichols, D. R. (2023). How Arnstein's Ladder of Citizen Participation Can Enhance Community-Engaged Teaching and Learning. Academy of Management Learning Education, 22(1), 112-131.

একক ৪ ❑ উন্নয়ন-স্বাধীনতা, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গঠন

২.৪.১ উদ্দেশ্য

২.৪.২ প্রস্তাবনা

২.৪.৩ উন্নয়ন-স্বাধীনতা

২.৪.৪ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

২.৪.৫ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

২.৪.৬ সারাংশ

২.৪.৭ অনুশীলনী

২.৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা যে বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করবো :

- স্বাধীনতা হিসাবে উন্নয়ন
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

২.৪.২ প্রস্তাবনা

প্রচলিত ব্যবস্থা এবং তত্ত্বসমূহের অনুসারে উন্নয়নের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমটি হল সুপরিচিত, ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি, যেখানে জিডিপি একটি উন্নয়ন সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ের মৌলিক নীতি হল শিল্প ও কলকারখানা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রযুক্তির সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করা উচিত, যার ফলে তাদের নিজস্ব চাহিদা মেটানো এবং রাষ্ট্রীয় আয় ও জিডিপি বৃদ্ধি করা। এই পন্থায় ঈস্পিত লক্ষ্য হলো যে কোনো মূল্যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন, আর সেটি অর্জনের জন্য বিসর্জিত হয় অনেক রক্ত ও ঘাম। এই বলিদান, রক্ত ও ঘাম কিসের জন্য? উচ্চ আয়ের দেশ হতে হবে যে! দেশের সবাই ধনী না হওয়া পর্যন্ত এই 'উন্নয়নের' দক্ষযজ্ঞ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

২.৪.৩ উন্নয়ন-স্বাধীনতা

উন্নয়নের মাপকাঠি কী হবে, এটা একটা বিতর্কিত বিষয়। কেউ মনে করেন একটা দেশ কতটা বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে তা দিয়ে উন্নয়নের মাত্রা টের পাওয়া যায়। বিপ্লবের পর উন্নয়ন বোঝাতে লেনিন এমনটাই ভেবেছিলেন। পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যারা বিচার করেন, তাদের অভিমত হল জিডিপি দিয়ে উন্নয়নের গতিপথ নির্ধারণ করতে হবে। আবার অমর্ত্য সেনের মতো অর্থনীতিবিদ মনে করেন, শুধুমাত্র জিডিপি দিয়ে উন্নয়নের খোঁজ পাওয়া যাবে না। প্রকৃত উন্নয়নের চিত্র পাওয়া যাবে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা উপভোগ করার মধ্যে দিয়ে।

ভারতের মতো দেশে এক শতাংশের হাতে রয়েছে বিপুল ধন সম্পত্তি। এখানে জিডিপি সূত্র প্রয়োগ করলে দেখা যাবে মাথা পিছু আয় (২০২২-২৩) বছরে ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা, বাস্তবে কিন্তু এটা নয়। কারণ সেই জিডিপির গল্পে আম্বানি, আদানি, টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কার হাতে যে বিপুল অর্থ আছে তা ভাগ হয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। যে সমস্ত মানুষ এক বেলা এক মুঠো অন্ন পায় না জিডিপির হিসাবে তারাও বছরে লক্ষ টাকার উপর আয় করছে।

অমর্ত্য সেন মনে করেন মানুষের কাছে পছন্দের স্বাধীনতা থাকবে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে মানুষ পছন্দ মতো সিদ্ধান্ত নেবে। এটা সম্ভব যখন মানুষ নূন্যতম শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাবে। শিক্ষার আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে। তাই তিনি জন কল্যাণকেই উন্নতি পরিমাপ করার মানদণ্ড বিবেচনা করেন। জন কল্যাণের আধারের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি, মৃত্যুর হার, মা ও ছেলের স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়। বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে তিনি একটি উদহারণ দিয়েছেন। সেটি হলো গড় আয়। আফ্রিকান মার্কিনরা কেরালার জনগণের চেয়ে বিত্তশালী, কিন্তু কেরালার গড় মৃত্যুর বয়েস যেখানে ৭০, সেখানে আফ্রিকান মার্কিনদের গড় মৃত্যুর বয়েস ৪০, কম বিত্তশালী হয়েও কেরালা কিন্তু এগিয়ে আছে।

অসাম্য কমিয়ে এনে মানুষের স্বাধীনতা যদি নিশ্চিত করা যায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীদের ক্ষমতায়ন যদি বাস্তবায়িত করা যায় তাহলেই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। মাও সে তুং বলেছিলেন নারীরা হলো অর্ধেক আকাশ, অর্থাৎ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটা যদি করা যায় তাহলে উন্নয়নের খোঁজ পাওয়া যাবে।

সামাজিক পরিসরের চিত্র কী সেটা বোঝা না গেলে উন্নয়নের চিত্রও পাওয়া যাবে না। সামাজিক পরিসরের মধ্যে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ উপাদান হলো স্বাধীনতা যা হল গণতন্ত্রের ভিত্তি। কীভাবে আমাদের দেশ চলবে সেটা ঠিক করবো আমরা। এটাই হলো গণতন্ত্রের প্রথম ও শেষ কথা। সমস্ত মানুষের আর্থ-সামাজিক মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শুধুমাত্র জিডিপি দিয়ে তা হবে না। স্বাধীনতার মাধ্যমেই তা করতে হবে। আমাদের ভারতীয় সংবিধানে এই সামাজিক মঙ্গলের ইঙ্গিত দেওয়া আছে। ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসির মধ্যে রয়েছে সামাজিক মঙ্গল প্রতিষ্ঠার দিক-নির্দেশ। এখনও হয়তো সবটুকু করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু সম্ভাবনার আশা অবশ্যই আছে।

২.৪.৪ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) হল ১৮৯টি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র দ্বারা ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে নির্ধারিত আটটি লক্ষ্য এবং যেগুলি ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করতে সম্মত হয়েছিল। সহস্রাব্দ ঘোষণাটি সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সদর দফতর নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক সম্মেলনে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। উপস্থিত ১৪৯টি আন্তর্জাতিক নেতারা রোগ, ক্ষুধা, দারিদ্র, নিরক্ষরতা, নারীর প্রতি বৈষম্য এবং পরিবেশগত অবক্ষয় মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এমডিজিগুলি এই ঘোষণাপত্র থেকে নেওয়া হয়েছিল, এবং নির্দিষ্ট সূচক এবং লক্ষ্যগুলি তাদের সাথে সংযুক্ত ছিল।

সহস্রাব্দ উন্নয়নের আটটি লক্ষ্য নিম্নে দেওয়া হলো :

১. চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করা;

২. বিশ্বব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন;

৩. নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতা উন্নীত করা;

৪. শিশু মৃত্যুহার কমাতে;

৫. মাতৃস্বাস্থ্য উন্নীত করা;

৬. ম্যালেরিয়া, এইচআইভি/এইডস এবং অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা;

৭. পরিবেশগত স্থায়িত্ব উন্নীত করা; এবং

৮. উন্নয়নের জন্য সর্বজনীন অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

সহস্রাব্দ ঘোষণার এই আটটি অধ্যায়ের বাস্তবায়ন ১লা জানুয়ারী ২০০১ সালে শুরু করতে সম্মত হয়েছিল এবং জাতিসংঘ এমডিজি অর্জনের দিকে তার অগ্রগতি মূল্যায়ন করার জন্য প্রতি পাঁচ বছরে এই ধরনের শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করতে সম্মত হয়েছিল। মিলেনিয়াম সামিটের প্রথম ফলো-আপ ২০০৫ সালে বিশ্ব সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২.৪.৫ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

রিও ডি জেনিরোতে রিও ২০ সম্মেলন (টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন), জুন ২০১২, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDGs) একটি নতুন সেট তৈরি করার জন্য একটি প্রক্রিয়া তৈরি করে যা MDGs দ্বারা সৃষ্ট গতিকে বহন করবে এবং এর সাথে মানানসই হবে। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বনেতাদের উপস্থিতিতে নতুন করে Global Sustainable Development Goals (SDGs) গৃহীত হয়, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময় নির্ধারন করা হয়। এই সংশোধিত নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈশ্বিকভাবে ১৭ টি প্রধান লক্ষ্য এবং তার সংশ্লিষ্ট অন্তর্বর্তী আরো ১৬৯ টি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে। এটিই জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত এবং বৈশ্বিকভাবে সার্বজনীন পরামর্শের ভিত্তিতে নেওয়া সর্বাপেক্ষা বড় কোন সিদ্ধান্ত। ছঙ্গও অনুযায়ী গৃহীত লক্ষ্যগুলো সার্বজনীন; ধনী-গরীব সকল দেশের জন্যই এসব প্রযোজ্য এবং প্রয়োগ করা সম্ভব। জাতিসংঘের অনুমান অনুযায়ী, উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অর্থায়নের বছরে ব্যয় হবে প্রায় ৪৫০০ বিলিয়ন ডলার। যা বৈশ্বিকভাবে ব্যবহৃত বার্ষিক সাহায্য অনুদানের চেয়েও ত্রিশ গুণ বেশি। এই নীতিমালার অন্যতম প্রধান অর্থই হল ২০৩০ সালের মধ্যে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য, রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি কোম্পানি, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, সুশীল সমাজ সংস্থাগুলি সহ সকলকেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

UN প্রদত্ত টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্য:

নির্ধারিত ১৭ টি প্রধান লক্ষ্যমাত্রা নিচে উল্লেখ করা হল।

১. No Poverty (দারিদ্র্য বিলোপ)- সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের দূরীকরণ

২. Zero Hunger (ক্ষুধা মুক্তি)- ক্ষুধা থেকে মুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত

পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

৩. Good Health and Well-being (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ)- সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

৪. Quality Education (মানসম্মত শিক্ষা)- সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

৫. Gender Equality (লিঙ্গ সমতা)- লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

৬. Clean Water and Sanitation (নিরাপদ জল ও নিকাশি ব্যবস্থা)- সকলের জন্য জল ও পয়ঃ নিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

৭. Affordable and Clean Energy (সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি)- সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি সহজলভ্য করা

৮. Decent Work and Economic Growth (শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি)- সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি করা

৯. Industry, Innovation, and Infrastructure (শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো)- অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ

১০. Reduced Inequalities (অসমতার হ্রাস)- অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতার হ্রাস ঘটানো

১১. Sustainable Cities and Communities (টেকসই নগর ও জনপদ)- অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা

১২. Responsible Consumption and Production (পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন)- পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা

১৩. Climate Action (জলবায়ু কার্যক্রম)- জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ

১৪. Life Below Water (জলজ জীবন)- টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার

১৫. Life On Land (স্থলজ জীবন)- স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ

১৬. Peace, Justice, And Strong Institutions (শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান)- টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ

১৭. Partnerships For The Goals (অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব)- টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা

২.৪.৬ সারাংশ

এই এককে আমরা যে বিষয়ে সম্পর্কে জানলাম :

- স্বাধীনতা হিসাবে উন্নয়ন
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

২.৪.৭ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন

টীকা লিখুন :

ক) অমর্ত্য সেন

খ) স্বাধীনতা হিসাবে উন্নয়ন

গ) টেকসই উন্নয়ন

বড় প্রশ্ন :

ক) UN প্রদত্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

খ) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২.৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. লার্নার, ডি. (১৯৫৮). দ্য পাসিং অফ ট্রাডিশনাল সোসাইটি: মডার্নইজিঙ দ্য মিডল ইস্ট.

২. শাহ, এইচ. (২০১১). দ্য প্রোডাকশন অফ মডার্নিজশন:ড্যানিয়েল লার্নার, মাস মিডিয়া, এন্ড দ্য পাসিং অফ ট্রাডিশনাল সোসাইটি। টেম্পল ইউনিভার্সিটি প্রেস.

৩. হ্যানসন, জে., এন্ড নারুলা, ইউ. (২০১৩). নিউ কমিউনিকেশন টেকনোলজিস ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিস. রুটলেজ.

৪. মেলকোট, এস. আর., এন্ড স্টিভস, এইচ. এল. (২০০১). কমিউনিকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন থার্ড ওয়ার্ল: থিওরি এন্ড প্রাকটিস ফর এমপাওয়ারমেন্ট. সেজ.

মডিউল ৩

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা

একক ১ ❑ উন্নয়ণমূলক সাংবাদিকতা : ধারণা ও উৎস

গঠন

৩.১.১ উদ্দেশ্য

৩.১.২ প্রস্তাবনা

৩.১.৩ উন্নয়ন-ধারণা ও উৎপত্তি

৩.১.৪ উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা : উৎপত্তি

৩.১.৫ সারাংশ

৩.১.৬ অনুশীলনী

৩.১.৭ তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

৩.১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে সাংবাদিকতায় উন্নয়ন-এর ধারণা, উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যাবে। সাংবাদিকতায় উন্নয়ন-এর ভূমিকা, গুরুত্ব তথা অবদান সম্পর্কেও একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা বলতে কী বোঝায় এবং কীভাবেই বা এই সাংবাদিকতার উন্মেষ ঘটেছিল সে বিষয়েও বিশদে আলোচনা করা হয়েছে এই একক-এ।

৩.১.২ প্রস্তাবনা

আমাদের দেশের বৃদ্ধি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে স্বাধীন ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়। ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুর বছর থেকে দেশের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। জনসাধারণ উৎসাহের সঙ্গে কিছু পরিবর্তনকে স্বাগত জানান আবার একইসঙ্গে বেশ কিছু পরিবর্তন জনসাধারণের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এই প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু নতুন বিষয় উঠে আসে এবং যা কেন্দ্রে চলে যায়। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার কাজই এই বিষয়গুলির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা। আমরা এই এই এককে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা সম্পর্কে জানবো।

৩.১.৩ উন্নয়ন-ধারণা ও উৎপত্তি

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জ্ঞাপন বিষয়ক গবেষণার এক সম্পন্ন ঐতিহ্য রয়েছে যা একাধারে গুরুত্বপূর্ণ অন্যধারে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তারও বটে, যা এককথায় উন্নয়নমূলক

জ্ঞাপন হিসেবে পরিচিত। উন্নয়নমূলক জ্ঞাপন সম্পর্কিত গবেষণা বিশ শতকের ষাটের দশক জুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। ড্যানিয়েল লার্নার, উইলবার শ্যাম, এভারেট রেজার্স, ফ্রেডারিক ফ্রে, লুসিয়েন পাই, লক্ষ্মণ রাও প্রমুখ উন্নয়নমূলক জ্ঞাপন তত্ত্ববিদ ও গবেষক এই কাজে এগিয়ে আসেন। উন্নয়নমূলক গবেষণার কাজ ত্বরান্বিত হওয়ার সামন্তরালেই উঠে আসে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে তাত্ত্বিক বিতর্ক। কোনও কোনও সমালোচক এজাতীয় গবেষণার সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গটিও উত্থাপন করেন। বস্তুত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে চলে আসা তৃতীয় বিশ্বের জন্য গৃহীত উন্নয়নমূলক প্রয়াসগুলির নিরিখে জ্ঞাপন বিষয়ক গবেষণা এবং তা থেকে উদ্ভূত সমস্যা ও পক্ষপাত উন্নয়নমূলক জ্ঞাপন এর প্রাঙ্গণে সৃষ্টি করে বিতর্ক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর প্রায় সাড়ে সাত দশক অতিক্রান্ত। এই সময়পর্বে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক শাসনের থেকে মুক্তি ঘটে। জন্ম হয় রাষ্ট্রসংঘের। রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন শাখা সংগঠনগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উন্নয়নের জন্য ত্রাণ, চিকিৎসক, চিকিৎসার সরঞ্জাম সহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটার অব্যবহিত পরবর্তী বছরগুলিতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত, ইউরোপে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ চালাতে শুরু করে রাষ্ট্রসংঘ এবং এর সবথেকে প্রভাবশালী সদস্য দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে এই ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজের অভিমুখ পরিবর্তিত হয় ইউরেখা থেকে তৃতীয় বিশ্বে যেখানে বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ জনসমষ্টির বাস। ১৯৫৫ সালে এই জনসাধারণ যাঁরা মূলত কৃষিজীবী ওঁদের উপার্জনের পরিমাণ ছিল সমগ্র বিশ্বের মোট আয়ের মাত্র ১৫ শতাংশ (ভ্যান সোয়েট, ১৯৭৮।)

এই বিপুল সংখ্যক কৃষিজীবী মানুষের আর্থিক অবস্থা উপলব্ধি করে মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি এস. ট্রুম্যান ১৯৪৯ সালে চার দফা কর্মসূচি বা পরেন্ট ফোর প্রোগ্রাম-এর প্রস্তাব দেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে এমন একটি মডেলকে প্রতিষ্ঠা করা হয় যা অধিকাংশ উন্নত রাষ্ট্র মানতে সম্মত হয়। ট্রুম্যান-এর পর্যবেক্ষণ ছিল—বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন গুজরান করছেন। তাঁদের পর্যাপ্ত খাদ্য নেই। তাঁরা রোগাক্রান্ত। তাঁদের অর্থনৈতিক জীবন আদিমস্তরে রয়েছে এবং তা থেকে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এই সব মানুষের দারিদ্র্য তাঁদের নিজেদের তো বটেই এমনকি সম্ভাবনাময় অঞ্চলের মানুষের কাছেও বিপদের অশনি সঙ্কেত বহন করছে। ইতিহাসে এই প্রথম মানবতা জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে যার মাধ্যমে এই মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা লাঘব করা যাবে। (ড্যানিয়েলস্, ১৯৫১)।

কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পশ্চিমের দেশগুলির স্বচ্ছলতার প্রেক্ষিতটিও তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির দুরবস্থা উপশম ও মোচনের প্রশ্নে উঠে আসে। ১৯৪৯ সালে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ট্রুম্যান বলেন, উন্নয়ন ও শান্তির চাবিকাঠি হল আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞানের আরও প্রসারিত প্রয়োগ ঘটানো যার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব। (ড্যানিয়েলস্, ১৯৫১) এই প্রস্তাবনার ফলশ্রুতিই 'উন্নয়ন' নামে পরিচিত।

কোনও কোনও তাত্ত্বিকের মতে উন্নয়ন মূলত এক অর্থনৈতিক ধারণা। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও জনসাধারণের জীবন মাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে লব্ধ সম্পদের সম্পূর্ণ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের সঙ্গেই উন্নয়ন সম্পর্কিত। কোনও দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধনই উন্নয়ন। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে কোনও অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের উন্নতি সাধনই এর উদ্দেশ্য। পাশাপাশি, সম্পদের সৃষ্টি ও মানবজীবনের উন্নতিসাধনও এর লক্ষ্য।

উন্নয়ন-এর অর্থ বিশদে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডুডলে সিয়ার্স মূল্যবোধের বিচারের প্রসঙ্গ তুলেছেন যে মানদণ্ডে বলা যাবে কোনটি উন্নয়ন এবং কোনটি উন্নয়ন নয়। সিয়ার্স-এর মতে উন্নয়ন-এর এক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত লক্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয় যা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে যা মানুষের ব্যক্তিত্বের যে গুরুত্ব তা উন্মোচিত করবে। এই লক্ষ্য পূরণে সক্ষম এমন কতগুলি শর্ত সিয়ার্স চিহ্নিত করেন। সেগুলি নিচে উল্লেখ করা হল—

১. ভৌত চাহিদা পূরণের সক্ষমতা, বিশেষত খাদ্য।

২. একটি পেশা বা জীবিকা (বেতনভিত্তিক জীবিকা হতে হবে এমন কথা নেই)। পড়াশোনা, পারিবারিক জীবিকায় কাজ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৩. সমতা।

৪. সরকারে অংশগ্রহণ।

৫. এমন এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি যা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রকৃতই স্বাধীন এবং

৬. পর্যাপ্ত শিক্ষার স্তর (বিশেষত সাক্ষরতা)।

মানব উন্নয়নের নিরিখে মানুষই প্রধান বিচার্য। মানুষের বৈচিত্র্য ও যে পরিসরে তাঁরা কাজ করছেন তার স্বশাসনের বিচারে মানব উন্নয়নের অভিমুখ ক্রমশ বস্তুমুখিনতা থেকে ব্যক্তিমুখিনতায় পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের অভিমত, উন্নয়ন-এর যে ধারা লক্ষ্য করা গেছে তার সিংহভাগই উঁচু থেকে নিচুতে পর্যবসিত যেখানে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ কম।

মানব অভিমুখী উন্নয়ন এক প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের আহ্বান জানায় যেখানে রাষ্ট্র সমাজের তৃণমূলস্তর থেকে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে আসবে। বস্তুত সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নই উন্নয়নকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায়। মানুষের ন্যূনতম ও মৌলিক সক্ষমতা ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে এজাতীয় উন্নয়ন মানুষকেই মানব উন্নয়নের বাহক হিসেবে চিহ্নিত করে।

পুঁজিবাদী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অগ্রবর্তী দেশগুলির জাতীয় অর্থনীতি যা বিদেশি বাজারকে নিজ অর্থনীতির অঙ্গিভূত করেছে এমনকী রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে জনসাধারণের

এক বিপুল অংশই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রক্রিয়া থেকে বিমুক্তই থেকেছেন বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। তাঁরা মনে করছেন, দেশে দেশে গড়ে ওঠা কতৃত্ববাদী ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামো সামাজিক অংশগ্রহণ ও জনপ্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে অনেক সময়ই দেশে দেশে সরকারগুলির অসফল ও দুর্বল পুনর্বন্টনের নীতির জন্যই সামাজিক সুযোগ সুবিধা অধিকাংশ জনসাধারণের কাছে পৌঁছয় না। পাশাপাশি মানুষের অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। বস্তুত ক্ষমতাশালী অর্থনৈতিক গোষ্ঠীই জাতীয় উন্নয়নের এজেণ্ডা স্থির করে দিচ্ছে যেখানে বৃহত্তর সমাজের কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই, নাগরিক সমাজের বৈচিত্র্যের কোনও প্রতিফলন নেই। ক্ষমতা ও সম্পদ কার্যত মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতেই কুক্ষিগত হয়ে থাকছে।

সাধারণ মানুষ নির্ভর উন্নয়ন প্রসঙ্গে তাত্ত্বিকরা মনে করছেন উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতা অর্জনের বহুবিধ পথ রয়েছে। দাবি উঠেছে, 'মানব কেন্দ্রিক উন্নয়ন', 'মানুষের উন্নয়ন', 'সুসংহত উন্নয়ন'-এর। এই যাবতীয় দাবিরই মূল উপজীব্য উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনের যা অনেক বেশি সুসংহত ও সংবেদনশীল হবে যা মানুষের জীবনের যাবতীয় প্রেক্ষিত-এর উন্নতি সাধনে সমর্থ হবে। উন্নয়নের প্রশ্নে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং ভারসাম্যমূলক অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করবে।

উন্নয়নের অগ্রাধিকারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, হচ্ছে (ন্যূনতম চাহিদাগুলি। সমগ্র বিশ্ব জুড়েই তা প্রযোজ্য হচ্ছে।) এরই সমান্তরালে দেশে দেশে সুনির্দিষ্ট চাহিদাগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

মানব অভিমুখী উন্নয়নের মাধ্যমে বৈচিত্র্যকেই পুষ্ট করার প্রয়াস চলেছে। এর লক্ষ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ, গণতান্ত্রিক, দেশীয় ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা এবং স্বশাসন ও যথাযথ পরিসরের দাবি প্রতিফলিত হয় এজাতীয় সামাজিক আন্দোলনগুলিকে উৎসাহিত করা।

স্থানীয় পরিসরকে রক্ষা করে, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহি করে, সামাজিক বৈচিত্র্যপূর্ণ সমষ্টিগত পরিচিতিকে স্বীকৃতি দিয়ে ও তার প্রতিফলন ঘটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল আরও সুষমভাবে বন্টন করা যেতে পারে। পরিবেশের ওপর জনসাধারণের বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণ আশু প্রয়োজন। এজাতীয় উন্নয়নের ধারায় রাষ্ট্রের পরিবর্তে নাগরিক সমাজকে গড়ে তোলার কথা বলা হচ্ছে যেখানে এই সমাজ উন্নয়নকে লালন করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন অংশীদারদের বর্ধিত ভূমিকা ও সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের জন্য তাই প্রয়োজন এক সুসংহত প্রক্রিয়া সেখানে মানুষের উন্নতিকল্পে গৃহীত নানাবিধ পরিকল্পনা, নীতি ও কর্মসূচিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপাদানগুলি নিহিত থাকবে। সমাজের নানা অংশ তথা আঞ্চলিক উন্নয়নের সমান্তরালে প্রয়োজন অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন। উন্নয়নের প্রশ্নেই পরিবেশ, দূষণ, নারী, বাসস্থান, ক্ষুধা, কর্মসংস্থান-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি একের পর

এক আসে এবং এগুলি সম্পদ বরাদ্দের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের মনোযোগও দাবি করে। এরই সমান্তরালে দুটি প্রধান সাম্প্রতিক বিষয়ও যে কোনও উন্নয়নমূলক উদ্যোগে মনোযোগ দাবি করে। এদুটি হল মানুষের নিরাপত্তা এবং দীর্ঘমেয়াদ।

এটি সুনিশ্চিত করতে হবে যে উন্নয়ন-এর অর্থ সামাজিক স্থান থেকে বিচ্যুতি, হিংসা, এবং যুদ্ধ নয়। আগামী প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা পূরণ করার সামর্থ্যের সঙ্গে আপস না করেই বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণে সক্ষম হতে হবে। উন্নয়ন-এর কাছে সমাজ এই দায়িত্বই প্রত্যাশা করে।

উন্নয়ন-এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি জটিলভাবে পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং এর মোকাবিলায় একটি সুষ্ঠু সমন্বিত প্রক্রিয়া প্রয়োজন। উন্নয়ন-এর প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের উন্নয়ন। (কাজেই বস্তুর উন্নয়নেই তার পরিসমাপ্তি ঘটলে চলবে না।) উন্নয়ন-এর প্রকৃত লক্ষ হওয়া উচিত মানবজাতির মৌলিক চাহিদাগুলির পূরণ। এই লক্ষ্যপূরণে সক্ষম নয় কিংবা মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলিকে ব্যাহত বা বিপর্যস্ত করে তোলে এ জাতীয় সাফল্যকে আদৌ উন্নয়ন-এর লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত বা বিবেচনা করা যায় না।

৩.১.৪ উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা : উৎপত্তি

আমাদের দেশের বৃদ্ধি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে স্বাধীন ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়। ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুর বছর থেকে দেশের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। জনসাধারণ উৎসাহের সঙ্গে কিছু পরিবর্তনকে স্বাগত জানান আবার একইসঙ্গে অন্য বেশ কিছু পরিবর্তন জনসাধারণের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এই রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু নতুন বিষয় উঠে আসে এবং যা বিতর্কের কেন্দ্রে চলে যায়। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকদের কাজই এই বিষয়গুলির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করা। এই উন্নয়নমূলক বিষয়গুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকের কাজ বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও সংস্থার লাগু করা নানাবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচি সম্পর্কে পাঠক, শ্রোতা ও দর্শককে অবহিত করা। পাশাপাশি, কীভাবে এই উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচি জনসাধারণের উপকার করতে পারে তা জনসাধারণকে জানিয়ে এমন এক অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা যাতে যাবতীয় উন্নয়নমূলক নীতি, কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু সম্পাদন ও রূপায়ণ ঘটে এবং আপামর জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণে তা সফল ও সার্থক হয়।

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার লক্ষ্য :

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার প্রধান লক্ষ্যগুলি হল :

১. তথ্য সরবরাহ।

২. উন্নয়ন-এ সহায়তা প্রদান।

৩. উন্নয়ন-এর বর্ণনা

এই কাজগুলি যদি নিষ্ঠা ও দায়িত্বের সঙ্গে পালন করা হয় তাহলে একজন উন্নয়নমূলক সাংবাদিকের চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং তাঁর কাঁধে আরও বেশি দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। প্রতিটি উন্নয়নমূলক প্রতিবেদনে তথ্য যেন সঠিক ও নিখুঁত হয়। যদিও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তার ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিকের সতর্ক থাকা উচিত। যে কোনও উন্নয়নমূলক সাংবাদিকের জাতীয় প্রেক্ষিতেই বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করা আশু কর্তব্য। একজন উন্নয়নমূলক সাংবাদিকের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জাগড়িত রাখা প্রয়োজন। প্রতিবেদন লেখা বা তৈরি করার সময় তাঁকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোনও ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসা, স্তুতি বা সমালোচনা প্রাধান্য না পায়। উন্নয়নধর্মী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রটি অত্যন্ত জটিল সেখানে একজন প্রতিবেদককে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার কৌশল :

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার ফলশ্রুতিতেই আজ জনসাধারণ অরণ্য ধ্বংসের, ক্ষতিকর প্রভাব যেমন, দূষণ, জল সংক্রান্ত সমস্যা, মাটির ক্ষয় ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতাই আমাদের উন্নয়নের উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কে পুনরায় ভাবতে বাধ্য করেছে। অনেক সাংবাদিকই উন্নয়ন বিষয়টি ও উন্নয়ন অর্জনের জন্য অনুসৃত পথগুলি নিয়ে তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ প্রতিবেদন পেশ করেছেন। একজন উন্নয়নমূলক সাংবাদিকের প্রতিবেদন নিচের তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে গঠিত ও বিন্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১. কোনও সুনির্দিষ্ট বিষয় যেখানে ইতিমধ্যেই উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে সেখান থেকেই একজন উন্নয়নমূলক সাংবাদিকের তথ্যও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা উচিত। এর জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত বা সেই কাজকে সমন্বয় করার বিষয়ে জড়িত মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ। নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানাও একান্ত প্রয়োজন।

২. উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন লেখার সময় তথ্যগত দিক থেকে নিখুঁত হওয়া দরকার।

৩. একজন উন্নয়নমূলক সাংবাদিকের লেখার নিজস্ব আঙ্গিক বা কৌশলের থেকেও বেশি প্রয়োজন কোনও নির্দিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজ বা পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনা বা দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করা।

৪. উন্নয়নমূলক সাংবাদিকের লিখিত প্রতিবেদনের ভাষা যেন যতদূর সম্ভব সরল ও সহজবোধ্য হয়। আয়,ব্যায়, সাক্ষরতার হার ইত্যাদি উন্নয়ন বিষয়ক পরিসংখ্যান পেশ করার সময় ভগ্নাংশের পরিবর্তে পূর্ণ সংখ্যা দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৫. সংখ্যা বা পরিসংখ্যানের তুল্যমূল্য চিত্র তুলে ধরা সবসময়ই সহায়ক হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনও উন্নয়নমূলক প্রতিবেদনে যদি বর্তমান জ্ঞাপন ব্যবস্থায় নুতন প্রযুক্তির প্রভাব উপস্থাপিত করা হয় সেক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি আরও কার্যকর হতে পারে যদি নতুন প্রযুক্তি আসার পর বর্তমান পরিস্থিতি এবং প্রযুক্তি আসার আগের পরিস্থিতির একটি তুলনামূলক চিত্র পেশ করা যায়। বিষয় ধরে ধরে তথ্য ও পরিসংখ্যানের তুলনা দিলে একটি স্পষ্ট ছবি পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের সামনে উঠে আসে।

৩.১.৫ সারাংশ

উন্নয়ন প্রধানত এক অর্থনৈতিক ধারণা। কোনও দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্ররিস্থিতির উন্নতিসাধনই উন্নয়ন। উন্নয়ন-এর লক্ষ্য কোনও অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের উন্নতিসাধন। পাশাপাশি, সম্পদ সৃষ্টি ও মানবজীবনের উন্নতিসাধনই এর লক্ষ্য। মানব অভিমুখী উন্নয়নের মাধ্যমে বৈচিত্র্যকেই পুষ্ট করা হয়। এই জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ, গণতান্ত্রিক, দেশীয় ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা এবং সামাজিক আন্দোলনগুলিকে উৎসাহিত করা যাতে স্বশাসন ও যথাযথ পরিসরের দাবি প্রতিফলিত হয়।

সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন এক সুসংহত প্রক্রিয়া সেখানে মানুষের উন্নতির জন্য গৃহীত বিবিধ পরিকল্পনা, নীতি ও কর্মসূচিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপাদানগুলি নিহিত থাকবে। প্রয়োজন অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন। উন্নয়ন-এর প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের উন্নয়ন ও মানবজাতির মৌলিক চাহিদাগুলির পূরণ।

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকের কাজ বিভিন্ন সরকারি বিভাগের অধীন নানাবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচি সম্পর্কে পাঠক, শ্রোতা ও দর্শককে অবহিত করা। কীভাবে এই উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচি থেকে মানুষ উপকৃত হতে পারেন তা জনসাধারণকে জানানো। বস্তুত এমন এক পরিবেশ তৈরি করা যাতে যাবতীয় উন্নয়নমূলক নীতি, কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণ ঘটে এবং আপামর জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণে তা সফল হয়।

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার প্রধান লক্ষ্যগুলি হল ১. তথ্য সরবরাহ, ২. উন্নয়ন-এ সহায়তা প্রদান এবং ৩. উন্নয়ন-এর বর্ণনা। উন্নয়নমূলক সাংবাদিককে সতর্ক থাকতে হবে যেন প্রতিটি উন্নয়নমূলক প্রতিবেদনে তথ্য ও পরিসংখ্যান সঠিক ও নিখুঁত হয়।

৩.১.৬ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১. উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার লক্ষ্য কী?

২. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কোন সালে শুরু হয়েছিল?

টীকা লিখুন :

১. মানব উন্নয়ন

২. ডুডলে সিয়ার্স

৩. উন্নয়ন

বড় প্রশ্ন :

১. উন্নয়ন বলতে কী বোঝো? বিশদে বর্ণনা করো।

২. উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা বলতে কী বোঝো? এর লক্ষ্য ও কৌশল সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

৩.১.৭ তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

১. Melkote, S. R., Steeves, H. L. (2001). Communication for development in the third world: Theory and practice for empowerment. SAGE Publications India Pvt Ltd, https://doi.org/10.4135/9788132113751

২. Melkote, S.R. (2018). Communication for development and social change: an introduction, Journal of Multicultural Discourses, 13:2, 77 86, DOI: 10.1080/17447143.2018.1491585

৩. Murthy, D.V.R (2006). Development journalism what next : agenda for the press. Kanishka Publishers.

৪. Scott, M. (2014). Media and Development. Zed Books Ltd.

৫. Vilanilam, J.V. (2009) . Development Communication in Practice : India and the Millenium Development Goals. SAGE Publications India Pvt. Ltd.

একক ২ ❑ সাংবাদিকতা-ধারণা ও প্রকারভেদ

গঠন

৩.২.১ উদ্দেশ্য

৩.২.২ প্রস্তাবনা

৩.২.৩ সাংবাদিকতা—ধারণা ও প্রকারভেদ

৩.২.৪ সাংবাদিক-এর কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা

৩.২.৫ সারাংশ

৩.২.৬ অনুশীলনী

৩.২.৭ তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

৩.২.১ উদ্দেশ্য

এই এককে সাংবাদিকতা-র ধারণা ও সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সাংবাদিকতা বলতে কী বোঝায়, এর সম্ভাবনাই বা কতখানি সে সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে এই একক জুড়ে, কত প্রকার সাংবাদিকতা রয়েছে, সাংবাদিকতার প্রধান ভাগগুলিই বা কী কী সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। একজন সাংবাদিক-এর কী কী কর্তব্য পালন করা উচিত তার উল্লেখ করা হয়েছে। সাংবাদিক-এর দায়বদ্ধতাই বা কতখানি তারও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এই এককে।

৩.২.২ প্রস্তাবনা

সাংবাদিকতা বলতে কী বোঝায়, এর সম্ভাবনাই বা কতখানি সে সম্পর্কে আমরা এই এককে জানতে চলেছি। কত প্রকার সাংবাদিকতা রয়েছে সে সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে এই এককে।

৩.২.৩ সাংবাদিকতা-ধারণা ও প্রকারভেদ

সংবাদপত্র-পত্রিকায় লেখালিখির পেশাই এককথায় সাংবাদিকতা। সাংবাদিকের কাজ মূলত দ্বিবিধ। এক, সংবাদ সংগ্রহ এবং দুই, তথ্যের বন্টন বা সরবরাহ।

সংবাদপত্র ও পত্রিকায় মানুষের নানাবিধ কাজের নানা দিক নিয়ে সংবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশনাই সাংবাদিকতা। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকতার কাজ জাতীয় নীতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা এবং বিপরীতে স্থানীয়, রাজ্য বা প্রদেশ কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারকে সাধারণ মানুষের চাহিদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখা। সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে জন প্রতিক্রিয়া সরকারের গোচরে আনাও সাংবাদিকের কাজ। এরই সমান্তরালে প্রতিমুহূর্তে ঘটে চলা দেশ ও বিদেশে নানা ঘটনা সম্পর্কে সরকার ও জন

সাধারণকে অবহিত রাখাও সাংবাদিকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

গণমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তারের মাধ্যমে সংবাদ, বিশদ বর্ণনা ও মতামত পাঠানোও সাংবাদিকতা। সংবাদপত্র; পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, সমাজিক মাধ্যম এমনকী সেল ফোন-এর মাধ্যমেও সাংবাদিকরা সংবাদের বিনিময় করেন। যে কোনও সংবাদমাধ্যমে সংবাদের সংগ্রহ, লিখন, সম্পাদনা এবং প্রকাশকেই সাংবাদিকতা বলে। সাংবাদপত্র, পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে সংবাদ প্রতিবেদন এবং সম্পাদকীয়র নির্মাণই সাংবাদিকতা।

মুদ্রণ মাধ্যমের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকতার অর্থ সংবাদপত্র কিংবা পত্রিকার জন্য লেখা। সংবাদপত্র কিংবা পত্র-পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে তথ্যের জ্ঞাপনই সাংবাদিকতা। নতুন কিছুকে জানার এক সহজাত জন্মগত আকাঙ্ক্ষা মানুষের আছে। সংবাদ ও সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে লেখার মাধ্যমে মানুষের এই কৌতুহলের নিরসন ঘটান সাংবাদিকরা।

সংবাদ প্রতিবেদন রচনা, সংবাদ লিখন, সম্পাদনা, সংবাদচিত্র গ্রহণ কিংবা সংবাদ সম্প্রচার বা বাণিজ্য হিসেবে কোনও সংবাদ সংগঠন পরিচালনাও সাংবাদিকতা। 'জার্নাল' শব্দটি থেকে সাংবাদিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'জার্নালিজম'-এর উৎপত্তি। 'জার্নাল'-এর অর্থ প্রাত্যহিক নিবন্ধীকরণ বা এমন এক ডায়েরিবই যেখানে প্রতিদিনের ঘটনা পরম্পরার দিনলিপি লিখিত থাকে। এর অন্তর্ভুক্ত দৈনিক বা সপ্তাহিক পত্রিকা থেকে শুরু করে পত্রিকা তা সে সমাজের যে কোনও অংশের পাঠকের উদ্দেশ্যে লেখা হোক না কেন।

সংবাদপত্র, পত্রিকা বা জার্নাল-এর জন্য যখন কোনও ব্যক্তি লেখেন সেই লেখাই সাংবাদিকতা হিসেবে পরিচিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচিতি হয়, সাংবাদিক হিসেবে। তথ্যের জ্ঞাপন করেন সাংবাদিকরা শব্দ, ধ্বনি বা ছবির সাহায্যে। মানুষের প্রকৃতিই হল পারিপার্শ্বিক বিশ্বে ঘটমান ঘটনাবলী সম্পর্কে কৌতুহলী হওয়া। প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় তথ্য জোগান দিয়ে মানুষের এই গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাকে পূরণ করে সাংবাদিকতা। একজন ঐতিহাসিক যেখানে অতীতের ঘটনাবলীর খতিয়ান বহন করেন সেখানে একজন সাংবাদিক সাম্প্রতিক সংবাদ ও ঘটনাবলীর প্রতিবেদন পেশ করেন।

বর্তমান থেকেই অনুপ্রাণিত হয় সাংবাদিকতা। পরিস্থিতি কীভাবে মোড় নেয় তা-ই তুলে ধরে সাংবাদিকতা। সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণের দৈনিক ব্যবস্থাপনাই সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতার প্রভাব প্রত্যেক মানুষের ওপর রয়েছে। আপনি, আমি তথা বৃহত্তর সমাজকে নিয়েই সাংবাদিকতার কাজ। কোনও সাাংবাদিক যদি কোনও খবর করতে একদিন দেরি করে ফেলেন এমনকী কয়েক ঘণ্টাও দেরি করে ফেলেন সেই খবরের আর গুরুত্ব থাকে না। সাংবাদিকতা অবসর সময়ে বসে কোনও বই লেখা নয়। কার্যকর সাংবাদিকতাকে সর্বদা সময়ের সঙ্গে গতিশীল ও তৎপর থাকতে হয়।

নিছক সংবাদ ও ঘটনা পরম্পরার প্রতিবেদন পেশ করার মধ্যেই একজন সাংবাদিকের ভূমিকা সীমিত থাকে না। সংবাদ ও ঘটনা পরম্পরার বিশ্লেষণ ও তা সম্পর্কে মন্তব্য পেশ করাও তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই একজন সাংবাদিকের প্রধান কাজ সংবাদ ও দৃষ্টিকোণ তুলে ধরা। উপস্থাপিত দৃষ্টিকোণ

সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের নিজেরই হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের প্রতিক্রিয়া ও মনোভাবের প্রতিফলনও সাংবাদিকের উপস্থাপিত দৃষ্টিকোণে থাকতে পারে।

চেম্বারস্ টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ডিকশনারিতে সাংবাদিকতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে গণ পত্রিকা পরিচালনা বা লেখার পেশাই সাংবাদিকতা। গবেষকদের একটি বড় অংশের অভিমত, সাংবাদিকতার অর্থ উপস্থাপনা, প্রকাশনা বা সম্প্রচারের জন্য সাধারণ মানুষের আগ্রহ সম্বলিত বিষয়ের সমাহার ও সম্পাদনা। অন্যভাবে বলতে গেলে, যে কোনও মাধ্যমের সাহায্যে জনসাধারণকে তথ্যের জ্ঞাপনই সাংবাদিকতা। সংবাদপত্র, রেডিও থেকে টেলিভিশন হয়ে ইন্টারনেট, মাধ্যমের প্রকারভেদ নানাবিধ হতেই পারে। সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিই সাংবাদিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

সাংবাদিকতা-র সংজ্ঞা : বণ্ড এফ. ফ্রেজার-এর মতে সাংবাদিকতা শব্দটি বলতে বোঝায় জনসাধারণের কাছে পৌঁছনো সংবাদ এবং সংবাদ বিষয়ক প্রতিক্রিয়া যা নানা প্রকারে ব্যক্ত হতে পারে। এই বিশ্বে যা ঘটছে তা যদি সাধারণ মানুষের মনে আগ্রহ জাগায় এবং এই ঘটমান বিষয়গুলি যে চিন্তা-ভাবনা, কাজ এবং ধারণাকে উৎসাহিত করে সেই যাবতীয় বিষয়ই একজন সাংবাদিকের কাছে মূল বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়।

লেসলি স্টিফেন্স মনে করেন, আপনার যে বিষয়ে ধারণা নেই, সেই বিষয়ে নিয়ে লেখার বিনিময়ে অর্থ উপার্জনই সাংবাদিকতা।

টাইম পত্রিকার সাংবাদিক এরিক হজিন্স বলছেন, একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিখুঁত, দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ তথ্য সরবরাহই সাংবাদিকতা। এমনভাবে সাংবাদিকতা করা হয় যাতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ না হলেও ধীরে ধীরে বিষয় বা ঘটনার বস্তুনিষ্ঠতা সত্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে।

ওয়েবস্টার থার্ড ইন্টারন্যাশনাল ডিকশনারি অনুযায়ী, উপস্থাপনা, প্রকাশনা কিংবা সম্প্রচারের জন্য সাম্প্রতিক আগ্রহ সম্বলিত বিষয় সম্পর্কিত সংবাদ ও তথ্যের সংগ্রহ ও সম্পাদনাই সাংবাদিকতা।

একজন সাংবাদিককে প্রেস বিষয়ক ব্যক্তি বা 'প্রেস ম্যান' বলা হয়।

প্রাচীনতম সাংবাদিকতা পত্রিকা বিষয়ক সংবাদিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। নিয়মিত সময় অন্তর পত্রিকা প্রকাশিত হত। স্বীকৃত সংবাদপত্রের অবয়বে এবং সাধারণ মানুষের আগ্রহের বিষয়বস্তু নিয়ে সপ্তাহে অন্তত একবার করে প্রকাশিত হয়ে পত্রিকা ধীরে ধীরে সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়।

আধুনিক যুগে প্রেস-কে বলা হয় চতুর্থ এস্টেট বা ফোর্থ এস্টেট। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদমাধ্যমকে গণ্য করা হয়। সমাজে সংবাদমাধ্যমের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে এবং গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যম এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সাংবাদিকতার সম্ভাবনা : বৃহত্তর প্রেক্ষিতে রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রতিবেদন উপস্থাপিত করা ও ধারাভাষ্য প্রদানও সাংবাদিকতার অন্তর্ভুক্ত। এমনকী সংবাদ ঘটনাপ্রবাহ এবং তথ্যচিত্রও সাংবাদিকতার সম্ভাবনার পরিসরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। রেডিও, টেলিভিশন কিংবা চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রতিবেদক, সম্পাদকরা দাবি করেন যখন তাঁরা সংবাদ ও সংবাদ বিষয়ক দৃষ্টিকোণ বা প্রতিক্রিয়া নিয়ে কাজ করেন

তখন মুদ্রণ মাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক, সংবাদকর্মীদের মতো তাঁরাও 'প্রেস' এই শব্দের আওতায় চলে আসেন। কোন সংবাদমাধ্যমে একজন সাংবাদিক কাজ করছেন সেটি বড় কথা নয়। সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক কী প্রকৃতির কাজ করছেন সেটিই সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের গুণমানের নির্ণায়ক মানদণ্ড।

সাংবাদিকতার প্রকারভেদ : সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সাংবাদপত্রে চোখ বোলানো এবং কাগজের পাতা ওল্টানো আমাদের অধিকাংশেরই দৈনন্দিন কাজ। কিন্তু স্মার্টফোন-এর দৌলতে গোটা বিশ্ব মুঠিফোন-এর পর্দায় চলে আসায় আমাদের অধিকাংশ কাজই এমনভাবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে ও যাচ্ছে যা আমরা আগে কেউ ভাবতেই পারিনি। একইভাবে, আধুনিক মোবাইল প্রযুক্তি ও ওয়েবসাইট-এর সুবাদে সাম্প্রতিক সংবাদ ও ঘটনার বিশ্বব্যাপী সরবরাহের মাধ্যমও উন্নত হয়েছে। সাংবাদিকতা বলতে কী বোঝায় এবং সমাজে এটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা থাকলেও আমরা অনেকেই এই মাধ্যমের সঙ্গে জড়িত বিবিধ প্রকারভেদগুলি সম্পর্কে সম্যক অবহিত নই। সাংবাদিকতার কয়েকটি প্রধান প্রকার নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

মুদ্রণ সাংবাদিকতা : সাংবাদিকতার সবথেকে ঐতিহ্যবাহী প্রকারই হল মুদ্রণ মাধ্যম। সংবাদপত্র, পত্রিকা, পাক্ষিক প্রভৃতি মুদ্রণ মাধ্যমে সংবাদ ও সংবাদ বিষয়ক প্রতিবেদন রচনাই মুদ্রণ সাংবাদিকতার অন্তর্ভুক্ত আগেকার সময়ে সমাজের কোনও বিষয় নিয়ে কেউ সোচ্চার হতে চাইলে সংবাদপত্রই ছিল সবথেকে শক্তিশালী গণমাধ্যম। মুদ্রণ সাংবাদিকতার অন্তর্ভূক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলির মধ্যে প্রতিবেদক, কলমচি, কপি এডিটর, বার্তা সম্পাদক উল্লেখযোগ্য। ইন্টারনেট-এর আবিষ্কারের ফলে অনেক সংবাদপত্রই ওয়েবসাইট সহ নিজস্ব ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। চালু হয়েছে নানা প্রকার অ্যাপ যেখানে গ্রাফিক ডিজাইনার, ওয়েব ডিজাইনার, ব্যঙ্গচিত্রী বা কার্টুনিস্ট হিসেবে কাজ করতে আগ্রহীরা আবেদন করতে পারেন।

ব্রডকাস্ট বা সম্প্রচার সাংবাদিকতা : এই সাংবাদিকতায় রেডিও ও টেলিভিশনকে ব্যবহার করা হয় সংবাদ ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সম্প্রচারে। সংবাদ, বুলেটিন, তথ্যচিত্র থেকে শুরু করে অন্যান্য তথ্য ও পরিসংখ্যানমূলক অনুষ্ঠান এই সম্প্রচার সাংবাদিকতার অন্তর্ভুক্ত। এই সাংবাদিকতা অত্যন্ত সময় ও শ্রমসাপেক্ষ কারণ সারা দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা একজন সাংবাদিককে সতর্ক থাকতে হয় বিশেষত ব্রেকিং নিউজ-এর সময়। মুদ্রণ সাংবাদিকতার মতোই এই সাংবাদিকতায় প্রয়োজন হয় সম্পাদক ও সাংবাদিকদের। সংবাদ সরবরাহের মাধ্যমটির বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তিত হওয়ায় আরও কিছু পদ এধরনের সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন, প্রোডিসার, নিউজ অ্যাঙ্কর, ক্যামেরাপার্সন ইত্যাদি।

ডিজিট্যাল সাংবাদিকতা : আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ইন্টারনেট যেমন আমাদের জীবনযাত্রার প্রায় সব ক্ষেত্রকেই পরিচালনা করছে, কীভাবে আমরা জগৎকে দেখব তা-ও নিয়ন্ত্রণ করছে। কাজেই ইন্টারনেট ভিত্তিক সাংবাদিকতার পরিসরে জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন শব্দবন্ধ। যেমন, অনলাইন, সাইবার বা ডিজিট্যাল সাংবাদিকতা। সংবাদমাধ্যমে এক গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়েছে ইন্টারনেট। ডিজিট্যাল সাংবাদিকতা

সংবাদপত্র, রেডিও বা টেলিভিশন-এর মতো নানাবিধ গণমাধ্যমে শুধুমাত্র সংবাদ ও তথ্যের প্রবাহ ও বিতরণ-এর গণতন্ত্রীকরণই করেনি উৎপাদন খরচও কমিয়েছে। পাশাপাশি, সম্পাদনা ও রেকর্ডিং প্রকৌশলে নতুন উন্নতি সাধন করেছে। আজকের দুনিয়ায় এমনকি একজন সাধারণ মানুষও তার সাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যামেরা যুক্ত মোবাইল ফোনে কোনও একটি ঘটনাকে বন্দী করে তা অনলাইনে পোস্ট করতে পারেন। ডিজিট্যাল বা নয়া মিডিয়ায় কেরিয়ার গড়ে তোলার সুযোগও মিলছে। এই মাধ্যম ও প্রযুক্তি সম্পর্কে দক্ষতা ও মুনশিয়ানা থাকলে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার, ডিজিট্যাল বিপণন বিশেষজ্ঞ, কনটেন্ট কিউরেটর, ডিজিট্যাল সাংবাদিক প্রভৃতি পদে কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায়।

ক্রীড়া সাংবাদিকতা : জনসাধারণের খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহকে উসকে দিয়ে ক্রীড়া সাংবাদিকতা সংবাদপত্র, রেডিও টেলিভিশন বা ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম প্রভৃতি বিস্তৃত সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে নানাবিধ ক্রীড়ার প্রতিবেদনকে তুলে ধরে। ১৮০০ সালের গোড়ার দিকে সমাজে বিত্তশালী মানুষদের জন্য প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে বিনোদন বা আমোদ-প্রমোদের বিভাগে শুরু হয়েছিল এই ক্রিড়া বিষয়ক সংবাদ। কিন্তু বর্তমান সময়ে নানাবিধ ক্রীড়ার নতুন নতুন প্রতিযোগিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রীড়া সাংবাদিকতা এক পুরোদস্তুর স্বতন্ত্র সাংবাদিকতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ক্রীড়া সাংবাদিকদের ক্রিকেট, ফুটবল বা হকি যে কোনও দলেরই অভ্যন্তরীণ খোঁজখবর রাখার সুযোগ হয়। পাশাপাশি, গোটা টুর্নামেন্টের প্রতিবেদন তাঁদের মাধ্যমেই পাঠক, শ্রোতা বা দর্শক পেয়ে থাকেন। ফলাফল বা অন্যান্য তথ্য সম্বলিত বিষয়ের প্রতিবেদন পেশ করার সময় ক্রীড়া সাংবাদিককে সতর্ক থাকতে হয় যাতে তথ্য বিষয়ক কোনও ভুলত্রুটি না হয়।

ট্যাবলয়েড সাংবাদিকতা : যে সমস্ত খবরে উত্তেজনা থাকে বা যে সব বিষয়ে গুজব, গল্প মিশে থাকে আবার কখনও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অতিরঞ্জিত করে সংবাদ পরিবেশিত হয় সেই প্রকার সাংবাদিকতা ট্যাবলয়েড সাংবাদিকতা হিসেবে পরিচিত। চলচ্চিত্র, ক্রীড়া সেলিব্রিটিদের জীবনযাত্রা নিয়ে এধরনের সাংবাদিকতা করা হয়। অতীতে গ্রাফিক অপরাধ সংক্রান্ত খবরাখবর, গুজব, কেচ্ছা, জ্যোতিষচর্চা প্রভৃতি কলামে পাঠকের বিনোদনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের সাংবাদিকতা করা হত। কিন্তু এখন সেলিব্রিটি জগৎ এবং পাপারীজিদের মতো ধারণা থেকে বিনোদন দুনিয়ার হাল-হকিকত তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এজাতীয় সাংবাদিকতা পুরোদস্তুর আলাদা রকমের সাংবাদিকতা হিসেবে উঠে এসেছে।

চিত্রসাংবাদিকতা : ছবির মাধ্যমে গল্প বলার ভঙ্গিমাকে ব্যবহার করে চিত্র সাংবাদিকতার মাধ্যমে এমনকী সবথেকে সহজতম থেকে চোখ এড়িয়ে যাওয়া বিষয়গুলিও চিন্তা উদ্রেককারী ঢঙে ব্যক্ত করা হয়। চিত্র সাংবাদিকতার সাহায্যে মানবতার সবথেকে ভালো এবং খারাপ এই দুই বিষয়েরই সাক্ষ্য বহন করা যায়। চিত্রসাংবাদিকের জীবনে ভ্রমণ অপরিহার্য। চিন্তা উদ্রেককারী খবর সংগ্রহের তাগিদে চিত্র সাংবাদিককে পৌঁছে যেতে হয় পৃথিবীর দূরতম প্রত্যন্ত প্রান্তে। চিত্রসাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজের বঞ্চিত, উপেক্ষিত অংশের দুরবস্থার কথা বলিষ্ঠভাবে ফুটে উঠে সমাজ, সরকার-এর মনোযোগ আকর্ষণ করে।

তদন্তমূলক সাংবাদিকতা : নিজস্ব প্রকৃতি ও আঙ্গিকের নিরিখে এক স্বাতন্ত্র্য দাবি করে তদন্তমূলক বা অনুসন্ধানধর্মী সাংবাদিকতা। অপরাধ, দুর্নীতি কিংবা বেআইনি কাজের খবর করতে গিয়ে বিশদ তদন্তের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে জাতীয় প্রতিবেদন। প্রথাগত সাংবাদিকতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে খবরের প্রতিবেদন নির্মাণ করা হয় অনেক বিস্তৃতভাবে। সংবাদের মূল উপদানগুলি যাতে সহজেই চিহ্নিত করা যায় এভাবেই খবর লেখা হয়। জনস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়েই সাধারণত তদন্তমূলক সাংবাদিকতা করা হয়।

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা : আধুনিক যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উঠে এসেছে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা। এ ধরনের সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষ তথা সমাজের কল্যাণসাধন। একটি সরকার ও জনসাধারণের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা আন্তঃসম্পর্কের নিরিখে চিন্তা, ভাবনা, ধারণা, কর্মসূচি, কাজ, নীতি বা প্রকল্প নিয়েই উন্নয়নমূলক সাংবাদিকএর কাজ। মিডিয়াকে গণতন্ত্রের প্রহরী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনুন্নত বা পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের মানুষ যারা দারিদ্র্যর সঙ্গে নিত্যদিন লড়াই করছেন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিষেবা যাঁরা পান না এমন মানুষের, এমন অনগ্রসর সমাজের কথাই উঠে আসে উন্নয়নমূলক সাংবাদিক-এর কলমে, লেন্সে, সরকার বা শাসক কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন উন্নয়নমূলক সাংবাদিকরা যাতে অনুন্নত অঞ্চলের মানুষ বা অনগ্রসর সমাজের সমস্যার সমাধান হয়। একজন উন্নয়নমূলক সাংবাদিক-এর লক্ষ্য হওয়া উচিত গ্রামীণ উন্নয়ন-এর প্রভাব গোটা দেশে কীভাবে পড়েছে বা পড়ছে বা পড়তে পারে তা খতিয়ে দেখা। এরই পাশাপাশি যাঁরা নিজেদের অধিকার এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধাগুলি থেকে এখনও বঞ্চিত তাঁদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চিয়তার নিরসনে সরকারএর মনোযোগ আকৃষ্ট করাও একজন উন্নয়নমূলক সাংবাদিক-এর দায়িত্ব।

৩.২.৪ সাংবাদিক-এর কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা

কোনও দেশ, শহর, শহরতলি কিংবা গ্রাম-এ সব থেকে পরিচিত এবং সম্মানীয় ব্যক্তি হলেন সাংবাদিক। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যেমন রাজ্যপাল, মন্ত্রী কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তির মতো একজন সাংবাদিক-এরও সমাজে প্রভাব ও ক্ষমতা রয়েছে। কোনও সংবাদপত্রের বা সংবাদমাধ্যমের ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রচারের উৎস ও কারণ সাংবাদিক। প্রচারপ্রিয় মানুষের প্রচারের মাধ্যমও সাংবাদিকই। প্রতিটি সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, জনসভায় কোনও অপরাধমূলক ঘটনায়, দুর্ঘটনায় বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে একজন সাংবাদিক সম্মানীয় স্থান ও মর্যাদা পেয়ে থাকেন। সংবাদপত্র, রেডিও কিংবা টেলিভিশন-এর পাঠক, শ্রোতা ও দর্শক, সাক্ষর-নিরক্ষর মানুষ নির্বিশেষে একজন সাংবাদিককে চিহ্নিত করতে পারেন, তাঁকে স্বীকৃতি দেন। সাধারণ মানুষ বিলক্ষণ জানেন ও বোঝেন যে সাংবাদিক যা লিখবেন সংবাদপত্রে, যা বলবেন রেডিও কিংবা টেলিভিশনে তা গোটা দেশ এমনকী পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ পড়বেন, শুনবেন কিংবা দেখবেন। কোনও ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেকেই সাংবাদিক কীভাবে সেই ঘটনা বা বিষয়টিকে উপস্থাপিত করবেন এই ভেবে চিন্তিত থাকেন। অনেকেই সাংবাদিককে

সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেন যাতে প্রতিবেদন তৈরির সময় সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক নমনীয় থেকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতেই খবরটি উপস্থাপিত করেন।

একটি সংবাদমাধ্যম-এর সুনাম ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রধানতঃ নির্ভর করে সেই মাধ্যম-এর সাংবাদিকদের ওপর। সাংবাদিকরাই কোনও সংবাদমাধ্যমকে গড়ে তুলতে পারে আবার নষ্টও করে ফেলতে পারে। যে কোনও সংবাদমাধ্যম-এর জীবনীশক্তি, ধমনীতে প্রবহমান রক্ত হলেন সাংবাদিকরা যাঁরা প্রতিনিয়ত পাঠক, শ্রোতা, দর্শকদের গোটা রাজ্য, দেশ বা পৃথিবীজুড়ে কী ঘটনাপ্রবাহ চলছে সে বিষয়ে অবহিত করেন ও শিক্ষিত করে তোলেন। বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে নিরপেক্ষ ভাবে সংবাদ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করেন সাংবাদিকরা। যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ঘটনার নানা দিকের সম্পূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ খবর সংগ্রহের জন্য ছোটেন সাংবাদিকরা। সাংবাদিক-এর পরিবেশিত সংবাদভাষ্য পড়ে, শুনে বা দেখে কোনও ঘটনা সম্পর্কে নিজস্ব মতামত তৈরি করেন পাঠক, শ্রোতা বা দর্শক। সাংবাদিকের পরিবেশিত প্রতিবেদন পড়ে, শুনে বা দেখে পাঠক শ্রোতা বা দর্শক বুঝতে পারেন প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ এবং প্রতিবেদনটিতে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে নাকি অসম্পূর্ণ এবং অনেক প্রশ্নেরই উত্তর নেই।

সাংবাদিক সম্পর্কে বলা হয় তাঁকে একজন ভালো গবেষক-গবেষিকা হতে হবে, একজন গোয়েন্দা হতে হবে, একজন আইনজীবীও হতে হবে যাতে কোনও প্রতিবেদন রচনা করতে গিয়ে কারও সম্মানহানি করে না ফেলেন। বর্ণনাধর্মী সাংবাদিককে শব্দের মাধ্যমে ঘটনা পরম্পরাকে তুলে ধরতে হয় এবং যাবতীয় পক্ষের অবস্থানকে পেশ করতে হয় প্রতিবেদনে। তাঁর প্রতিবেদনের শব্দগুলি যেন ঘটনার সঠিক মেজাজ ও ক্রমকে তুলে ধরে। সবথেকে কার্যকরী প্রতিবেদক তিনিই যিনি তাঁর সংবাদবোধকে তাঁর পর্যাপ্ত সাহিত্যিক অভিব্যক্তির সঙ্গে মেলাতে পারেন। গভীর বোধ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বলিষ্ঠ আবেদনমূলক প্রতিবেদন বেরিয়ে আসে সাংবাদিক-এর কলম থেকে।

তথ্য সংগ্রহই সাংবাদিকতার প্রধান উপজীব্য। এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কোন্ বা কী তথ্য? যে কোনও খবরের সঙ্গেই অনেক তথ্য যুক্ত থাকে। তিনিই ভালো সাংবাদিক যিনি যত বেশি সম্ভব প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন, সংগৃহীত তথ্যের থেকে নির্বাচন করে একটি বোধগম্য প্রতিবেদন উপস্থাপিত করতে পারবেন।

সরকারের শীর্ষ পদস্থ কর্তা এবং প্রশাসন তথা সমাজের ওপরতলার মানুষজনের সঙ্গে সাংবাদিকরা যেন বেশি নৈকট্য বা অন্তরঙ্গতা না রাখেন সে বিষয়ে সতর্ক করেন ওয়াল্টার লিপম্যান। জনজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের থেকে সাংবাদিকদের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার ওপর জোর দেন। রাজনীতিবিদদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সাংবাদিকের কাজের পরিধির ক্ষতি করতে পারে বলেই তাঁর অভিমত। অন্যদিকে 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর সম্পাদক বেঞ্জামিন্ ব্র্যাডলি তাঁর সাংবাদিক ও প্রতিবেদকদের বলতেন, ওয়াশিংটন-এ কী ঘটছে তা নৈশভোজের পার্টি থেকে জানা যায়। তাঁর মতে, যে সমস্ত সাংবাদিকরা কাজের সময়ের পরেও এক সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করেছেন তাঁরাই অনেক গোপন খবর জানতে পারেন। তিনি মনে করতেন ওয়াশিংটন-এর সেরা সাংবাদিকরা সুনামের সঙ্গেই গড়ে উঠেছেন কারণ তাঁদের খবরের উৎসগুলি দায়িত্ব নিয়ে গড়ে উঠেছিল। কোনও মানুষ কিছু চিন্তা করছেন বা কিছু জানেন সেটিকে বের করার দক্ষতা সাংবাদিক-এর থাকা উচিত। এক প্রথিতযশা লেখক মনে করেন, তিনিই বড় সাংবাদিক যিনি চরম প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও

সুযোগ বা সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারেন। কোনও একটি সংবাদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অসম্ভবতাই সাংবাদিক-এর কাছে প্রতিবন্ধকতা বা হতাশা হিসেবে দেখা দেয়। ওই লেখকই মন্তব্য করেন, একজন সৎ সাংবাদিকের শুধুমাত্র সংবাদ-এর উৎকোচই দেওয়া যেতে পারে।

একজন ভালো সাংবাদিক-এর কী কী কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা পালন করা উচিত সেই বিষয়ে একজন মার্কিন লেখক একটি তালিকা দেন যা নিচে বর্ণনা করা হল—

১. সঠিকতা/যথার্থতা : সাংবাদিককে তথ্য-পরিসংখ্যান-এর প্রতি দায়বদ্ধ হতে হবে। অনুমান নির্ভর বা অযত্নে পরীক্ষিত প্রতিবেদন শুধুমাত্র বিপর্যয়ই ঘটায়। সাংবাদিককে এই শ্লোগানটি মেনে চলতে হবে—খবর সবার আগে পেতে হবে কিন্তু প্রথমে সঠিক খবর পেতে হবে।

২. একজন সাংবাদিককে খবরকে চিনতে হবে, চিহ্নিত করতে হবে।

৩. কোনও খবর করতে গিয়ে সাংবাদিককে জানতে হবে তথ্য কোথা থেকে পাওয়া যাবে এবং গুরুত্বের নিরিখে তথ্যের ক্রমটি কী হবে।

৪. প্রকাশের স্বচ্ছতা: লেখা ও বলা দুক্ষেত্রেই স্বচ্ছভাবে নিজেকে প্রকাশ করার দক্ষতা থাকতে হবে সাংবাদিক-এর। কার্যকরী বাচিক উপস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম কারণ পেশাগত তাগিদেই একজন সাংবাদিককে অনেক মানষের সাক্ষাৎকার নিতে হয় এবং প্রায়শই সংবাদ ডেস্কে খবরটি বিশদে টেলিফোন-এর মাধ্যমে তাঁকে জানাতে হয়। কাজেই এটি সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে সাংবাদিক-এর পেশ করা সংবাদ প্রতিবেদন-এর প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট ও ত্রুটিহীন হয়।

৫. সাংবাদিককে মধুর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে।

৬. সমন্বয় পদ্ধতি: সাধারণ মানষকে নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সাংবাদিককে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হতে হবে।

৭. গতি: প্রতিবেদককে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে খবর করতে হবে। পাশাপাশি সময়ের চাপের সামনে ভেঙে পড়লেও চলবে না। সব থেকে কম সময়ের মধ্যে দুর্ঘটনা, বিপর্যয়সহ অন্যান্য খবর সংগ্রহ করতে হবে সাংবাদিককে না হলে তিনি ডেডলাইন রক্ষা করতে পারবেন না।

৮. অকপটতা: সংবাদ সংগ্রহের পদ্ধতির মৌলিকতা সম্পর্কে সাংবাদিককে সতর্ক থাকতে হবে বিশেষত তদন্তমূলক প্রতিবেদন-এর ক্ষেত্রে।

৯. সাংবদিক বা প্রতিবেদককে তাঁর সংবাদের উৎস বা সূত্র সম্পর্কে জানতে হবে।

১০. কীভাবে নাম ও ঠিকানা পরীক্ষা করে দেখতে হয় সে বিষয়েও সাংবাদিককে জানতে হবে।

১১. সাংবাদিক-এর নানা মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার দক্ষতা থাকতে হবে। তাঁকে বন্ধু-বান্ধব, চেনা-পরিচিতের এক দীর্ঘ তালিকা তৈরি রাখতে হবে যাতে প্রয়োজনে খবর করার সময় এই যোগসূত্রগুলি কাজে আসে। সাংবাদিককে ঘনিষ্ঠভাবে সমাজের প্রভাবশালী এমন মানুষজনকে চিনতে হবে যাতে খবর করার সময় সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।

১২. সাংবাদিককে পুলিশ-এর সঙ্গেও কার্যকরী সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে।

১৩. নিজের এলাকা সম্পর্কে সাংবাদিক-এর সম্যক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

১৪. কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলে তার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা সাংবাদিক-এর দায়িত্ব।

১৫. কপি লেখার সময় সাংবাদিককে সতর্ক থাকতে হবে যাতে প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় কোনও ত্রুটি না হয়। কারণ, গুরুত্বপূর্ণ খবরের এক প্রয়োজনীয় অংশ ওই প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি।

ভারতীয় সাংবাদিকদের এছাড়াও আরও দুটি বিষয়ে নজর রাখা প্রয়োজন। সংসদ, রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভা, সরকারি ও পেশাদারী সম্মেলন, বৈঠক, শিক্ষাসংক্রান্ত ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের বৈঠকের খবর করাও সাংবাদিক-এর কাজ। সাংবাদিককে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভার খবর করার সময় নাহলে তাঁর সংবাদমাধ্যম অপর্যাপ্ত খবর বা পক্ষপাতদুষ্ট খবর করার অভিযোগে অভিযুক্ত হবে। সাংসদ, বিধায়করা অনর্থক ক্ষিপ্ত হবেন, সাংবাদিক-এর সঙ্গে তাঁদের তিক্ততা সৃষ্টি হবে এমনকী সাংবাদিক স্বাধিকার ভঙ্গের দায়েও পড়তে পারেন। আইনসভার অভ্যন্তরে ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হতে হবে সাংবাদিককে। আইনসভার অভ্যন্তরে চলা বিতর্ক-কে সংক্ষেপে পরিবেশন করার দক্ষতাও থাকতে হবে সাংবাদিক-এর। পশ্চিমের দেশগুলির মতো ভারতেও জনসাধারণের এক বড় অংশ আগ্রহ সহ সংবাদমাধ্যমে চোখ ও কান রাখেন সংসদে ও বিধানসভায় কী ঘটছে তা জানার জন্য।

স্থানীয় সাংবাদিকতা কিংবা বিদেশ থেকে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও একই নীতি নির্দেশিকা প্রযোজ্য। সাংবাদিককে তথ্য খতিয়ে দেখতে হবে। উদ্ধৃতির সঠিকতা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। অভিযোগ ও সত্যতার মধ্যে ফারাক বুঝতে হবে। সত্যতা ও গুজবের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। মতামত ও সত্যতাকে মিশিয়ে ফেললে চলবে না।

সাংবাদিককে মনে রাখতে হবে তাঁর প্রতিবেদন রচনার সময় শব্দের ব্যবহার কীভাবে হবে সেই মুনশিয়ানাটি জানা জরুরি। এই দক্ষতার জোরেই তথ্য স্পষ্টভাবে, সহজে এবং ক্রমানুযায়ী আসে। এই মুনশিয়ানাই পাঠক, শ্রোতা, দর্শককে খবরের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। একটি ভালো সংবাদ প্রতিবেদনে সহজ, সরল ও স্পষ্ট ভাষায় তথ্য তথা বিষয়বস্তু পরিবেশিত হয়। একটি সহজ, সরল প্রতিবেদনে তথ্য-পরিসংখ্যানই মূল উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়। তথ্যের কোনও বিকল্প নেই। ছোট বাক্য শুনতে বা পড়ার ক্ষেত্রে সহজ হলেও খেয়াল রাখতে হবে যেন তা প্রতিবেদন-এর আঙ্গিককে নষ্ট না করে। সংবাদের সূচনা, পর্যায় বিন্যাস, বর্ণনা, উদ্ধৃতি, তুলনা, উদাহরণ ও সমাপ্তি বা উপসংহার-এর দক্ষতার সঙ্গে বিন্যাস ও প্রয়োগের মাধ্যমেই একজন সাংবাদিকের নিজস্ব ভঙ্গিমা বা আঙ্গিক গড়ে ওঠে। প্রচুর পড়াশোনা এবং খ্যাতনামা, প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকদের প্রতিবেদন পড়ে, শুনে বা দেখেই একজন সাংবাদিক-এর শব্দ ভাণ্ডার ও নিজস্ব লিখনশৈলী গড়ে ওঠে। আবার ভাষার ওপর যথেষ্ট দক্ষতা সম্পন্ন সাংবাদিককে প্রতিবেদন রচনার সময় শব্দ চয়ন ও তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হয়। গতি ও সংক্ষিপ্ততা কোনও প্রতিবেদন-এর সম্পদ হলেও স্বচ্ছতা ও শৈলীর নিজস্ব মূল্য রয়েছে। একজন লেখক মন্তব্য করেছেন, বাক্য বা বাক্যাংশ নিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। প্রতিবেদনের পাল ভাসিয়ে দিতে হবে সংবাদের মূল বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে। সর্বোপরি বিশেষণসহ যাবতীয় অনাবশ্যক, অতিরিক্ত শব্দ বর্জন করতে হবে।

কোনও সাংবাদিক প্রতিবেদনের সূচনা বাক্যে অনেক তথ্য ঠেসে পুরে দিলে অনেক ত্রুটির সূত্রপাত হয়। কপি লেখার আগে সাংবাদিক-এর ভাবা উচিত। সাংবাদিক-এর মনে রাখা উচিত অভিমত বা মতামত সম্পাদকীয় কলামের জন্য বরাদ্দ। তাঁকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে। কোনও বিতর্কের সম্ভাব্যর সব দিক-কে উপস্থাপিত করতে হবে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত যাবতীয় তথ্যের উৎস পাঠক, শ্রোতা ও দর্শককে জানাতে হবে এই দায়বদ্ধতা যেন তাঁর থাকে। অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের মতে, এই বিষয়গুলিই একজন সাংবাদিক-এর নিজস্ব শৈলী গঠনের মানসিক ভিত্তি রচনা করে। ভিত্তির অবশিষ্টাংশ অবশ্যই ব্যবহৃত ভাষার সৌকর্মের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমে সাংবাদিককে ব্যাকরণ ভালো জানতে হবে এবং আজীবন যে ভাষায় সাংবাদিকতা করবেন তার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। এই দুটি ভিত, একদিকে নীতি-নৈতিকতা ও অন্যদিকে ভাষা-র ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে শৈলী। প্রতিটি সংবাদ প্রতিবেদনের অংশই হল সঠিক ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা শৈলী। আপনা আপনি একে রপ্ত করা যায় না। একজন ভাস্কর যেমন কাদার তাল ছাঁচে ফেলে শিল্পকর্ম নির্মাণ করেন তেমনই শব্দকে ছাঁচে ফেলে সাংবাদিককেও শিল্পকর্ম নির্মাণ করতে হয়।

বক্তৃতা, সরকারি জ্ঞাপন কিংবা নীতি সংক্রান্ত বিবরণ-এর মূল বিষয়গুলির নির্যাস তুলে ধরাও একজন সাংবাদিক-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বক্তৃতা-র নিছক আক্ষরিক অনুবাদ করা সাংবাদিক-এর কাজ নয়। কারণ, আক্ষরিক প্রতিবেদনের কোনও বিচারবোধ-এর প্রয়োজন পড়ে না। একজন ভালো সাংবাদিক জানবেন একটি বক্তৃতা বা ঘোষণা-র মধ্যে সংবাদযোগ্য অংশ কোন্‌টি বা কতখানি। একটি বক্তৃতার কোন্ অংশটি সংবাদ এবং প্রতিবেদন যোগ্য তার গুরুত্ব বোঝার ক্ষমতা থাকতে হবে সাংবাদিক-এর।

সংবাদ-এর পিছনে ছুটতে গিয়ে যে বিষয়টি সাংবাদিক-কে ভাবিয়ে তোলে তা হল সংবাদ-এর উৎস। যে কোনও বিষয়ের খবর হোক না কেন উৎসই পরিস্থিতি ও সংবাদ-এর বিশদ বিবরণ জানেন। অনেক খবরই সরকারি নথি, দলিল-দস্তাবেজ-এর আড়ালে চাপা পড়ে থাকে। বুদ্ধিমান সাংবাদিকই সেগুলি থেকে তথ্য ও প্রয়োজনীয় প্রমাণ বের করেন। সবশেষে তিনি চেষ্টা করেন মানব সংবাদ উৎসকে চিহ্নিতকরে তা বের করতে।

সাংবাদিক-এর অন্যতম কাজ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা, কারণ এই সাক্ষাৎকার থেকেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর তৈরি হয়। তথ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস সাক্ষাৎকার। বিলাসবহুল পাঁচ-তারা হোটেল, রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল, বিমানবন্দর -এ নানা মানুষের আনাগোনা। সেইসব মানুষের সাক্ষাৎকার জন্ম দেয় বৈচিত্র্যপূর্ণ খবর-এর। অনেকক্ষেত্রে বিরল ও ব্যতিক্রমী সাক্ষাৎকার স্কুপ নিউজও তৈরি করে। একজন সাংবাদিক কীভাবে তাঁর সংবাদের উৎসকে কাজে লাগাচ্ছেন তার ওপর নির্ভর করে সংবাদ-এর প্রকৃতি। তাঁকে নিজের ওপর, যে ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তাঁর ওপর এবং সমগ্র অনুসন্ধান-এর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত।

সংবাদমাধ্যম-এর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত না হলে সংবাদ-এর মধ্যে সাংবাদিক-এর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। সম্পাদকীয় মন্তব্য বা মতামত থেকে সংবাদ-এর পৃথক থাকাই বাঞ্ছনীয়। কোনও ভদ্র সাংবাদিকই তাঁর প্রতিবেদন-এ কোনও ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করতে পারেন

না। জনস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন-এ শক্তিশালী ভাষার সঙ্গে শোভনীয় রুচিবোধেরও প্রতিফলন থাকা উচিত। ভালো লেখা লেখকের সঙ্গে পাঠকের এক ব্যক্তিগত সেতুবন্ধন রচনা করে। সংবাদ প্রতিবেদন পাঠ করে পাঠকের মনে নতুন আবেগ বা চিন্তা-ভাবনার জন্ম হতে পারে। সংবাদ প্রতিবেদন-এর রকমফেরে তা পাঠ করে পাঠক কাঁদতে পারেন আবার হেসেও উঠতে পারেন। একটি সংবাদ প্রতিবেদন-এর সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য তার স্বচ্ছতা। একটি প্রতিবেদনে ছন্দ ও বর্ণময়তা থাকা উচিত। একজন লেখক মন্তব্য করেছেন, একটি ভালো সংবাদ সূচনা পাঠক, শ্রোতা বা দর্শক-এর মাথার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। যে কোনও সাংবাদিক-এর বাক্যের ছন্দ নিয়ে ভাবা উচিত। কারণ, তাঁর মতে কিছু সময় পরেই তা অবচেতনে চলে আসে।

৩.২.৫ সারাংশ

সংবাদপত্র-পত্রিকায় লেখালিখির পেশাই এককথায় সাংবাদিকতা, সাংবাদিক-এর কাজ দ্বিবিধ। এক, সংবাদ সংগ্রহ এবং দুই, তথ্যের বন্টন বা সরবরাহ। যে কোনও সংবাদমাধ্যমে সংবাদের সংগ্রহ, লিখন, সম্পাদনা এবং প্রকাশকেই সাংবাদিকতা বলে। সংবাদপত্র, পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে সংবাদ প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় নির্মাণই সাংবাদিকতা।

'জার্নাল শব্দটি থেকে সাংবাদিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'জার্নালিজম'-এর উৎপত্তি। 'জার্নাল'-এর অর্থ প্রাত্যহিক নিবন্ধীকরণ বা এমন এক ডায়েরি যেখানে প্রতিদিনের ঘটনা পরম্পরার দিনলিপি লেখা থাকে। কার্যকর সাংবাদিকতাকে সর্বদা সময়ের সঙ্গে গতিশীল ও তৎপর থাকতে হয়।

প্রেসকে বলা হয় চতুর্থ বা ফোর্থ এস্টেট। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদমাধ্যমকে গণ্য করা হয়। সংবাদপত্র, পত্রিকা, পাক্ষিক প্রভৃতি মুদ্রণ মাধ্যমে সংবাদ ও সংবাদ বিষয়ক প্রতিবেদন রচনাই মুদ্রণ সাংবাদিকতায় অন্তর্ভূক্ত। সম্প্রচার সাংবাদিকতায় রেডিও ও টেলিভিশনকে ব্যবহার করা হয় সংবাদ ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সম্প্রচারে। ইন্টারনেট ভিত্তিক সাংবাদিকতায় জন্ম নিয়েছে অনলাইন বা সাইবার বা ডিজিট্যাল সাংবাদিকতা। ক্রীড়া থেকে ট্যাবলয়েড, চিত্র থেকে তদন্তমূলক বা উন্নয়নমূলক, সাংবাদিকতার কতই না প্রকারভেদ।

একটি সংবাদমাধ্যম-এর সুনাম ও বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে সেই মাধ্যম-এর সাংবাদিকদের ওপর। বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে সংবাদ ও সংবাদ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করাই সাংবাদিক-এর কাজ। সাংবাদিককে শব্দের মাধ্যমে ঘটনা পরম্পরাকে তুলে ধরতে হয় এবং যাবতীয় পক্ষের অবস্থানকে পেশ করতে হয় প্রতিবেদনে। তথ্য সংগ্রহই সাংবাদিকতার প্রধান উপজীব্য।

একজন ভালো সাংবাদিক-এর কিছু কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা পালন করা উচিত। কিছু নীতি-নির্দেশিকা মেনে চলা উচিত। সাংবাদিককে তথ্য খতিয়ে দেখতে হবে। উদ্ধৃতির সঠিকতা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। সত্যতা ও গুজবের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। গতি ও সংক্ষিপ্ততা কোনও প্রতিবেদন-এর সম্পদ হলেও স্বচ্ছতা ও শৈলীরও নিজস্ব মূল্য রয়েছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত যাবতীয় তথ্যের উৎস পাঠক, শ্রোতা ও দর্শককে জানাতে হবে এই দায়বদ্ধতা যেন সাংবাদিক-এর থাকে।

সাংবাদিক-এর অন্যতম কাজ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা, কারণ এই সাক্ষাৎকার থেকেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর তৈরি হয়। তথ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস সাক্ষাৎকার।

৩.২.৬ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১. নিচের সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন :

(ক) সাংবাদিকতার সংজ্ঞা

(খ) মুদ্রণ, সম্প্রচার ও ডিজিট্যাল সাংবাদিকতা

(গ) ক্রীড়া সাংবাদিকতা বনাম ট্যাবলয়েড সাংবাদিকতা

(ঘ) তদন্তমূলক সাংবাদিকতা বনাম উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা

(ঙ) সাংবাদিক-এর কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা

বড় প্রশ্ন :

১. সাংবাদিকতা বলতে কী বোঝেন? এর ধারণা ও সংজ্ঞা দিন।

২. সাংবাদিকতার প্রধান কয়েকটি প্রকারভেদ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৩. সাংবাদিক-এর কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা কী কী? বর্ণনা করুন।

৩.২.৭ তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী

১. Fleming, C., Hemmingway, E., Moore, G., Welford, D. (2005). Introduction to Journalism (1st ed.). SAGE Publications. Retrieved from https://www.perlego.com/book/861104/introduction-to-journalism-pdf (Original work published 2005)

২. Itule, B.D. Anderson, D.A. (1999). News Writing and Reporting for Today's Media. McGraw-Hill Higher Education.

৩. Kamath, M.V. (1980). Professional Journalism. Vikas Publishing House.

৪. Keeble, R., Reeves, I. (2014). The Newspapers Handbook (5th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203143612

৫. Parathasarathy, R. (1984). Basic Journalism. Laxmi Publications

৬. Randall, D. (2016). The Universal Journalist - Fifth Edition (5th ed.). Pluto Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt1bh4b0w

৭. Stein, M.L., Paterno, S.F., Burnett, R.C. (2006). Newswriter's Handbook : An Introduction to Journalism. Blackwell Publishing.

একক ৩ ❑ উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা

গঠন

৩.৩.১ উদ্দেশ্য

৩.৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩.৩ উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা

৩.৩.৩.১ জাতীয় প্রেক্ষাপট

৩.৩.৩.২ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

৩.৩.৪ সারাংশ

৩.৩.৫ অনুশীলনী

৩.৩.৬ তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

৩.৩.১ উদ্দেশ্য

এক এককে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার ধারণা, ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার নানাবিধ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার কৌশল, নানাবিধ উন্নয়ন-এর সাফল্যের কথা, উন্নয়নমূলক সংবাদের অন্বেষণ, উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য, উন্নয়নমূলক সাংবাদিক-এর কী কী গুণ ও দক্ষতা থাকা বাঞ্ছনীয় এবং সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.৩.২ প্রস্তাবনা

দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই স্বাধীন ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাত ঘটেছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। কিছু পরিবর্তনকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে জনসাধারণ স্বাগত জানালেও অন্যান্য কিছু পরিবর্তন বিনা প্রশ্নে গৃহীত হয়নি এমনকী জনসাধারণের বিরোধিতারও সম্মুখীন হয়। এই রূপান্তরের হাত ধরেই কিছু নতুন বিষয়ের উত্থান ঘটে যা বিতর্কের কেন্দ্রে চলে আসে। উন্নয়নমূলক সাংবাদিক-এর কাজ এই বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করা, এর মূল্যায়ণ করা এবং উন্নয়নমূলক বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা। সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার দ্বারা গৃহীত ও রূপায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক নীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে পাঠক, শ্রোতা ও দর্শককে অবহিত করা। উন্নয়নমূলক সাংবাদিক-এর অন্যতম কাজ সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক নীতি ও প্রকল্প সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা। কীভাবে

এই নীতি বা প্রকল্প জনহিতে কাজ করবে এবং কীভাবেই বা সাধারণ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হবেন সে বিষয়েও মানুষকে অবগত করা এবং এজাতীয় নীতি ও প্রকল্প যাতে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হতে পারে তার জন্য এক অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা।

৩.৩.৩ উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা

দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই স্বাধীন ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাত ঘটেছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। কিছু পরিবর্তনকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে জনসাধারণ স্বাগত জানালেও অন্যান্য কিছু পরিবর্তন বিনা প্রশ্নে গৃহীত হয়নি এমনকী জনসাধারণের বিরোধিতারও সম্মুখীন হয়। এই রূপান্তরের হাত ধরেই কিছু নতুন বিষয়ের উত্থান ঘটে যা বিতর্কের কেন্দ্রে চলে আসে। উন্নয়নমূলক সাংবাদিক-এর কাজ এই বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করা, এর মূল্যায়ণ করা এবং উন্নয়নমূলক বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা। সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার দ্বারা গৃহীত ও রূপায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক নীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে পাঠক, শ্রোতা ও দর্শককে অবহিত করা। উন্নয়নমূলক সাংবাদিক-এর অন্যতম কাজ সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক নীতি ও প্রকল্প সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা। কীভাবে এই নীতি বা প্রকল্প জনহিতে কাজ করবে এবং কীভাবেই বা সাধারণ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হবেন সে বিষয়েও মানুষকে অবগত করা এবং এজাতীয় নীতি ও প্রকল্প যাতে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হতে পারে তার জন্য এক অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা।

উন্নয়ন এমন কিছু সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসে যা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা করে, সামাজিক উন্নয়ন সংঘঠিত করে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণের ফলেই বহুমাত্রিক পরিবর্তগুলি সাধিত হয়, যেমন, নতুন রাস্তা বা সড়ক নির্মাণ, নতুন বাসস্থান বা আবাসন নির্মাণ, প্রত্যেক নাগরিকের জন্য পর্যাপ্ত পরিশ্রুত পানীয় জলের জোগান, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, মোবাইল, ইন্টারনেটসহ জ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির সহজলভ্যতা, গ্রামীণ অঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, দেশের ছাত্রছাত্রীদের আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা সরবরাহ করার জন্য বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন থেকে শুরু করে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা ইত্যাদি। চারপাশে সংগঠিত হওয়া নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা ও শিক্ষিত করে তোলার জন্য নতুন নতুন বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্রের সূচনা হয়। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মৌলিক চাহিদা হল খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সহ বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ ইত্যাদি। দ্রুত উন্নয়নই মানুষের এজাতীয় চাহিদা পূরণ করতে পারে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত অধিকাংশ মানুষের উপার্জন বা আয় বৃদ্ধি এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। উন্নয়নমূলক বিষয়ে লেখার জন্য কিছু নির্দিষ্ট গুণ ও প্রস্তুতি দরকার। নিজের কাজ দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে পালন করার জন্য একজন প্রতিবেদক-এর সরকার-এর যাবতীয় উন্নয়নমূলক নীতি ও কর্মসূচি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার কৌশল : উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার ফলেই আজ সাধারণ মানুষ অরণ্য ধ্বংসের নানাবিধ ক্ষতিকর প্রভাব যেমন, দূষণ, রজল সংক্রান্ত সমস্যা, বালির ক্ষয় ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। আমাদের উন্নয়নের লক্ষ্য ও কৌশলগুলি নিয়ে পুনরায় ভাবার সুযোগ এনে দেয় উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা। অনেক সাংবাদিক উন্নয়নমূলক প্রতিবেদনের মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্যকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকদের নিচের বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখা বাঞ্ছনীয়।

১. ইতিমধ্যেই উন্নত এমন এলাকা থেকে তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা উচিত। এজন্য উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা প্রয়োজন। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত আধিকারিকদের মতামত গ্রহণও দরকার।

২. উন্নয়নমূলক সংবাদ প্রতিবেদন রচনা করতে গেলে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিসংখ্যানের উল্লেখ করতেই হবে।

৩. কোনও সুনির্দিষ্ট উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বা কর্মসূচি বিষয়ে খবর বা সংবাদ প্রতিবেদন করার সময় সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক-এর নিজস্ব বিচার-বিবেচনা ও থাকা প্রয়োজন।

৪. উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন-এর ভাষা হবে যতদূর সম্ভব সহজ-সরল। আয়, ব্যয়, সাক্ষরতার হার প্রভৃতি বিষয়ে পরিসংখ্যান দেওয়ার সময় ভগ্নাংশের পরিবর্তে পূর্ণ সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

৫. উন্নয়নমূলক প্রতিবেদনে পরিসংখ্যানের তুলনামূলক উপস্থাপনা সর্বদাই কার্যকরী ও সহায়ক হয়। ধরা যাক, বর্তমান গণজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনায় কোনও নতুন প্রযুক্তির প্রভাব নিয়ে কেউ প্রতিবেদন লিখছেন সেক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি অনেক বেশি কার্যকরী হবে যদি সেখানে নয়া প্রযুক্তি ব্যবহারের আগের অবস্থা ও ব্যবহারের পরের অবস্থা নিয়ে একটি তুলনামূলক ছবিতুলে ধরা যায়।

সাফল্যের কাহিনি : সাধারণভাবে এটি লক্ষ্য করা যায় যে উন্নয়মূলক প্রতিবেদন রচনার সময় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক নীতি ও কর্মসূচির সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরা হয়। যেমন, আন্তর্জাতিক স্তরে বৃদ্ধি ও উন্নয়নের নিরিখে জাপান-এর সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরা হয়। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রথম তিন দশকে সেদেশের উন্নয়নের কথা বারংবার অনেক উন্নয়নমূলক সাংবাদিক তাঁদের নিবন্ধে বা প্রতিবেদনের বারংবার উপস্থিত করেছেন। ভারতের ক্ষেত্রে দেশে সবুজ বিপ্লব সংগঠিত করার ক্ষেত্রে পাঞ্জাব-এর অবদানের কথা এবং দেশের খাদ্যোৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে ওই রাজ্যের কথা বারংবার বিভিন্ন সাংবাদিকের লিখিত উন্নয়নমূলক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। আবার উন্নয়নমূলক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ব্যর্থতার খতিয়ানও। বলাই বাহুল্য, সাফল্য ও ব্যর্থতা উভয় থেকেই মানুষ শিক্ষাগ্রহণ করেন। সাফল্যের কাহিনি থেকে মানুষ অনুপ্রেরণা পান। মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। মানুষ মনে করেন অন্যরা পারলে তিনি বা তাঁরাই বা পারবেন না কেন? আবার ব্যর্থতা থেকে মানুষ অতীতে কী কী ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছিল সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে পারেন। ভবিষ্যতে সতর্কতার সঙ্গে উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। ভবিষ্যতে গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচির রূপায়ণে অতীতের

ত্রুটি-বিচ্যুতির পুনরাবৃত্তির সুযোগ থাকে না। সুন্দরলাল বহুগুণা, ভরত ডোগরা-র মতো সমাজকর্মী বা অন্যান্য অনেক পরিবেশবিদ বিভিন্ন বাঁধ নির্মাণ হেতু বহু মানুষের উচ্ছেদ সংক্রান্ত সমস্যার জন্য লিখিত নিবন্ধে যুক্তিসহ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরকমই এক নিবন্ধের শিরোনাম ছিল 'ওয়ার্মস ইন ব্রেকফাস্ট বাস্কেট'।

৩.৩.৩.১ জাতীয় প্রেক্ষাপট

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা আদতে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের কাজ। স্বভাবতই এর জন্য প্রয়োজন গবেষণা, শ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও অনুশীলন। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় মুদ্রণ মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস', 'দ্য হিন্দু'-র মতো প্রথম সারির প্রায় সমস্ত সর্বভারতীয় দৈনিকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি গোটা পৃষ্ঠা বরাদ্ধ থাকে উন্নয়নমূলক সংবাদের জন্য। উন্নয়মূলক সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সব থেকে ভালো সাংবাদিকতার লিখনশৈলী হল ফিচার। উন্নয়নমূলক প্রতিবেদনকে ছবিসহ আরও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত করা যায়। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকার প্রকাশও পাঠক সমাজে আদৃত হয়। পি.টি.আই বা ইউ.এন.আই-এর মতো দেশীয় সংবাদ সংস্থায় উন্নয়মূলক খবরের জন্য আলাদা সংবাদ ডেস্ক রয়েছে।

রেডিও বা বেতারের জন্য উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন করার সময় প্রতিবেদককে মনে রাখতে হয় যে তিনি শ্রোতার সঙ্গে আলাপচারিতায় রয়েছেন, কিছু পড়ছেন না। এক্ষেত্রে সহজ-সরল শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগ করতে হয়। 'আমি' 'তুমি'বা 'আপনি' করে সম্বোধন করলে শ্রোতার সঙ্গে একের সঙ্গে এক সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। নিরক্ষর শ্রোতার কাছে পৌঁছনোর সেরা মাধ্যম হল রেডিও। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার কাজই হল উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করা। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার লক্ষ্য পূরণ করতে পারার মধ্যেই নিহিত থাকে একজন উন্নয়নমূলক প্রতিবেদক বা সাংবাদিকের সাফল্য।

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক নীতি, প্রকল্প ও কর্মসূচির মধ্যে কী কী ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে তাকে অনুসন্ধান বা আবিষ্কার করার প্রশ্নে একটি ভালো টেলিভিশন অনুষ্ঠান অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। টেলিভিশনে উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান এমনভাবে সম্প্রচার করা হয় যাতে দর্শক তা দেখে সহজেই বুঝতে পারেন। শ্রাব্য-দৃশ্য মাধ্যম হওয়ায় দর্শকের কাছে টেলিভিশন-এর আবেদনও অনেক বেশি। উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির সাফল্যের খতিয়ান সম্প্রচারের মাধ্যমে টেলিভিশন সহজেই দর্শককে অনুপ্রাণিত করতে পারে যাতে আগামীর উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষ আরও বেশি বেশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অর্থবহ ও প্রভাববিস্তারকারী দৃশ্যই এক্ষেত্রে মূলত নির্বাচিত করা হয়। অর্থবহ দৃশ্য নিছক শুকনো তথ্য পরিসংখ্যানের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকরী হয়। ভারতের অধিকাংশ টেলিভিশন চ্যানেল মূলত শহুরে দর্শকের কথা মাথায় রেখেই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। দেশের জাতীয় চ্যানেল দূরদর্শন এর ব্যতিক্রম ছিল। কিন্তু এখন এমনকী দূরদর্শনকেও বাজার অর্থনীতির চাপের সম্মুখীন হতে

হচ্ছে। শহরাঞ্চলে উন্নয়ন বিষয়ক ধারণা তেমন অগ্রাধিকার পায় না। বিভিন্ন শহর ও গ্রামের উন্নয়ন যদি মানদণ্ডের নিরিখে পরিমাপ করা হয় তাহলে ধনী ও গরিবের মধ্যবর্তী অসাম্য উন্মোচিত হবে। স্পষ্টতই বোঝা যায় উন্নয়ন-এর ফল জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কাছে এখনও অধরাই থেকে গেছে।

পরিশেষে বলা যায়, উন্নয়ন আদৌ কোনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। একইভাবে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতাও একটি অপেক্ষিক বিষয়। উন্নয়ন-এর মতোই উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতারও বৈচিত্র্য বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে পরিলক্ষিত হয়।

৩.৩.৩.২ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

বিশ্বায়ন এর যুগে উন্নয়ন-এর ধারণা নিয়ে কোনও স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই। প্রতিদিনই কিছু না কিছু বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এটি প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে উন্নয়ন এর এক সর্বজনীন সংজ্ঞা প্রদানের। উন্নয়ন-এর বিশেষজ্ঞরা নিজ নিজ বোধগম্যতা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতাকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। ভিলানিয়াম (১৯৭৫)-এর মতে একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত সাংবাদিকতা। তিনি মনে করেন, উন্নয়ন বিষয়ক যাবতীয় বিষয়ই উন্নয়নমূলক সংবাদের আওতায় আসে। কাজেই তাঁর চোখে উন্নয়নমূলক সংবাদের অর্থ প্রশাসনিক সংস্কার, খাদ্যোৎপাদনে উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক সংবাদ, দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সংক্রান্ত সংবাদ, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান বিষয়ক সংবাদ, পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও ওষুধ সংক্রান্ত সংবাদ পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জাতীয় সংহতি বিষয়ক সংবাদ, সমাজ সংস্কার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বিষয়ক সংবাদ, টেলিকমিনিকেশন, গণজ্ঞাপন ও পরিবহন উন্নয়ন বিষয়ক খবর প্রভৃতি।

এরই সমান্তরালে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা এমন কিছু বিষয়কেও উপস্থাপিত করে যা উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। যেমন, জাতের নামে বঞ্চনা, নারী ও শিশুকেন্দ্রিক অপরাধ, সামাজিক প্রান্তিকীকরণ সহ আরও নানা অনুসারী বিষয়। লিঙ্গ ক্ষমতায়নও উন্নয়ন-এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। মোটামুটি ১৯৯০-এর দশক থেকেই উন্নয়ন-এর সংজ্ঞায় এক রূপান্তর-এর পর্ব সূচিত হয়। মানব উন্নয়ন-এর বিষয়টি যার কেন্দ্রে চলে আসে। মানব উন্নয়ন এমন এক প্রক্রিয়া যা জনসাধারণের পছন্দের পরিসরটিকে সম্প্রসারিত করে তোলে। নীতিগতভাবে, এই পছন্দের তালিকাটি অসীম এবং সময় সময় সেক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু উন্নয়ন-এর সর্বস্তরেই মানুষের তিনটি অপরিহার্য ক্ষেত্রে থাকে। এক, মানুষের দীর্ঘ ও স্বাস্থ্যকর জীবন, দুই, জ্ঞান অন্বেষণ ও অর্জন এবং তিন, ভদ্রস্থ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য সম্পদ প্রাপ্তির সুযোগ। এই পছন্দসই সুযোগগুলি না থাকলে সাধারণ মানুষ বিশেষত গ্রামীণ জনসমষ্টির কাছে অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা মেলেনা বা কার্যত অধরাই থেকে যায়। মানুষ বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদাগুলি থেকে বঞ্চিত হলে উন্নয়ন-এর সম্ভাবনা বিলীন হয়ে যায়। মানব উন্নয়নসূচক এক মিশ্র সূচক প্রক্রিয়া যা মানব উন্নয়নকে পরিমাপ করে থাকে। জীবনকালে নিরিখে মানুষের আয়ু, প্রাপ্তবয়স্কের

সাক্ষরতা ও গড়পড়তা বিদ্যালয় জীবনের নিরিখে জ্ঞান, ক্রয়ক্ষমতার নিরিখে জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি এজাতীয় সূচক পরিমাপ করে থাকে। বর্তমান বিশ্বায়ন-এর এই সময় পর্বে উন্নয়ন-এর এই সম্প্রসারিত সংজ্ঞাটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ মানব উন্নয়ন-এর নানাবিধ প্রেক্ষিত ও মানুষের নিরাপত্তা-র বিষয়গুলিও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। মানব উন্নয়ন-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য নানাবিধ প্রণীত নীতি থেকে উদ্ভূত মানুষের উন্নয়ন-এর প্রকৃতি স্থির করা এবং নিজ নিজ কর্মস্থলে, বাসস্থানে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় মানুষ সুরক্ষিত কিনা তা স্থির করা। এজাতীয় উন্নয়ন-এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য মানুষের ক্ষমতায়ন। অজস্র সম্ভাবনার দিক উন্মোচিত করা যাতে বেকারত্ব দূর হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সহযোগিতায় মানুষের অংশগ্রহণ; এবং এভাবেই এক মানুষ কেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহায়ক এক আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

এক্ষেত্রেই উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। উন্নয়নমূলক জ্ঞাপন বিশেষজ্ঞদের মতে একজন ভালো সাংবাদিক-এর উন্নয়ন বিষয়ক কোনও খবরকে ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়ার পরই সে বিষয়ে সংবাদ করা উচিত। উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি ও কতদূর তা বাস্তবায়িত হয়েছে এই বিষয়ে একজন সাংবাদিকের স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত। সরকারি নথি বা প্রতিবেদনে যা দাবি করা হয়েছে সেই অনুযায়ী মানুষ উপকৃত হয়েছেন কিনা সে বিষয়েও তাঁর ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। মনে করা হয়, উন্নয়নমূলক ঘটনার রিপোর্টিংই উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা নয়। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা আদতে উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়ার রিপোর্টিং। এর অর্থ উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার অভিনিবেশ এক দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। কোনও একটি নির্দিষ্ট দিনের ঘটনাপ্রবাহ থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লিষ্ট ঘটনা প্রবাহের প্রভাব একটি সময়পর্ব ধরে কতখানি রেস ফেলেছে। উন্নয়ন বিষয়ক সরকার-এর গৃহীত পদক্ষেপের ফলাফল বা প্রভাব পরীক্ষা করে দেখাও উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার কাজের মধ্যে পড়ে। উন্নয়নমূলক প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্য ও পরিসংখ্যান-এর যথাযথ ব্যাখ্যা করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যাবতীয় তথ্য ও পরিসংখ্যানের সঙ্গে তৃণমূলস্তরে উন্নয়ন-এর প্রশ্ন জড়িত। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার তথ্যের প্রধান উৎস গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষ, সমাজের প্রান্তিক অংশ, ভূমিহীন কৃষক। সমাজের স্বচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত অংশের সাউন্ড বাইট বা সাক্ষাৎকার বা প্রতিক্রিয়াই উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার একমাত্র বিচার্য নয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সাক্ষরতা, জ্ঞাপন, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা, শিশুকল্যাণ, জাতীয় সংহতি সহ আরও নানা বিষয়ে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা চলছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও বর্তমান প্রাপ্ত সম্পদের কার্যকরী ব্যবহার-এর মতো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি।

আন্তর্জাতিক পরিসরে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার সূত্রপাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পরবর্তী সময়কাল থেকে যখন এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে উন্নয়নমলক জ্ঞাপন তার শিকড় প্রোথিত করতে শুরু করে। জাতীয় উন্নয়নে জ্ঞাপনের বিধিবদ্ধ ব্যবহারের ক্রমশ সূত্রপাত ঘটে। বিশ শতকের সূচনায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলের মানষকে পরিবেশকে ভালোভাবে বুঝতে সহায়তা করে গণমাধ্যম। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় সংবাদের শিক্ষামূলক

ও তথ্যমূলক ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। মানুষকে তথ্য সরবরাহ করে উন্নয়ন বিষয়ে ও তার প্রভাব বা ফলাফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা হয়। এ ধরনের সাংবাদিকতায় এমনভাবে সংবাদ পরিবেশন করা হয় যা মানুষকে তাঁর সামাজিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করবে। সরকারের নানাবিধ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সম্পর্কেও মানুষকে সচেতন করা হয়। এজাতীয় সাংবাদিকতাকে সরকারকে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সহায়তা করে। স্বনিযুক্তি গোষ্ঠী ও স্থানীয় স্তরে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খবর সরবরাহের মাধ্যমে এ জাতীয় কর্মসূচিকে অন্যান্য গ্রামীণ অঞ্চলে সম্প্রসারিত করতে এজাতীয় সাংবাদিকতা সাহায্য করে। অ-কৃষিজ ক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতেও উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন, দুর্নীতি, বেকারত্ব, দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রভৃতি বিষয়েও উন্নয়নমূলক সাংবাদিক খবর করেন।

কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার অনেক আঙ্গিক রয়েছে। যেমন, একটি আঙ্গিক হল তদন্তমূলক সাংবাদিকতা। পশ্চিমী ধাঁচের এই সাংবাদিকতার আঙ্গিকে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের নিরিখে সরকার-এর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে প্রতিবেদন রচনা করা হয়। জনসাধারণের কাছে প্রকৃত তথ্য পৌঁছে দেওয়া হয়। কাজেই সরকারও সতর্ক থাকে এই ভেবে যে সরকার-এর কাজকর্মের ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। অসত্য তথ্য সরবরাহ করা থেকে বিরত থেকে সরকার বরং উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

সমাজে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতাই তুলে ধরে। অংশীদারমূলক জ্ঞাপনকে উৎসাহিত করে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা। এই সাংবাদিকতা উন্নয়ন-এর প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষকে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার সফল রূপায়ণের জন্য সরকার, সাধারণ মানুষ এবং সাংবাদিক-এর মধ্যে এক স্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রয়োজন। এই পরিবেশেই সরকারের শুরু করা উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়গুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সাংবাদিকরা পালন করেন। সমস্যার সমাধান-এর অংশ হিসেবেই সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে কথা বলার পূর্ণ স্বাধীনতা গণমাধ্যম-এর থাকা উচিত। এক্ষেত্রে ভালো দৃষ্টান্ত হতে পারে জীবনের প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সফল হওয়া মানুষের সাফল্যের কাহিনি গুরুত্ব সহ উপস্থাপন করা।

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই উন্নয়নমূলক নীতি সংক্রান্ত তথ্য, নীতির সাফল্য বা ব্যর্থতা বিষয়ক সংবাদ, তথ্য, পরিসংখ্যান সাংবাদিকদের সরবরাহ করে শুধুমাত্র সরকার। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, সরকারি তথ্য-পরিসংখ্যানে ভুল বা অসত্য তথ্য থাকার সম্ভাবনা থাকে কারণ, সরকার জনপ্রিয়তা হারাতে চায় না। সমালোচকদের যুক্তি, উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়মূলক সাংবাদিকতায় ছদ্ম খবর মিশে থাকে যা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রচার সেরে দেয়। এশিয়া মহাদেশের অনেক দেশেই এই যুক্তি অনেকাংশে প্রযোজ্য। সরকারি প্রকল্পের বিনামূল্যে প্রচার প্রায়শই সমালোচনার মুখে পড়ে। কাজেই, উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখার স্বার্থেই সাংবাদিককে পক্ষপাতদুষ্ট হলে চলবে না। কোনও সরকারি উন্নয়মূলক প্রকল্পের

ইতিবাচক-নেতিবাচক উভয় দিকই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সাংবাদিকতা এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায়, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে বৈকি। গণতান্ত্রিক কর্তব্য পালন করবে সাংবাদিকতা-র কাছে এটিই প্রত্যাশিত। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সাংবাদিকতা বিবেচিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটি প্রয়োজনীয় যে সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কথা সংবাদমাধ্যম গুরুত্বসহ প্রচার করবে তবে অবশ্যই নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে। এভাবেই গণমাধ্যম একটি দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং এরই পাশাপাশি সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর সম্পর্কও বজায় রাখতে সক্ষম হতে পারে।

উন্নয়নমূলক জ্ঞাপন-এর লক্ষ্য :

একটি ভালো উন্নয়নমূলক জ্ঞাপন-এর লক্ষ্যগুলি চিহ্নিত করেছেন ফোরসাইথি। তাঁর মতে—

১. উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার একটি মৌলিক উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তা হল সাধারণর মানুষকে অবহিত করা, শিক্ষিত করে তোলা এবং বিনোদন জোগানো।

২. উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার বুনিয়াদি লক্ষ্য হল অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা-র মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষকে উন্নয়নমুখী করে তোলা।

৩. উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার উন্নয়ন সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করা উচিত যাতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সুবিধা হয়।

৪. সরকার-এর উন্নয়নমূলক নীতি ও প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে একাধারে জনসাধারণ ও নেতৃবর্গের মধ্যে এক পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরি এবং অন্যধারে সাধারণ মানুষের চাহিদা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সরকার-এর কাছে পৌঁছে দেওয়াই উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার কাজ।

৫. উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতাকে সমাজের প্রকৃত চাহিদা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ও উন্নয়নমূলক নীতিকে উৎসাহিত করতে হবে। উৎসাহিত করতে হবে এমন এক অংশীদারিত্বমূলক পরিবেশ যেখানে সাধারণ মানুষ উন্নয়ন-এর জন্য কাজ করবেন।

৬. সহযোগিতা, দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় প্রচেষ্টা, কৃষি উৎপাদনে অগ্রগতি, স্বাস্থ্যকর ও স্বাস্থ্যসচেতনতামূলক কাজ, নতুন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনকে স্বীকার করার ন্যায় উৎপাদনমুখীর ইতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করার মতো এক স্বাস্থ্যকর পরিবেশকে সাধারণ মানুষের মধ্যে অণুপ্রাণিত করে তোলাও উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার কাজ।

৭. জাতীয় উন্নয়নকে সযত্নে লালন করা এবং একটি দেশের উন্নয়ন-এর পক্ষে সহায়ক জ্ঞান ও ধারণা গড়ে তোলাও উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার দায়িত্ব।

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার মূল ধারণা জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক অবদান রাখা। গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রের উন্নয়নে অবদান রাখতে হবে। জাতীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে সংবাদ অগ্রাধিকার দিয়ে পরিবেশন করতে হবে। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতাকে কোনও একটি দেশ-এর শান্তি ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৩.৩.৪ সারাংশ

উন্নয়নমূলক সাংবাদিক-এর কাজ সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার দ্বারা গৃহীত ও রূপায়িত বিবিধ উন্নয়নমূলক নীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে পাঠক, শ্রোতা ও দর্শককে অবহিত করা ও জনসাধারণকে সচেতন করো তোলা। উন্নয়ন বিষয়ে সাংবাদিকতা করার জন্য সাংবাদিক-এর কিছু নির্দিষ্ট গুণ, দক্ষতা ও প্রস্তুতি থাকা দরকার। নিজের কাজ দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে পালন করার জন্য একজন উন্নয়নমূলক প্রতিবেদক-এর যাবতীয় উন্নয়নমুলক নীতি ও কর্মসূচি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা আদতে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের কাজ। স্বভাবতই এর জন্য প্রয়োজন গবেষণা, শ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও অনুশীলন। উন্নয়ন-এর মতোই উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতারও বৈচিত্র্য বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে পরিলক্ষিত হয়। সরকার-এর উন্নয়ন বিষয়ক গৃহীত পদক্ষেপ-এর ফলাফল বা প্রভাব পরীক্ষা করে দেখাও উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার কাজের মধ্যে পড়ে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার সূত্রপাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়পর্ব থেকে যখন এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে উন্নয়নমূলক জ্ঞাপন কাজ করতে শুরু করে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষকে অংশ নিতে উৎসাহিত করে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার মূল ধারণা জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক অবদান রাখা।

৩.৩.৫ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন :

(ক) উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার অর্থ ও ধারণা।

(খ) উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার সাফল্যের দৃষ্টান্ত।

(গ) উন্নয়নমূলক জ্ঞাপন-এর লক্ষ্য।

বড় প্রশ্ন :

১. উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার কৌশলগুলি কী কী? জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের নিরিখের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

২. উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা বিশদে আলোচনা করুন।

৩.৩.৬ তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

১. Mefalopulos, P. (2008). Development Communication Sourcebook : Broadening

the Boundaries of Communication. The World Bank. Washington, D.C.

২. Murthy, D.V.R., Kumar, K.V. (2013). Development Journalism : An Analysis. Kanishka Publications.

৩. Salawu, A., Owolabi , T.O.S. (2017). Exploring Journalism Practice and Perception in Developing Countries (1st ed.). IGI Global.

৪. Vilanilam, J.V. (2009) . Development Communication in Practice : India and the Millenium Development Goals. SAGE Publications India Pvt. Ltd.

৫. http://www.1kowniv.ac.in/

একক ৪ ❑ ভারতে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা

গঠন

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

৩.৪.২ প্রস্তাবনা

৩.৪.৩ ভারতে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা

৩.৪.৪ ছতেরা, গ্রাম্যবাণী পরীক্ষা

৩.৪.৫ সারাংশ

৩.৪.৬ অনুশীলনী

৩.৪.৭ তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

এই একক-এর উদ্দেশ্য ভারতে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা-র প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশদে জানানো। পাশাপাশি, কীভাবে ভারতীয় প্রেস উন্নয়ন-এর জন্য কাজ করেছে সে বিষয়ে অবহিত করা। এরই সমান্তরালে উন্নয়নমূলক সংবাদ এবং ফিচার কীভাবে লিখতে হয় সে সম্পর্কেও একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

৩.৪.২ প্রস্তাবনা

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার ও প্রতিবেদন রচনার বেশ কিছু নজির রয়েছে। গ্রামের মানুষের কাছে উন্নয়নমূলক বার্তা পৌঁছে দিতে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সরকারের গৃহীত বিবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জনসাধারণকে জানায় সংবাদমাধ্যম। আমরা এই এককে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবো।

৩.৪.৩ ভারতে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা

প্রেক্ষাপট : ভারতীয় প্রেস এবং উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা

'উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা' এই শব্দবন্ধটির সূত্রপাত হওয়ার আগে থেকেই ভারতে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা-র অনুশীলন শুরু করে ভারতীয় প্রেস। ১৭৮০ সালে জেমস্ অগাস্টাস হিকি-র হাত ধরে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশনার মাধ্যমে ভারতে সাংবাদিকতার প্রচলন ঘটে। হিকি-র পত্রিকাটির নাম ছিল 'বেঙ্গল গেজেট' বা 'ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার'। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে পত্রিকাটির

বিতরণ শুরু হয়। এই পত্রিকায় কলকাতায় বাসরত ইংরেজদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা ও কর্মসূচির কথা ছাপা হত। এছাড়াও সেসময় 'সম্বাদ কৌমুদী', 'মিরাৎ-উল-আখবর', 'ব্রহ্মীণী কাল ম্যাগাজিন'-এর মতো জনপ্রিয় পত্রিকাসহ অন্য কিছু পত্র-পত্রিকাও ছিল যা সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় প্রকাশ করতেন। রামমোহন এবং তাঁর বন্ধুরা ভারতীয় সমাজকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করেন। হিন্দু সমাজে সংস্কার নিয়ে আসেন। রামমোহন ভারতীয় সমাজে চলে আসা পুরনো প্রথাগুলিকে সমর্থন করেননি। যেমন, সতীদাহ প্রথা। রামমোহন এই প্রথাকে সামাজিক পাপ বলে মনে করতেন। সতীদাহ প্রথারদ-এর জন্য রামমোহন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। অবশেষে সফল হন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন লড়াই সাফল্যমণ্ডিত হয় যখন লর্ড বেন্টিক ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথার বিলোপ ঘটান।

রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ-এরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ-এ সমাজের যাবতীয় অন্যায়, অনাচার-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তিনি সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান জানান। সমাজে যখন সংস্কার প্রক্রিয়া চলছিল সেই সময় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি আক্রমণের সম্মুখীন হয়। অ্যাংলো সংবাদপত্রগুলির মধ্যে দ্বৈরথ শুরু হয়। ১৮৫০ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে জাতীয়তাবাদ-এর উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকাগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

এই সময়পর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মতিলাল ঘোষ, বালগঙ্গাধর তিলক এবং দাদাভাই নওরজি-সহ অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সাংবাদিকতায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাই, ঐক্যের প্রশ্নে জনসাধারণকে সমবেত করার এক সক্রিয় হাতিয়ার হয়ে ওঠে সাংবাদিকতা। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী অনুভব করেছিলেন, মানুষকে খবর ও তথ্য সরবরাহ করা এবং জনসাধারণের সেবা করাই সাংবাদিকতার প্রধান কাজ। তিনি বিশ্বাস করতেন কত সংখ্যক মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে পারছে এবং সমাজ কতখানি সচেতনতা তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছে এর ওপরই সংবাদপত্রের প্রধান কাজ ও সাফল্য নির্ভর করে। তাঁর জীবনের লক্ষ্য অর্জন করতে সহায়তা করবে এমনই এক মাধ্যম হিসেবে সাংবাদিকতাকে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন', 'ইয়ং ইন্ডিয়া ও 'হরিজন' পত্রিকায় তিনি কলাম লিখতেন। দেশের উন্নয়নের পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে এমন বিবিধ বিষয় নিয়ে তিনি দেশের জনসাধারণ বিশেষত গ্রামে বাসরত মানুষের সঙ্গে মত বিনিময় করতেন।

স্বাধীনতার পর উন্নয়নমূলক কর্মসূচিও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কিত খবর ও তথ্য সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছত। রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক নীতিকে যথেষ্ট গুরত্ব দিয়ে সে সম্পর্কে বিশদ নিবন্ধ প্রকাশিত হত সংবাদপত্রে। উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি কীভাবে জনসাধারণ ব্যবহার করতে পারবেন বা সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন সে বিষয়েও খবর থাকত সংবাদপত্রে।

ভারতীয় সংবাদপত্রে উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন :

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার ও প্রতিবেদন রচনার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নজির

রয়েছে। গ্রামের মানুষের কাছে উন্নয়নমূলক বার্তা পৌঁছে দিতে সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সরকারের গৃহীত বিবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা জনসাধারণকে জানায় সংবাদমাধ্যম। এরই সমান্তরালে সমাজ যে ধরনের উন্নয়নের সম্মুখীন সেই বিষয়েও জনসাধারণকে অবহিত ও শিক্ষিত করে তোলে গণমাধ্যম।

উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন রচনায় বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক 'দ্য হিন্দু'-র সক্রিয় ভূমিকার কথা সুবিদিত। শুধুমাত্র গ্রামীণ এলাকার প্রতিবেদন রচনা ও কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রতিবেদনের জন্য একজন প্রতিবেদক নিয়োগ করে এই সংবাদপত্রটি। উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির খতিয়ান সহ কৃষকদের প্রতি সরকারি আধিকারিদের মনোভাব বিষয়ে 'দ্য হিন্দু' চমৎকার প্রতিবেদন উপস্থাপনার কৃতিত্ব দেখিয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও তার রূপায়ণে বাণিজ্য মহলের প্রতিক্রিয়াও প্রতিফলিত হয়েছে এই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। গ্রামীণ অঞ্চলের স্বতন্ত্র প্রতিবেদনের জন্য 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় একটি কলাম চালু করা হয় যার নাম 'ফর দ্য ফার্মার্স নোটবুক'। কৃষিক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গবেষণা কাজ ও তার ফলাফল এবং বিভিন্ন অঞ্চলে তার সম্ভাবনা ও প্রয়োগের অনুপুঙ্খ বিবরণ থাকে এই কলামে। এছাড়াও কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন আবিস্কারের কথাও উঠে এসেছে এই কলামে। কৃষি ও অ-কৃষি যুগপৎ দুইক্ষেত্রের উন্নয়নের তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে পত্রিকাটির এই কলম অত্যন্ত সফল হয়েছিল।

উন্নয়নমূলক জ্ঞাপন-এর জনপ্রিয় সাংবাদিক পি. সাইনাথ পাঁচটি রাজ্যের দশটি সবথেকে গরিব জেলায় যান এবং সেখানকার মানুষের বাস্তব পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। 'টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া ফেলোশিপ'-এ সম্বর্ধিত হন সাইনাথ। দেশের প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে তিনি সফর করেন। মূলধারার গণমাধ্যমে এই অত্যন্ত অঞ্চলগুলি একদম অবহেলিত হয়েছিল। এই গ্রামগুলির মানুষের জীবনযাত্রা ও ন্যূনতম চাহিদার কথা তুলে ধরার প্রশ্নে মূলধারার গণমাধ্যম আগ্রহী ছিল না। পি. সাইনাথ এর গবেষণার ওপর প্রায় চুরাশিটি প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনগুলিতে উঠে আসে গ্রামীণ মানুষের নানাবিধ সমস্যার কথা। এমনকী ন্যূনতম চাহিদা যেমন খাদ্য, বাসস্থান ন্যূনতম শিক্ষা, ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিস্থিতি রহিত মানুষের জীবনের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের দিনলিপি। চরম দারিদ্র্যের শিকার এই মানুষদের জোর করে অন্যত্র তাড়িয়ে দেওয়ার কথাও উঠে আসে প্রতিবেদনে। এই প্রতিবেদনগুলি বহুল প্রচারিত হয় এবং এগুলি সঙ্কলিত হয় সাইনাথ-এর বিখ্যাত বই 'এভরিবডি লাভ্স আ গুড ড্রট'-এ।

কেরালার সংবাদপত্রগুলি ওই রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়নের প্রতিবেদনের সামনের সারিতে ছিল। গোটা দেশের মধ্যে পথিকৃৎ মালয়ালম সংবাদপত্রগুলি যেমন, 'মালামালা মনোরমা', 'মাথুভূমি' প্রভৃতি। এই সংবাদপত্রগুলিই প্রথম রাজ্যের কৃষিক্ষেত্র নিয়ে নিবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করে। প্রতি সপ্তাহে গোটা একটি পৃষ্ঠা এই উদ্দেশ্যে বরাদ্ধ করা হয়। এভাবেই কেরালার গ্রামীণ উন্নয়নে সংবাদপত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

এরই সমান্তরালে অন্যান্য অনেক সংবাদপত্র, ব্যক্তিবিশেষ, সমবায় সমিতি ও নাগরিক সমাজ উন্নয়নমূলক জ্ঞাপনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। গ্রামীণ সংবাদমাধ্যমের উন্নয়নে ওরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে কৃষক,কৃষক পরিবারের গৃহবধূসহ গ্রামীণ জীবনযাত্রার ছবি তারা তুলে ধরেছে। কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য সাম্প্রতিক প্রযুক্তি ও কৃষির উন্নয়ন বিষয়ক নানাবিধ তথ্য তারা সরবরাহ করেছে। মারাঠি মাসিক সংবাদপত্র 'শেতকারি'-র পাতায় উঠে এসেছে কৃষির সমস্যার কথা। গ্রামীণ উন্নয়নের নিরিখে এজাতীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'পাঞ্জাব ক্ষেতি ও হরিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'হরিয়ানা ক্ষেতি'-র কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এই দুটি পত্রিকারই পাঠক-পাঠিকা সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য সংগ্রহে যথেষ্ট আগ্রহী। দেশের স্বাধীনতার আগে থেকেই ভূপাল থেকে প্রকাশিত হত 'কৃষক জগৎ' পত্রিকা। দেশের প্রাচীন কৃষি পত্রিকাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত এই পত্রিকা সমবায় সমিতি, ডেয়ারি ও কৃষিজমির মালিক ও কর্ণধারদের মধ্যে বিতরণ করা হত। ফসলের রক্ষণাবেক্ষণ, কৃষিকাজ, পশুপালন সহ গ্রামীণ উন্নয়নের নানা ক্ষেত্র উঠে এসেছে এই পত্রিকার পাতায়।

প্রেস ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া জাতীয় ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় 'গ্রাসরুটস্' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছে। এই সংবাদ পত্রের লক্ষ্য গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত মানুষের জীবনযাত্রার কথা তুলে ধরা। ২০০৫ সালের মার্চ মাস থেকে এই সংবাদপত্রটির তামিল সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির তামিল সংস্করণে বেকারত্ব, কৃষি বিষয়ক বিষয় উঠে এসেছে। এরই সমান্তরালে প্রতিফলিত হয়েছে, গ্রামীণ মানুষের ন্যূনতম চাহিদার প্রশ্নসহ সাফল্যের খতিয়ান।

ভারতে উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন-এর সমস্যা :

গ্রামীণ উন্নয়নে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম অনেকক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও অনেক গবেষক মনে করেন যে শক্তি ও গতিতে এই কাজটি করার কথা তা সর্বদা বাস্তবায়িত হয়নি। এর কারণ হিসেবে গবেষকরা চিহ্নিত করছেন মূলধারার সংবাদমাধ্যমের কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণকে। কর্পোরেট মালিকানা একই সংবাদমাধ্যমের বহু সংস্করণের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। পরিবর্তন এসেছে সংবাদমাধ্যমের মালিকানা কাঠামোয়। দেশে উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন-এর সমস্যার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গবেষক, তাত্ত্বিক ও মিডিয়া বিশ্লেষক ও বিশেষজ্ঞরা কয়েকটি কারণকে চিহ্নিত করেছেন।

১. উন্নয়ন বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের অভাব। সাংবাদিকদের কাছে উন্নয়ন বিষয়ে অপর্যাপ্ত তথ্য।

২. উন্নয়মূলক তথ্য ও পরিসংখ্যান সহজে বোঝা যায় এমন তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনার অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ।

৩. সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে খবর করার অনীহা।

৪. সংবাদপত্র সংগঠন বা সরকারের থেকে উন্নয়নমূলক বিষয়ে খবর করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থাভাব।

একথা বুঝতে হবে উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন গোটা দেশের পক্ষেই সুবিধাজনক এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেশের উন্নয়নকে তুলে ধরার ক্ষমতা উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার রয়েছে বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। সমাজে অনুষ্ঠিত নানাবিধ সচেতনামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার উন্নয়নেও সচেতনতার প্রসারে এর ভূমিকা যথেষ্ট। মানুষকে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষের চাহিদার কথাই উঠে আসে উন্নয়নমূলক প্রতিবেদনে এবং এজাতীয় প্রতিবেদন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কৃষক সমাজকে নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলা ও তাদের আত্মবিশ্বাস জোগানোই এজাতীয় সাংবাদিকতার লক্ষ্য। উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ওপর নজরদারি চালায় উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা। উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সামনে আগত প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গও উঠে আসে এজাতীয় প্রতিবেদনে।

উন্নয়নমূলক প্রতিবেদনের সমস্ত পর্যায়েই মানুষ জড়িত। মানুষই স্থির করেন গণমাধ্যমের কাছে কোনটি প্রয়োজনীয়। দেশের মেরুদণ্ড কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে সকলেরই সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। গ্রামীণ কৃষকের প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করতে পারে প্রকৃত উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা এবং তার সমাধানের জন্য চেষ্টাও করে। এই কাজের মাধ্যমেই যে কোনও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সমাজ পরিবর্তনে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকরা সক্রিয় অনুঘটকের কাজ করেন।

উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন রচনা :

উন্নয়নমূলক জ্ঞাপনের প্রতিবেদন রচনার সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের পারস্পরিক যোগসূত্র তৈরি। এই যোগসূত্র রচনা করাও কার্যত এক চ্যালেঞ্জ। উন্নত ও অনুন্নত দেশের মানুষের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করা একজন সাংবাদিক এর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রত্যেক সাংবাদিক ও সংবাদ সংগঠন-এর নিজস্ব কথন রীতি আছে যার মাধ্যমে পাঠক, শ্রোতা, দর্শকের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়।

প্রযুক্তির ব্যবহার :

কোনও মহাদেশের একপ্রান্ত থেকে খবর সংগ্রহ করে অন্য প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার অন্তর্ভুক্ত। উন্নত দেশের মানুষের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোন-এর কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য প্রযুক্তিও প্রকৌশলের মাধ্যমেও দ্রুত গতিতে জ্ঞাপন কার্য সমাধান করা সম্ভব ও তথ্যের বিনিময় করা যেতে পারে। কাজেই, এজাতীয় উপকরণগুলি উন্নয়নমূলক জ্ঞাপন-এর কথনের ক্ষেত্রে এক কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের নিরিখে উন্নয়মূলক প্রতিবেদন প্রয়োজনীয়। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, বিশ্লেষক ও গবেষকদের মতে অনেক সময়ই উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন করার

ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সংবাদমাধ্যম সরকারি ঘোষণার কথাই প্রচারের মধ্যেই সীমিত থেকেছে। গ্রামের পরিকাঠামো উন্নয়ন যেমন রাস্তা, হাসপাতাল, সেতু নির্মাণের কথা উঠে এসেছে। সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান দ্রুতই উন্নত হবে। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রত্যাশিত ছিল আরও বেশি তথ্য ও সচেতনতা যা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে পারে। প্রতিটি মানুষের মানোন্নয়ন এবং তাকে স্বনির্ভর করে তোলার মাধ্যমে প্রকৃত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। উন্নয়নমূলক বিষয়গুলির প্রতিবেদন কীভাবে নিখুঁত ও যথাযথভাবে রচনা করা যায় তার জন্য কয়েকটি বিষয় গুরুত্বসহ বিবেচনা করা যেতে পারে।

১. সাধারণ মানুষের ওপর গুরুত্ব : উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন রচনার সময় সাংবাদিককে নিশ্চিত করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর প্রতিফলিত হয়। অনেক সময়ই দেখা যায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বাসরত সাধারণ মানুষ বা সমাজের অনুন্নত অংশের নিম্ন আয়ের মানুষজনকে নেতিবাচক ভাবে উপস্থাপিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অপরাধী বলে দেগে দেওয়া হয় বা সরকারি কোন প্রকল্প থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়। কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা হিংসাত্মক ঘটনার শিকার হলেই শুধুমাত্র তাদের দেখানো হয়। সমাজের এই পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষদের ভাবমূর্তি অনেকক্ষেত্রেই এভাবে নির্মাণ করা হয় যে দৈনন্দিন তিনবার পর্যাপ্ত খাবার প্রাপ্তিই তাদের জীবনযাত্রার জন্য যথেষ্ট। একটি ভালো উন্নয়নমূলক প্রতিবেদনে সমাজের প্রভাবশালী বা খ্যাতনামা ব্যক্তি ও তার জীবনযাপনের কথা নয়, বরং সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনের কথাই উঠে আসা উচিত। কারণ, সমাজের এই সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাই কোনও সরকারি সিদ্ধান্তের দ্বারা সবথেকে বেশি প্রভাবিত হয়। এই সাধারণ মানুষরাই জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। কাজেই, জনসমষ্টির নিম্নআয় সম্পন্ন বা উপার্জনকারী মানুষের সমস্যা, জীবনযাত্রার কথা গুরুত্বসহ উপস্থাপিত করা উচিত।

২. ঘটনাস্থল থেকে প্রতিবেদন : উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সাংবাদিকের প্রয়োজন যিনি সরাসরি ঘটনাস্থল থেকে প্রতিবেদন করতে পারবেন। উন্নয়নমূলক সংবাদ করতে গিয়ে তাঁকে সরাসরি ঘটনাস্থলে পৌঁছে তথ্য খতিয়ে দেখতে হবে। দূর নিয়ন্ত্রণে বসে উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন সম্ভব নয়। ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। উন্নয়নমূলক সাংবাদিককে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মানুষের অবস্থা খতিয়ে দেখে তাঁদের মতামত নিয়ে তবেই প্রতিবেদন রচনা করতে হবে। ঘটনাস্থল থেকে উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন-এর তুলনায় ডেস্কে বসে প্রতিবেদন সহজ কারণ দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি কম ব্যয় সাপেক্ষ এবং ডেডলাইন মেনে কাজ করাও সহজ। কিন্তু অনেকসময়ই প্রকৃত উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন এভাবে করা সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আফ্রিকায় খরা অবশিষ্ট দুর্ভিক্ষের সত্যতা যা উন্মোচিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল, দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে সরকার খাবার ও ত্রাণ বিতরণ করেছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দুর্ভিক্ষকবলিত এলাকার প্রতিটি বাড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার সরবরাহ করা হয়েছে কিন্তু বাস্তব চিত্র ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। দুর্ভিক্ষকবলিত এলাকায় গিয়ে সাংবাদিকরা কবর

দেখতে পান। ক্ষুধার্ত মানুষের মৃত্যুর মর্মন্তুদ চিত্র উন্মোচিত হয়। অনেক নিরন্ন পরিবার বাঁচার জন্য বনের গাছের শিকড়-বাকড় খেয়ে থাকতে বাধ্য হয়। মাসাধিককাল ব্যাপী এক বিশাল সংখ্যক মানুষ কোনও খাবার বা ত্রাণ পাননি।

৩। প্রতিবেদনে প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যানকে অন্তর্ভুক্ত করা : প্রতিবেদনে বস্তুনিষ্ঠ সত্য হিসেবে পরিসংখ্যানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিসংখ্যান ভিত্তিক সত্যতার নিরিখেই সাংবাদিক উপসংহারে উপনীত হন। কাজেই সাংবাদিক-এর কর্তব্য প্রতিটি পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখা। কোনও গবেষণা বা সমীক্ষার পরিসংখ্যান প্রকাশিত হলে সাংবাদিক-এর কর্তব্য কে বা কারা বা কোন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা সংস্থা গবেষণা বা সমীক্ষাটি পরিচালনা করেছে এবং কেনই বা করেছে তা খতিয়ে দেখা। এই গবেষণা বা সমীক্ষাটি পরিচালনা করতে কী পরিমাণ অর্থ খরচ হয়েছে তাও যাচাই করে নেওয়া। সমীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা প্রয়োজন এই সমীক্ষাটি চালিয়েছে কারা এবং কাদের ওপর ওই সমীক্ষা চালানো হয়েছে। মতদাতাদের ওপর কীভাবে সমীক্ষাটি চালানো হয় এবং কী কী প্রশ্ন করা হয় তা-ও জানা প্রয়োজন।

অনেকসময়ই সাংবাদিকদের বড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার বা বিশ্বব্যঙ্ক বা আন্যান্য রাষ্ট্র সংঘের সংস্থার পরিবেশিত তথ্য-পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করতে হয়। এজাতীয় সংস্থা কোনও দেশের গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা জি.ডি.পি.কে গণনা করে কোনও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করে। কাজেই এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহ করা তথ্য বাস্তবে কতখানি সত্য তা খতিয়ে দেখাও একজন সাংবাদিক-এর কাজ। কিছু কিছু গ্রামীণ অঞ্চলে মানুষের নিজস্ব বাড়ি রয়েছে, গবাদি পশু আছে, জমিতে ফসল আছে। সংখ্যায় কম হলেও প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এই সব কিছুরই নিজস্ব মূল্য রয়েছে। একজন ভালো সাংবাদিক তথ্য-পরিসংখ্যানকে বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং তা থেকে সঠিক ব্যাখ্যায় উপনীত হতে পারেন।

উন্নয়নমূলক জ্ঞাপন ও প্রতিবেদনে অনেক সাংবাদিকের অংশগ্রহণ থাকলেও অনেক সময়ই তা পর্যাপ্ত নয়। উন্নয়নমূলক জ্ঞাপনে অংশগ্রহণকারী বেসরকারি সংগঠন ও অন্যান্য সংস্থার সংখ্যা নগণ্য। মিডিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি টিলিভিশন চ্যানেল, পত্রিকা কিংবা রেডিওর সিংহভাগই বেসরকারি মালিকানাধীন। বেসরকারি মিডিয়ার প্রাথমিক লক্ষ্য স্বল্প সময়ে মুনাফা অর্জন। স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ অঞ্চলে উন্নয়নের-এর প্রশ্নে তাদের মনোযোগ পর্যাপ্ত নয়। বেসরকারি মিডিয়া উন্নয়নমূলক খবর বা প্রতিবেদনে আগ্রহী নয়। সরকারি গণমাধ্যম, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যারা সম্ভাব্য সমস্ত পথে স্বেচ্ছামূলক প্রতিবেদনকে উৎসাহিত করে তারা ব্যতীত অন্যান্য বেসরকারি সংগঠনগুলি এ বিষয়ে তেমন উৎসাহী নয়।

মূলধারার গণমাধ্যমের বাণিজ্যিক মুনাফাই লক্ষ্য। কাজেই উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন তাদের অগ্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। কখনও কখনও উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন তারা প্রকাশ করলেও তা নিছকই ব্যতিক্রমী ঘটনা। প্রতিদিন টেলিভিশন-এর চ্যানেলে বা সংবাদপত্রের পাতায় উন্নয়নমূলক খবর দেখা যায় না। কারণ

এই খবরে উত্তেজনার উপাদান থাকে না। কাজেই মূলধারার গণমাধ্যম মনে করে এজাতীয় খবর পাঠক শ্রোতা, দর্শককে আকর্ষণ করতে পারবে না। তাই অধিকাংশ মূলধারার গণমাধ্যমে উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন স্থান পায় না। বলিউড-এর দুই অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিয়ে যে পরিমাণ পাঠক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোনও গ্রামীণ অঞ্চলের উন্নয়নভিত্তিক সংবাদ তা করে না। মানুষ যে বিষয়ের নতুন নতুন তথ্য চান, সর্বশেষ তথ্য চান গণমাধ্যম সেই বিষয়ে বারংবার খবর করে কারণ তাহলেই মুদ্রণ, শ্রাব্য বা শ্রাব্য-দৃশ্য মাধ্যম বাণিজ্যিকভাবে উপকৃত হবে।

এরই বিপরীতে কিছু পত্রপত্রিকা ও বৈদ্যুতিন মিডিয়া চ্যানেলে গুরুত্বসহ উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন তুলে ধরা হয় এবং একে জনপ্রিয় করার চেষ্টাও করা হয় যাতে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যে তা বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে সক্ষমহয়। উদাহরণস্বরূপ, 'ফ্রন্টলাইন' পত্রিকায় উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন দীর্ঘসময় ধরেই প্রকাশিত হয়। আসামের আদা চাষীদের বিষয়ে উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। উন্নয়নমূলক সংবাদের আগ্রহী পাঠকদের উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে আকর্ষণীয় উপায়ে উন্নয়নমূলক সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে। একইরকমভাবে, 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকায়ও সময় সময় উন্নয়নমূলক সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার তরফে তৃণমূলস্তরে কর্মরত প্রতিবেদকদের পুরস্কৃতও করা হয়। কিন্তু এই পত্রিকাগুলি যেহেতু ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত তাই এর পাঠকসংখ্যা সীমিত এবং গ্রামীণ যে স্তরের মানুষের স্বার্থে সংবাদ পরিবেশিত হয় সেই অংশের মানুষের বোধগম্যের বাইরেই থেকে যায় এই প্রতিবেদনগুলি।

একইভাবে টেলিভিশন বা রেডিওর কিছু কিছু চ্যানেলে উন্নয়নমূলক সংবাদ পরিবেশিত হয়। অনেকক্ষেত্রেই উন্নয়নমূলক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন ও নাগরিক সমাজ গণমাধ্যামে প্রকাশিত খবরকে সহজ সরল করে গ্রামীণ মানুষদের বুঝিয়ে দেন যাতে তাঁরা উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হন। গণমাধ্যম ও গ্রামীণ অঞ্চলের পিছিয়ে থাকা মানুষের মধ্যে তাঁরা যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেন। প্রেস ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া তার পত্রিকা 'গ্রাস রুট্স'-এর মাধ্যমে উন্নয়নমূলক সংবাদ প্রকাশ করে আসছে দীর্ঘদিনযাবৎ। উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় যাতে অন্যান্য গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা এগিয়ে আসেন সে বিষয়েও ধারাবহিকভাবে উৎসাহ জোগায় এই প্রতিষ্ঠান।

এরই সমান্তরালে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলি উন্নয়নমূলক সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে যাতে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন আগামীর সাংবাদিকরা শ্রাব্য-দৃশ্য উপকরণগুলির ব্যবহারে দক্ষ হয়ে ওঠেন। যদিও একথা সত্যি যে বেসরকারি সংগঠনগুলির গণমাধ্যমকে ব্যবহারর করার কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই তবুও তাদের এই উদ্যোগ স্বাগত জানানোর মতো। কাজেই নাগরিক সমাজ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা জারি রেখেছে।

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় একটি চালু ধারণা রয়েছে যে পিছিয়ে পড়া অনুন্নত সমাজের প্রতিনিধি যাঁরা স্বভাবতই অক্ষরজ্ঞানহীন ও গরিব তাঁরাই ঘটনাস্থলে থেকে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে উন্নয়নমূলক

জ্ঞাপক-এর কাজটি ভালোভাবে করতে পারবেন। তাঁরাই বাস্তব পরিস্থিতিকে অন্যদের তুলনায় ভালোভাবে উপস্থাপিত করতে পারবেন। কাজেই সমাজের ওই অংশের প্রতিনিধিদের উন্নয়নমূলক জ্ঞাপনে এগিয়ে আসা প্রয়োজন কারণ সমাজের অনুন্নত, আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষের কাছে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতাও থাকবে। এই জ্ঞাপকরা দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে পারবেন। পারিপার্শ্ব ঘুরে গ্রামীণ সমাজের প্রকৃত সমস্যা যেমন তাঁরা সহজেই চিহ্নিত করতে পারবেন তেমনই তার প্রতিবেদনও করতে পারবেন গণমাধ্যমের একজন কর্মী হিসেবে। আবার, গণমাধ্যমে প্রচারিত বার্তাও তাঁরা সহজে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা ওপিনিয়ন লিডার-এর মতো। এই ধরনের দ্বিমুখী জ্ঞাপন প্রক্রিয়া অধিকাংশ গ্রামীণ অঞ্চলেই অত্যন্ত সফল হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

ফিচার ও নিবন্ধ :

গণমাধ্যমে উন্নয়নমূলক সংবাদ বা প্রতিবেদন উপস্থাপিত হওয়ার সমান্তরালে আরও একপ্রকার আকর্ষণীয় বিষয় উঠে আসে যার নাম ফিচার। সংবাদ প্রতিবেদনের থেকে এটি দীর্ঘ হয়। ফিচার-এ থাকে ঘটনার বিশদ বিবরণ। এটি প্রতিবেদন রচনার প্রথাগত উল্টো পিরামিড আঙ্গিকে লেখা হয় না। পরিবর্তে কথনরীতি বা গল্প বলার ভঙ্গিমায় এটি লেখা হয়। এমনভাবে ফিচার লেখা হয় যাতে খবরের সার্বিক আখ্যানটি ধরা পড়ে যে আখ্যানে কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি যুক্ত। পত্রিকার ক্ষেত্রে ফিচার সাধারণভাবে পরিবেশন করা হয়। পত্রিকায় অনেক বিশদে কোনও একটি সংবাদ বিষয়ক ফিচারকে তুলে ধরা হয় যাতে পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধাজনক সময়ে তাঁরা ফিচারটি পড়ে নিতে পারেন। সংবাদপত্র-পত্রিকা ছাড়াও অন্যান্য সংবাদ চ্যানেল ও মিডিয়াতেও ফিচার উপস্থাপিত করা হয়। কোনও একটি সংবাদের গভীরে গিয়ে দৃঢ়ভাবে ফিচার উপস্থাপিত করা হয়। সংবাদের সমান্তরালে খ্যাতনামা ব্যক্তি সাফল্যের কাহিনি নিয়েও ফিচার তৈরি হয়। উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেও উপস্থাপিত করা হয় ফিচারের আদলে। কোন জ্ঞাপনের দিক থেকে ফিচার নির্মাণের সময় পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বুঝে নেওয়াও প্রয়োজন।

সাংবাদিকতার এক সৃজনশীল আঙ্গিক ফিচার লিখন। কোনও সম্প্রদায়ের উন্নয়নমূলক বিষয়গুলিকে এমন সৃজনশীল ভাবে উপস্থাপিত করা হয় যাতে বার্তাটি পাঠকের মনে গেঁথে যায়। মানুষের আগ্রহের দিকটিও কোমলভাবে পেশ করা হয় ফিচারের মাধ্যমে। উত্তেজক বার্তা বর্জিত ফিচার এমন কোনও অনুচ্ছেদ থাকেনা সেখানে সামগ্রিক খবরের নির্যাস প্রতিফলিত হয়। সমগ্র প্রবন্ধটি মনোযোগ ও গুরুত্ব সহ পড়তে পাঠককে উৎসাহিত করে ফিচার। ফিচারের মাধ্যমে যে বার্তা পৌঁছে দেয়ওয়ার থাকে সেটির প্রার্থিত প্রভাবও পাঠকের ওপর পরিলক্ষিত হয়। অনুপ্রেরণা ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর সাফল্যের খতিয়ানও উঠে আসে ফিচারে। ফিচারের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক স্থিরচিত্রও ছাপা হয় যার মাধ্যমে সাংবাদিক বা লেখকের চিন্তাভাবনারই প্রতিফলন ঘটে। চিত্তাকর্ষক কিন্তু মানবিক সংবেদনায় জারিত শিরোনামই প্রকাশিত হয় ফিচারের সঙ্গে। কড়া খবরের মতো এর শিরোনাম কখনই উত্তেজক বা সাড়া জাগানো

হয় না। ফিচার,পাঠ করার জন্য যেন তাড়াহুড়োর থাকে না। পাঠক-শ্রোতা-দর্শককে ফিচার নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং মানুষকে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করো তোলে। তাই, উন্নয়নমূলক ফিচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার এজাতীয় ফিচার লিখন ও নির্মাণে মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

৩.৪.৪ ছতেরা, গ্রাম্যবাণী পরীক্ষা

গণমাধ্যম উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে পালন করে থাকে তার অনেক নজির আছে। গ্রামীণ মানুষের কাছে উন্নয়নের বার্তা, সংবাদ পৌঁছে দেওয়ায় সহায়তা করে গণমাধ্যম। সরকারের গৃহীত নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে গণমাধ্যম। সমাজ যে উন্নয়নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বিষয়ে মানুষকে শিক্ষিতও করে তোলে গণমাধ্যম। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছতেরা গ্রাম প্রকল্প। ১৯৬৯ সালে 'হিন্দুস্থান টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ফিচার 'আওয়ার ভিলেজ ছতেরা'। এই ফিচারের বিশেষ স্তম্ভে উঠে এসেছিল উন্নয়নের গ্রামীণ বৈশিষ্টগুলি। মূলত এটি ছিল এক গবেষণা প্রকল্প সেখানে একদল সাংবাদিক প্রতিবেদন ছতেরা গ্রামে সংগঠিত উন্নয়ন বিষয়ে সংবাদ করেছিলেন। শ্রম, নিষ্ঠা ও প্রভৃত উৎসাহের সঙ্গে সাংবাদিকরা এই প্রতিবেদনগুলি রচনা করেছিলেন যা গ্রামবাসীদের উদ্বুদ্ধ করে। বর্হিবিশ্বের কাছে এই বার্তা পৌঁছয় যে ভারতের গ্রামীণ সম্পদের বাস্তব ক্ষমতা ও কার্যকারিতা কতখানি। সাংবাদিকরা সুনিশ্চিত করেছিলেন গ্রামীণ সমাজের প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যাগুলি যেন নাগরিক সমাজের কাছে পৌঁছয়, যাতে নাগরিক সমাজ ও গ্রামীণ উন্নয়নে এগিয়ে আসতে পারে ও উন্নয়নের শরিক হতে পারে। সাংবাদিকদের কলমে উঠে এসেছিল ছতেরা গ্রামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি। এই উন্নয়নমূলক প্রতিবেদনগুলির সাফল্য দ্রুত পরিলক্ষিত হয় এবং সংবাদপত্র পাঠ করে অনেক পরিবারেও পরিচিত হয়ে ওঠে ছতেরা গ্রামের নামটি। সমাজের সর্বস্তরেই এইভাবে গ্রামটি পরিচিত হয়ে ওঠে।

দিল্লির বাইরে অবস্থিত 'ছতেরা' গ্রামটিকে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার জন্য নির্বাচিত করেন জি. ভার্গিস এবং 'হিন্দুস্তান টাইমস্' পত্রিকার উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত প্রতিবেদকগণ। এই প্রকল্পটির নাম দেওয়া হয় 'হামারা গাঁও ছতেরা' (আওয়ার ভিলেজ ছতেরা)। পরিক্ষামূলকভাবে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার জন্য যখন এই গ্রামটিকে নির্বাচন করা হয় তখন তা ছিল নিতান্তই অনুন্নত। গ্রামের গরিব, অনুন্নত, পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষদের কৃষিক্ষেত্রে নতুন ও উন্নত প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দিতে এগিয়ে আসেন আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানী এম. এস. স্বামীনাথন—এর তত্ত্বাবধানে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ-এর বিজ্ঞানীরা। প্রসঙ্গত দেশে সবুজ বিপ্লব আনয়নে সহায়তা করেছিলেন বিজ্ঞানী স্বামীনাথন। এভাবেই উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন সাংবাদিকরা।

১৯৯৩ সালে গ্রাম্যবাণী পরীক্ষাটি সংগঠিত হয়। ওড়িশার গঞ্জাম জেলার দেউলপাড়িতে একজন গবেষক সাধারণ মানুষকে তথ্য সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে এই পরীক্ষাটির বাস্তবায়ন ঘটান। ১৬ মাস ব্যাপী এই পরীক্ষাটি চালানো হয়। পাক্ষিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের প্রায় আটটি গ্রামের ওপর এই নিরীক্ষটি চালানো হয়। উন্নয়নমূলক তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই পরীক্ষাটি সংগঠিত হয়। গ্রামীণ মানুষের পক্ষে সহায়ক হবে, যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য, বনসৃজন, পশুপালন, জনস্বাস্থ্য সহ নানাবিধ উন্নয়নমূলক বিষয়ে সংবাদপত্রের মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়। উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়ার যাবতীয় খুঁটিনাটি খবর ও তথ্য জোগানোর পাশাপাশি এই সংবাদপত্রের পাঠক-পাঠিকা বা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতনও হয়ে ওঠেন। এভাবেই পত্রিকাটি গ্রামীণ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

৩.৪.৫ সারাংশ

গ্রামীণ মানুষের কাছে উন্নয়নমূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে, সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সরকারি নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা জনসাধারণকে অবহিত করে সংবাদমাধ্যম। উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন রচনায় বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক 'দ্য হিন্দু'-র সক্রিয় ভূমিকার কথা সুবিদিত। এ বিষয়ে খ্যাতনামা সাংবাদিক পি. সাইনাথ এর নাম উল্লেখযোগ্য, গ্রামীণ উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন রচনা ও প্রকাশে গোটা দেশের মধ্যে পথিকৃৎ 'মালয়ালা মনোরমা', 'মাথুভূমি'-র মতো মালয়ালম সংবাদপত্রগুলি। এছাড়াও মারাঠি সংবাদপত্র 'শেতকারি', 'পাঞ্জাব ক্ষেতি', 'হরিয়ানা ক্ষেতি', 'কৃষক জগৎ' 'গ্রাস রুট' পত্রিকাগুলির ভূমিকাও উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা ও জ্ঞাপনে উল্লেখযোগ্য। ভারতে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার সামনে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। উন্নয়নমূলক প্রতিবেদনা রচনাও বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন রচনার সময় প্রযুক্তির ব্যবহার সাধারণ মানুষের ওপর গুরুত্ব, ঘটনাস্থল থেকে প্রতিবেদন, প্রতিবেদনে প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উঠে এসেছে। উন্নয়নমূলক ফিচার ও নিবন্ধের গুরুত্বও দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়ে ছতেরা ও গ্রাম্যবাণী পরিক্ষার প্রসঙ্গও এক আলোচিত ও চর্চিত অধ্যায়।

৩.৪.৬ অনুশীলনী

১. ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ও উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার প্রেক্ষাপটটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ভারতে উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়?

২. ভারতীয় সংবাদপত্রে উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন-এর চিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

৩. উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন রচনার সময় কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা উচিত?—বিশদে বর্ণনা করুন।

৪. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো :

(ক) উন্নয়নমূলক ফিচার ও নিবন্ধ

(খ) ছতেরা ও গ্রাম্যবাণী পরীক্ষা

৩.৪.৭ তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী

১. Kumar, Dibyanshu. (2020). Development Journalism. R. K. Publication & Distributions.

২. Narula, U. (2019). Development Communication : Theory and Practice. Har Anand Publications.

৩. Sinha, Dipankar. (2013). Development Communication : Contexts for the twenty First Century. Orient Blackswan Private Limited.

মডিউল ৪

উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণের জন্য জ্ঞাপন

একক ১ ❑ উন্নয়নে অংশগ্রহণের গুরুত্ব—অংশগ্রহণ তত্ত্বের তাৎপর্য—পাওলো ফ্রেইরীর প্রেক্ষা—অংশগ্রহণকারী জ্ঞাপনের উপায়

গঠন

৪.১.১ উদ্দেশ্য

৪.১.২ প্রস্তাবনা

৪.১.৩ উন্নয়নে অংশগ্রহণের গুরুত্ব

৪.১.৪ অংশগ্রহণ তত্ত্বের তাৎপর্য

৪.১.৫ পাওলো ফ্রেইরীর প্রেক্ষা

৪.১.৬ অংশগ্রহণকারী জ্ঞাপনের উপায় **(Tools of Participatory Communication)**

৪.১.৭ সারাংশ

৪.১.৮ অনুশীলনী

৪.১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১.১ উদ্দেশ্য

আমরা এই এককে যে বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করবো তা হল:

- উন্নয়নে অংশগ্রহণের গুরুত্ব
- অংশগ্রহণ তত্ত্বের তাৎপর্য
- পাওলো ফ্রেইরীর প্রেক্ষা
- অংশগ্রহণকারী জ্ঞাপনের উপায়

৪.১.২ প্রস্তাবনা

উন্নয়ন জ্ঞাপনে অংশগ্রহণের গুরুত্ব রয়েছে। উন্নয়নের বার্তা যেমন গণমাধম সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, ঠিক তেমনি দক্ষ কর্মীরা সাধারণ মানুষের কাছে কথা বলে, আলোচনা করে, উন্নয়নের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে পারে। সরাসরি সংযোগের ফলে জ্ঞাপন সফল হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। তাই এই এককে অংশগ্রহণ তত্ত্বের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৪.১.৩ উন্নয়নে অংশগ্রহণের গুরুত্ব

উন্নয়ন জ্ঞাপনে অংশগ্রহণের গুরুত্ব রয়েছে। উন্নয়নের বার্তা যেমন গণমাধ্যম সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, ঠিক তেমনি দক্ষ কর্মীরা সাধারণ মানুষের কাছে কথা বলে, আলোচানা করে উন্নয়নের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে পারে। সরাসরি সংযোগের ফলে জ্ঞাপন সফল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। যেমন পরিবার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে মফস্বল, গ্রামাঞ্চলে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা যায়। স্বাস্থ্য কর্মীরা আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে লেখাপড়া না জানা মেয়েদেরও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে বোঝাতে পারেন। মেয়েরা যদি বিষয়টা বোঝে, প্রভাবিত হয় তাহলে বাড়ির পুরুষদেরও তারা এর গুরুত্ব বুঝতে উৎসাহিত করতে পারে।

জ্ঞাপনে অংশগ্রহণ তত্ত্বের প্রসারে মনস্তত্বের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কীভাবে কথা বললে, সাধারণ মানুষের ধারণায়, আচরণে প্রভাব বিস্তার করা যায় তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। এখানেই মনস্তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। উন্নয়ন বিষয়ে মানুষের মনকে প্রভাবিত করতে মনস্তত্ববিদদের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। প্রশ্নতালিকা তৈরিতে, আলোচনার পরিসরের নির্মাণে তাঁদের পরামর্শ খুবই সহযোগী ভূমিকা নিতে পারে।

এই তত্ত্বের রূপরেখা দিতে গিয়ে জ্ঞাপনবিদরা বলছেন "Participatory Communication is an approach based on dialogue, Sharing of information, perceptions and opinions among the various stakeholder and thereby facilitates their empowerment" অংশগ্রহণ তত্ত্বের প্রধান ভিত্তি হল কথপোকথন ও আলাপ আলোচনা যেখানে তথ্য ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিনিময় ঘটে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট মানুষজনের মধ্যে, আর প্রকৃতপক্ষে এর মধ্য দিয়ে যেটা ঘটে তা হল ক্ষমতায়ন, দরিদ্র প্রান্তিক মানুষেরা স্বাবলম্বী হয়ে উন্নয়নের পথে হেঁটে যায়।

এই তত্ত্বটির উদ্ভবের জন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক (cultural historian) Richard Tarnas এর ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। এখানেও Tarnas মনো সমীক্ষণের ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের মন আর বর্হিবিশ্বের মধ্যে যে নিরন্তর যোগাযোগ ঘটে চলেছে প্রকৃতপক্ষে তাই-ই উদ্ঘাটন করছে অংশগ্রহণ তত্ত্বের রূপরেখা। বর্হিবিশ্বের মানুষের চেতনায় প্রতিভাত করে যে বাস্তবতা তাই ফিরে আসে নতুন বোধ, অনুভব ও বিশ্বাসের অনুষঙ্গ হয়ে। এই বাস্তবতাকে মানুষ নিজের চেতনায় যাচাই করে দেখতে চায়, পরিণতিতে উত্তরণ ঘটে চেতনার যা উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করে।

অংশগ্রহণ কথাটির মধ্যে কিন্তু পারস্পরিক আচরণ যুক্ত হয়ে আছে। Jorge Ferrer এই অংশগ্রহণকে "Participatory turn" বলে অভিহিত করেছেন। একজন দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী গ্রামের মানুষদের কাছে গিয়ে বলছেন, ঘরদোর পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং খাবার আগে হাত ধুয়ে নিতে। এতে অর্দ্ধেক রোগ বিদেয় হবে। আবেদনটি কিন্তু এখানেই থামছে না, চেষ্টা করছে যাতে যাদের কাছে আবেদনটি রাখা হচ্ছে

তারা তা মেনে চলেন। যদি তারা মেনে চলেন তবে বুঝতে হবে ''Participatory turn'' ঘটেছে, অর্থাৎ মানুষ ঐ আবেদনে সদর্থক সাড়া দিয়েছে। পোলিও ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীরা ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, কারণ সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত হয়েছিল, যা সর্বাংশে ছিল গুজব, যে এই ভ্যাকসিন নিলে শরীর অক্ষম হয়ে পড়বে। স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে বুঝিয়েছিল এটা একটা কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। ভ্যাকসিন নিলে শরীর রোগ মুক্ত হবে। পোলিও রোগের সম্ভাবনাও নির্মুল করবে। এমনকি একবার অমিতাভ বচ্চনকে দিয়েও একটি প্রচার ছবি তৈরি করা হয়েছিল সেখানে বচ্চন পোলিও ভ্যাকসিনের উপকারিতা ব্যাখ্যা করেছেন। স্বাস্থ্যকর্মীরা ঐ প্রচার ছবি নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছিল। এবং তাতে খুব ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর সুপারস্টার ভ্যালু এখানে কার্যকরী হয়েছিল।

অংশগ্রহণের তত্ত্বের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি হল কমিউনিটির আইডেনটিটি। একটি কমিউনিটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ভুগোল, ভাষা ও সংস্কৃতি। রাজস্থানের গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য দেশ থেকে দেশান্তরে কমিউনিটির আইডেনটিটিকে বিশিষ্ট করে তোলে। আফ্রিকার উগান্ডায়, তানজানিয়ায়, দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে, ব্রাজিলে কমিউনিটির সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত আলাদা রকমের। জ্ঞাপনে অংশগ্রহণের (Participation in communication) সময়ে এই তারতম্যের বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী উন্নয়নের বার্তাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

কোন মাধ্যমটি ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করছে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতের উপর। কোন পরিস্থিতিতে কী মাধ্যম ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করবে যারা এই পদ্ধতি পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। মনে রাখতে হবে মানুষের অংশগ্রহণ হল মূলকথা। কোন পন্থায় বললে মানুষ বুঝবে, উৎসাহিত হবে সেটা ভেবে চিন্তে ঠিক করা প্রয়োজন।

মাধ্যম নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেশ, কাল, পরিস্থিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে। ভারতের মতো দেশে যেখানে শিক্ষার সুযোগ খুবই অপ্রতুল, ফলে স্বাক্ষর মানুষের সংখ্যা খুবই কম, সেখানে বেতার খুবই উপযোগী গণমাধ্যম। যেহেতু বেতার শ্রুতি মাধ্যম, তাই নিরক্ষর মানুষও বেতার বাহিত বার্তা বুঝতে পারে। বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও নেপালের ক্ষেত্রেও বেতার অংশগ্রহণকারী জ্ঞাপনে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে।

গবেষণা বলছে সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম হল পারস্পরিক ও দলগত জ্ঞাপন। মুখোমুখি আলোচনার কোন বিকল্প নেই। কথা বলে মানুষকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করা যায়। যদি কথা হয় দু-জনের মধ্যে তবে সুবিধা বেশী। বেশ কয়েকজন যদি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তাহলেও সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ একাধিক মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে অনেক বেশী তথ্যের আদানপ্রদান ঘটবে।

যে কোন ক্ষেত্রেই পন্থা বলে দেয় সাফল্যের ইতিবৃত্ত। লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে, কিন্তু কীভাবে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পন্থা ঠিক হলে সাফল্যের দরজায় সহজে পৌঁছনো যাবে। ভুল হলে সবটাই ব্যর্থ হবে।

ব্রাজিলের শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরি-র (Paulo Freire) ভূমিকা অংশগ্রহণের তত্ত্বের ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন 'group dialogue-এর সাহায্যে মানুষকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা যায়, তিনি মনে করেন কথাবার্তা, আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা মানবিক জ্ঞাপনকে উন্নয়নের অংশীদার করে তুলতে পারি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার কথাও বলা যায়। আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গ্রামোন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। সমবায় নিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন।

অংশগ্রহণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে পদ্ধতি :

যে কোন তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে নির্দিষ্ট কয়েকটি পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। অংশগ্রহণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি পদ্ধতি সাফল্যের পথ দেখায়।

এই পদ্ধতিগুলির অন্যতম হল কমিউনিটি ম্যাপিং। প্রথমেই বুঝে নিতে হবে কমিউনিটির চরিত্র। তার সাইজ, সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক অবস্থানকে বিবেচনার মধ্যে রেখে স্ট্রাটেজি ঠিক করতে হবে।

দলগত আলোচনা (group discussion)-র মাধ্যমেও অংশগ্রহণের কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। নারী পুরুষের অবস্থানও একটি পদ্ধতি বলে বিবেচিত হয়। ছবির পোস্টার, নাটক, লোকগান ও অন্যান্য সংগীত ও পুতুল নাচও উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

৪.১.৪ অংশগ্রহণ তত্ত্বের তাৎপর্য

অংশগ্রহণ তত্ত্ব হল সম্পূর্ণভাবে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। যে কোন উন্নয়নের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করা হয় অংশগ্রহণের জন্য। তারা যদি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাহলে জানা যাবে তাদের মতামত, বিচারবোধ। এর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল 'many minds matter', অনেক মনের সমাহারে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

বিকেন্দ্রিকরণের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে অংশগ্রহণের তত্ত্ব। উন্নয়ন যজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে কেউ ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারে। এই অপার সম্ভাবনা বিকেন্দ্রিকরণের জয়গান গায়। লক্ষ্য করার বিষয় এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহুত্ববাদী ধারণা। নানা জনের নানা মতকে যদি সম্মান করা যায় তাহলে বহুত্ববাদকেই কুর্নিশ করা হয়।

যারা পিছিয়ে আছে, হাত ধরে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই অংশগ্রহণ তত্ত্বের উদ্দেশ্য। যেমন নিম্নবর্গের মানুষদের সাহায্য করতে হবে এগিয়ে যেতে, ঠিক তেমনি মেয়েদের সাহায্য করতে হবে

ক্ষমতা অর্জন করতে। এটি ঘটলেই বোঝা যাবে অন্তজ মানুষদের, মেয়েদের ক্ষমতায়ন হচ্ছে। শিক্ষার বিকাশে অন্তজ বা নিম্নবর্গের মানুষকে যদি যুক্ত করা যায়, মেয়েদের বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করে যদি শিক্ষার বৃত্তের মধ্যে আনা যায়, তাহলে বোঝা যাবে ক্ষমতায়নের জানলা খুলে যাচ্ছে।

৪.১.৫ পাওলো ফ্রেইরীর প্রেক্ষা

পাওলো ফ্রেইরী (Paulo Freire) হলেন ব্রাজিলের একজন শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক। শিক্ষাবিজ্ঞান নিয়ে প্রভুত আলোচনা করেছেন। তিনি ছিলেন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর সমালোচক। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যে এলটিজম সৌধ তৈরি হয়েছে তা তিনি ভাঙতে চেয়েছেন, তাঁর একটি বিখ্যাত বই-এর নাম 'Padagogy of the Oppressed, এই বইটিতে তিনি নিচুতলার মানুষদের জন্য বিকল্প শিক্ষাদানের চিত্র এঁকেছেন।

এই শিক্ষাদান ব্যবস্থায় একেবারে প্রান্তিক মানুষদের শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে চেয়েছেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল বিষয় ছিল সাক্ষরতা এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কীভাবে নিজেদের স্বার্থে তাঁদের ক্ষমতাহীনতাকে জয় করবে। তিনি বলেছেন মানুষের তীব্র ইচ্ছাশক্তি তার নিজের অবস্থার বদল ঘটাতে পারে এবং এই পরিবর্তন গোটা পৃথিবীকেই বদলে দিতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ পৃথিবীর অঙ্গ। তাই সে পৃথিবীর ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তিনি আদর্শবাদী অথবা বাস্তববাদী কোনটাই ছিলেন না। তাঁর অবস্থান ছিল অস্তিত্ববাদীদের কাছাকাছি। সোজা কথায় মানুষ নিজের অবস্থান নিজেই পাল্টাতে পারে। এক কথায় তিনি বলেছেন 'Man as Subject in the World and with the World," পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগ অত্যন্ত নিবিড়। পরিবেশ রক্ষায়, আত্মনির্ভরতার লড়াইতে সে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ফ্রেইরী মানুষকে এই শিক্ষা দিতে চান যে পৃথিবীটা তার। সেই পারে পৃথিবীটাকে বদলাতে।

উন্নয়ন জ্ঞাপনে পাওলো ফ্রেইরীর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা আছে, এ নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। উন্নয়ন সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে। এখানে ফ্রেইরীর তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা। প্রান্তিক মানুষের মধ্যেও তিনি পরিবর্তনের উদ্দীপনা দেখেছেন। ছাত্ররা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকে পরোক্ষ এজেন্ট, কিন্তু ফ্রেইরী ছাত্রদের সমাজ পরিবর্তনে প্রতক্ষ্য এজেন্ট করতে চেয়েছেন। প্রথাগত মেইনস্ট্রীম শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকরা ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ মূল্যবোধ যুক্ত শিক্ষা ছাত্রদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। এ যেন ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখার মতো, তাই ফ্রেইরী এই ব্যবস্থাকে 'Banking system' বলে অভিহিত করেছেন। এখানে ছাত্ররা হয় passive, শিক্ষকের দেওয়া জ্ঞান ধরে রাখতেই ব্যস্ত থাকে। কিন্ত ফ্রেইরী অন্যরকম শিক্ষার কথা ভেবেছেন, এই শিক্ষায় ছাত্ররা প্রশ্ন করতে শিখবে, নিজেদের অবস্থানকে চিনতে শিখবে, প্রত্যক্ষ এজেন্ট হিসেবে সমাজ পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করবে। তিনি বলেছেন ''Critical Pedagogy is not a method, rather it opens a space for

students to act and assert themselves as agents'', উন্নয়নে, সমাজ পরিবর্তনে এভাবেই নিপীড়িত মানুষেরা নিজেদের উদ্যোগে 'oppressive structure' বদলাবার চেষ্টা করে।

অংশগ্রহণকারী জ্ঞাপনে মাধ্যম হিসেবে কথপোকথন (dialogue) যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। মানুষকে তাদের অবস্থান, পরিবেশ ও উন্নয়নের ধারার সঙ্গে পরিচিত করতে কথাবার্তা, আলোচনা সাহায্য করে। ফ্রেইরীর শিক্ষাচিন্তায় উন্নয়ন জ্ঞাপনের সম্ভাবনা রয়েছে।

৪.১.৬ অংশগ্রহণকারী জ্ঞাপনের উপায় (Tools of Participatory Communication)

বিভিন্ন উপায়ের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী জ্ঞাপন বাস্তবায়িত হয়। মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে। এটাই হচ্ছে অংশগ্রহণকারী জ্ঞাপনের লক্ষ্য। ক্ষেত্র সমীক্ষা করে যে কটি উপায়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা (shared learning), গণতান্ত্রিক পদ্ধতি (democratic process), যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ (joint decision making), যৌথ মালিকানা (co-ownership), পারস্পরিক শ্রদ্ধা (mutual respect) এবং ক্ষমতায়ন (empowerment)।

আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা ঘটে কথপোকথনের মধ্য দিয়ে। পারস্পরিক জ্ঞাপন ও দলগত জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে চলে এই কথপোকথন। ফ্রেইরী যাকে 'Dialogue' বলে অভিহিত করেছেন। উন্নয়ন নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ কথা বলবে, আলোচনা করবে এবং এর মধ্য দিয়েই সঠিক পথের দিশা পাওয়া যাবে। তথ্যের ও মতামতের আদান প্রদান আলোচনার পরিসরকে প্রশস্ত করে।

শুধু আলোচনা করলেই হবে না লক্ষ্য থাকবে ক্ষমতায়নের দিকে অগ্রসর হওয়া। খতিয়ে দেখতে হবে কীভাবে নতুন জ্ঞান ও পথ খুঁজে বার করা যায়।

এ সমস্তই করতে হবে গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে। গণতান্ত্রিক পরিসর তৈরি হয় আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে। তর্ক বিতর্কের অবকাশ যদি থাকে, তাহলেই যে কোন সমস্যার গভীরে পৌঁছনো যায়। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। শুনতে হবে তাদের যুক্তি ও মতামত। কোভিড-১৯-এর সমস্যা মেটাতেও মানুষের কাছে যাওয়া প্রয়োজন ছিল। মানুষের সহযোগিতা না পেলে এ সমস্যা মেটানো শক্ত। শুধু ওপর থেকে নির্দেশ দিলে হবে না। মানুষকে বোঝানো প্রয়োজন আলোচনার মধ্য দিয়ে কী করলে কোভিডকে মোকাবিলা করা যায়। যেমন মাস্ক ব্যবহার এবং দূরত্ববিধি মেনে চললে কোভিডের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করা সম্ভব। শুধু নির্দেশ না দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে, কথপোকথনের মাধ্যমে এটা করলে দ্রুত ফল পাওয়া যাবে।

যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলে উন্নয়নের পথে দ্রুত এগোন যায়। সরকারি উদ্যোগ যদি সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষের সমর্থন পায় তাহলে তৈরি হয় সহমতের বাতাবরণ, উন্নয়নের পথ এতে প্রশস্ত হয়। জনস্বাস্থ্য

রক্ষার ক্ষেত্রে যৌথসিদ্ধান্তের গুরুত্ব অপরিসীম। শিশুদের পোলিও ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদর দেশে কয়েক বছর আগে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। এক শ্রেণীর মানুষ এই ভ্যাকসিন নিতে চায়নি। কিছু সংস্কার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন সরকার আলোচনা, বিখ্যাত ব্যক্তিদের পরামর্শ সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থিত করে যৌথ সিদ্ধান্তের পরিসর তৈরি করেছিল এবং তাতে কাজও হয়েছিল। উন্নয়নের যে কোন বিষয়ে যৌথ সিদ্ধান্ত সাহায্য করে।

যৌথ মালিকানা উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। সমবায় ব্যবস্থার কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন একটি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষদের যদি যৌথ মালিকানার মধ্যে নিয়ে আসা যায় তাহলে সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত হতে পারে এই বোধ যে সকলের স্বার্থই রক্ষিত হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কৃষি সমবায়ের কথা। বীজ সংরক্ষণ থেকে শুরু করে জৈব সারের ব্যবহার, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই পরিচালিত হতে পারে সমবায় নীতি অনুসারে, যার লক্ষ্যই হল সকলের সমস্বার্থ রক্ষা করা। এভাবেই যৌথ মালিকানা উন্নয়নে দিশা দেখায়।

অংশগ্রহণের অন্যতম অনিবার্য শর্তই হল পারস্পরিক শ্রদ্ধা। কথপোকথন অথবা আলোচনা যাই হোক না কেন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। ধৈর্য ধরে তাঁরা শুনবেন একে অন্যের কথা, তারপর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে এগিয়ে যাবেন।

উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের লক্ষ্যই হল মানুষকে ক্ষমতানের (empowerment) দিকে নিয়ে যাওয়া। যেমন নারী-পুরুষের মধ্যে অসাম্য কমাতে গেলেই মেয়েদের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ উঠে আসবে। কারণ অবস্থাগত বিভিন্ন কারণে, মেয়েরা পুরুষদের থেকে পিছিয়ে আছে। এ নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং লিঙ্গ বৈষম্যে সমতা আনার অর্থই হল মেয়েদের ক্ষমতায়ন। অর্থাৎ শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া, যাতে তারা নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় রাখতে পারে। এটা যদি সম্ভব হয় বুঝতে হবে মেয়েদের ক্ষমতায়ন ঘটছে। এভাবেই ক্ষমতায়ন অন্যান্য ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণকারী জ্ঞাপনের উপায় হয়ে উঠতে পারে।

৪.১.৭ সারাংশ

আমরা এই এককে যা যা জানলাম সেইগুলি হল :

- উন্নয়নে অংশগ্রহণের গুরুত্ব
- অংশগ্রহণ তত্ত্বের তাৎপর্য
- পাওলো ফ্রেইরীর প্রেক্ষা
- অংশগ্রহণকারী জ্ঞাপনের উপায়

৪.১.৮ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১. অংশগ্রহণ তত্ত্বের সঙ্গে মনোস্তত্ত্বের কোন যোগ আছে? অল্প কথায় লিখুন।

২. কী পদ্ধতি ব্যবহার হয় অংশগ্রহণে?

৩. পাওলো ফ্রেইরির ভূমিকা কী?

৪. কমিউনিটির গুরুত্ব কী?

বড় প্রশ্ন :

৫. অংশগ্রহণ তত্ত্ব নিয়ে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

৬. উন্নয়নে এই তত্ত্বের ভূমিকা কী? ব্যাখ্যা করুন।

৪.১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. ভট্টাচার্য, বি. জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম. লিপিকা।

২. White, S. A. Participatory Communication. Working for Change and Development, Sage.

৩. ভট্টাচার্য, বি. গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি. লিপিকা।

৪. Thomas, T. Participatory Communication. World Bank Working Papers.

একক ২ ❑ উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা—সাম্প্রতিক উদীয়মান পরিপ্রেক্ষিত—জাতিগঠনে জ্ঞাপনের ভূমিকা—উদ্ভাবনের প্রসারণ (Diffusion of Innovations)

গঠন

৪.২.১ উদ্দেশ্য

৪.২.২ প্রস্তাবনা

৪.২.৩ উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা

৪.২.৪ সাম্প্রতিক উদীয়মান পরিপ্রেক্ষিত

৪.২.৫ জাতিগঠনে জ্ঞাপনের ভূমিকা

৪.২.৬ উদ্ভাবনের প্রসারণ (**Diffusion of Innovations**)

৪.২.৭ সারাংশ

৪.২.৮ অনুশীলনী

৪.২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৪.২.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা যে বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করবো তা হল :

- উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা
- সাম্প্রতিক উদীয়মান পরিপ্রেক্ষিত
- জাতিগঠনে জ্ঞাপনের ভূমিকা
- উদ্ভাবনের প্রসারণ (Diffusion of Innovations)

৪.২.২ প্রস্তাবনা

উন্নয়ন হল জীবনের উৎকর্ষসাধন। জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় নূন্যতম শর্ত, যেমন খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। রাস্তাঘাটের উন্নতি, বিদ্যুৎ ও পরিশ্রুত জল সরবরাহও উন্নতির

সূচক। এই শর্তগুলি যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে বুঝতে হবে উন্নয়ন ঘটছে। ১৯৭৯ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক ঘোষণা করেছিল ''All nations stand to gain from furthering a course of development that will lift plight of absolute poverty from this planet and provide meaningful jobs and security to inhabitants''. সমস্ত দেশই উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে চায়। কৃষি, শিল্পে অগ্রগতি হলে মানুষের অবস্থা ভালো হবে। উন্নয়নের জন্য দরকার পরিকাঠামোর উন্নয়ন। রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিল্পের উন্নয়ন। এভাবে একটি উন্নয়নের সঙ্গে আরেকটি উন্নয়নের যোগ থাকে। এই ভাবেই তৈরি হয় সামগ্রিক উন্নয়নের চালচিত্র, সমাজ পরিবর্তনের রূপরেখা।

৪.২.৩ উন্নয়নের গণমাধ্যমের ভূমিকা

উন্নয়ন হল জীবনের উৎকর্ষসাধন। জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় নূন্যতম শর্ত, যেমন খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। রাস্তাঘাটের উন্নতি, বিদ্যুৎ ও পরিশ্রুত জল সরবরাহও উন্নতির সূচক। এই শর্তগুলি যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে বুঝতে হবে উন্নয়ন ঘটছে। ১৯৭৯ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক ঘোষণা করেছিল ''All nations stand to gain from furthering a course of development that will lift plight of absolute poverty from this planet and provide meaningful jobs and security to inhabitants''. সমস্ত দেশই উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে চায়। কৃষি, শিল্পে অগ্রগতি হলে মানুষের অবস্থা ভালো হবে। উন্নয়নের জন্য দরকার পরিকাঠামোর উন্নয়ন। রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিল্পের উন্নয়ন। এভাবে একটি উন্নয়নের সঙ্গে আরেকটি উন্নয়নের যোগ থাকে। এই ভাবেই তৈরি হয় সামগ্রিক উন্নয়নের চালচিত্র, সমাজ পরিবর্তনের রূপরেখা।

পরিবর্তন আনার জন্য সামাজিক মনস্তত্বে পরিবর্তন নিয়ে আসা দরকার। মানুষকে নিয়েই সমাজ, তাই মানুষের চেতনায় আকাঙ্খা তৈরি করতে হবে। তথ্য দিয়ে অবহিত করে, যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে, শিক্ষার মাধ্যমে প্রণোদিত করে মানুষকে সমাজ পরিবর্তনের সক্রিয় অংশীদার করে তুলতে হবে।

এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মানুষের অংশগ্রহণ ঘটাতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গণমাধ্যম। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন এবং সাম্প্রতিক কালে সামাজিক মাধ্যমও তথ্য সরবরাহ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণভিত্তিক আলোচনা পরিবেশন করে মানুষকে বোঝাবে কোন সমস্যাগুলিকে আগে মেটানো প্রয়োজন। অর্থাৎ গণমাধ্যম আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করবে। এতে সাধারণ মানুষ যেমন সমস্যা জানতে পারবে, ঠিক তেমনি সরকারও অবহিত হবে সমস্যাগুলি সম্পর্কে। ১৯৬৪ সালে গঠিত Vidyalankar Committee উন্নয়নে জ্ঞাপনের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিল ''গণজ্ঞাপনের জন্য নিযুক্ত গণমাধ্যমের দ্বারা তথ্যও বিবিধ বিষয় সরবরাহের ও জনমত প্রভাবিত করার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হল পরিকল্পনা যা ভবিষ্যৎ তৈরি করতে চলেছে সে বিষয়ে মানুষের মধ্যে পরিষ্কার ধারণা তৈরি করা'' পরিবর্তন ও প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করাই গণমাধ্যমের প্রধান লক্ষ্য।

পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নেতাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ স্থাপন করা দরকার। নেতৃত্বকে বুঝতে হবে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খা। ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষকেও বুঝতে হবে নেতৃত্বের দিক নির্দেশ। নেতৃত্বের সঙ্গে মানুষের বোঝাপড়া তৈরি করতে পারে গণমাধ্যম। এই বোঝাপড়া যদি ভালো হয় তাহলেই নেতৃত্ব সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং ঐ সিদ্ধান্ত রূপায়ণের জন্য মানুষের সহযোগীতা পাওয়াও সহজ হবে।

উন্নয়নমুখী পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, আইন প্রভৃতি বিষয়ে সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন যে আলোচনার সূত্রপাত করে তা প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে এবং উন্নত জীবনযাপনের জন্য দক্ষ করে তোলে। গণমাধ্যমের মূল কার্যকে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা এই ভাবে বর্ণনা করেছেন— সতর্ক প্রহরী, সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী ও শিক্ষক (Watchman, decision maker and teacher)। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের ওপর সদা সতর্ক নজর রাখে। গণমাধ্যমকে তাই বলা হয় গণতন্ত্রের অতন্ত্র প্রহরী। দুর্নীতির খবর ফাঁস করে, ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানুষকে সতর্ক করে দেয়।

গণমাধ্যমের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও যুক্তিনির্ভর আলোচনা সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে এবং জনমত গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। নির্বাচনের সময় সমস্ত মানুষই গণমাধ্যমের কভারেজের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়।

সমাজ জীবন যত জটিল হচ্চে শিক্ষক হিসেবে গণমাধ্যমের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশ, স্বাস্থ্যবিধি ও মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে সাধারণ মানুষ যে এত আগ্রহী হয়ে উঠেছে তার পিছনেও এর ভূমিকা রয়েছে।

ড্যানিয়েল লার্নার উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষায় বেতারের প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন প্রত্যন্ত গ্রামে যখন বেতার সেট আসে তখন ঐ নিস্তরঙ্গ গ্রাম জীবনে ঘটে এক নতুন ঘটনা। সমস্ত গ্রাম জীবনই রঙীন হয়ে ওঠে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য নতুন চাহিদার জন্ম হয়। ভারতবর্ষে প্রত্যন্ত গ্রামে বেতার সাধারণ মানুষের মনে আশার সঞ্চার করছে। কৃষি, স্বাস্থ্য, কুটীর শিল্প ও ভোগ্য পণ্যের প্রতি যেমন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলেছে, ঠিক তেমনি সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নের কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত করেছে মানুষকে।

উন্নয়ন জ্ঞাপনে গণমাধ্যমের দু'ধরনের লক্ষ্য শ্রোতা থাকে—(১) সিদ্ধান্ত প্রণয়নে যুক্ত নেতৃবর্গ, উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত আমলারা এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ (২) সাধারণ মানুষ যাদেরকে উন্নয়ন পক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। উইলবার স্রাম শ্রোতাদের অবহিত করার বিষয়টির ওপর প্রথম গুরুত্ব আরোপ করেন। ভ্যানিয়েল লার্নারের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা চালিয়ে স্রাম দেখেন তথ্য সরবরাহ করে এবং শিক্ষার সুযোগের বিস্তার করে সাধারণ মানুষের উন্নতি ঘটতে পারে। স্রামের মূল বক্তব্য

ছিল উন্নয়ন ও গণমাধ্যমের মধ্যে গভীর আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক উন্নয়নমুখী সমাজ পরিবর্তনে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। স্রাম বলেছেন গণমাধ্যমকে উন্নয়নের জন্য সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বার্তা তৈরি করতে হবে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে সফল করতে প্রয়োজন একটি বিশেষ বাতাবরণ, যা তৈরি করতে গণমাধ্যম উল্লেখজনক ভূমিকা নিতে পারে।

উন্নয়ন জ্ঞাপনকে সফল করতে হলে গণমাধ্যমকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থা যদি সহজলভ্য হয়ে ওঠে তাহলে আশা করা যায় উন্নয়নের সহায়ক পরিবেশ গড়ে উঠবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ করতে উৎসাহী হবে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞদের অভিমত সংবাদপত্রের পাঠক সংখ্যা যত বেশি হবে, বেতার ও টিভির শ্রোতার ও দর্শক সংখ্যা যত বাড়বে, যত বেশি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবস্থার আওতায় আসবে, উন্নয়ন জ্ঞাপনের ক্ষেত্র তত প্রশস্ত হবে। গণমাধ্যম তখন উন্নয়নকে প্রভাবিত করতে পারবে।

৪.২.৪ সাম্প্রতিক উদীয়মান পরিপ্রেক্ষিত (Emerging Perspectives)

প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যমের ভূমিকার প্রেক্ষাপটও দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে এই পরিবর্তনে। তিরিশ বছর আগে মুদ্রণ মাধ্যমেই ছিল বিগ ব্রাদার। বেতার এবং সংবাদপত্র গণমাধ্যমের ভূমিকাকে নিয়ন্ত্রণ করত। খুব দ্রুত যে কোন বার্তাকে পৌঁছে দিতে পারে বেতার। উন্নয়নশীল দেশে বেতার খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশে সাক্ষরতার হার বেশি নয়। বেতার নিরক্ষরতার বাধাকে খুব সহজেই টপকে যায়। প্রত্যন্ত গ্রামীণ মানুষদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে উন্নয়নের বার্তা। ভারতে খেরা (Kheda) প্রকল্পের অধীনে চাষবাস ও অন্যান্য জরুরী বিষয় নিয়ে চাষীদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল সরকার। এই প্রকল্পে চাষীরাও তাদের অভিজ্ঞতা, অভাব অভিযোগ জানাতে পারত। বেতার অনুষ্ঠান বেশ কয়েকজন মিলে একসঙ্গে শুনতে পারে। এবং খুব সামান্য খরচে একটা ট্রানজিস্টার সেট কেনা যায়। জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পরিবেশ রক্ষার মতো বিষয় নিয়ে ভারতবর্ষে বেতার বহ অনুষ্ঠান করেছে এবং তা উন্নয়নের নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

সংবাদপত্র ও বেতারের পর যে গণমাধ্যমটি খবু দ্রুত মানুষের মন জয় করল সেটা হল টেলিভিশন। টেলিভিশনের পর্দায় যে ছবি আসে তা চলমান। শব্দের উপস্থিতি চলমান ছবিকে আরও অর্থপূর্ণ করে তোলে। এর জাদুতে আটকে পড়ে মানুষ। টিভি দেখতে দেখতে বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ধ্যান ধারণা পাল্টাতে শুরু করে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে খুবই সাহায্যকারী মাধ্যম হয়ে উঠেছে টেলিভিশন।

গণমাধ্যমের আর একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হল চলচ্চিত্র, বিশেষ করে তথ্যচিত্র। ফিল্ম ডিভিশন বহু তথ্যচিত্র তৈরি করেছে যার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল উন্নয়ন। তবে চলচ্চিত্রের মূল আবেদন বিনোদন ও শিল্প চর্চায়। উন্নয়নের ওপর সরকারি উদ্যোগে নির্মিত তথ্যচিত্র সাধারণ মানুষের কাছে প্রচারধর্মী বলেই

মনে হয়। তবে কিছু ফিচার ফিল্ম যেমন শ্যাম বেনেগালের মন্থন সমবায় নীতির সাফল্য মানুষকে জানায়।

সাম্প্রতিক কালে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনা ঘটে গেছে গণমাধ্যম জগতে তা হল ইন্টারনেট নির্ভর সামাজিক মাধ্যম।

ইন্টারনেট গণমাধ্যমের চালচিত্রে রামধনুর বর্ণচ্ছটা নিয়ে এসেছে। নানারঙে বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে অসংখ্য সোশাল সাইটের আবির্ভাবে। টেলিভিশন পর্যন্ত গণমাধ্যমের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তার চেহারাটা আমূল বদলে গেল যখন, আমরা পেলাম ফেসবুক, হোয়াটস্‌অ্যাপ, টুইটার, গুগল, ইনস্টাগ্রামকে। জানার পরিধি আকাশ ছুঁয়ে ফেললো চোখের নিমেষে। এমন বৈপ্লবিক রূপান্তর এর আগে ঘটেনি। এইসব সাইট এত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থাও এখন শঙ্কিত। নির্দেশ জারি করে আইন মোতাবেক এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। এই নিয়ে তৈরি হচ্ছে বিতর্ক। স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিয়ে আইনি জটিলতা।

যতদিন যাচ্ছে সোশাল সাইট বা সামাজিক মাধ্যমগুলি প্রভূত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সংবাদপত্রের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠছে। টেলিভিশনও দেখছে বিপদের ছায়া। গণমাধ্যমের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে সম্পর্ক তা খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। মোবাইলেই এসে যাচ্ছে খবরের আপডেট। ফেসবুকে চলছে গল্পগুজব, হোয়াটস্‌অ্যাপে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আদান প্রদান হয়েছে খুব জনপ্রিয়। প্রকৃতপক্ষে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সামাজিক মাধ্যমগুলি তৈরি করছে নতুন পরিবার। পাল্টে দিয়েছে গণমাধ্যামের সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন সম্পর্ক।

৪.২.৫ জাতিগঠনে জ্ঞাপনের ভূমিকা (Communication For Nation Building)

স্বাধীনতার পর ভারতে জাতিগঠনের বিষয়টিই প্রধান হয়ে উঠেছিল। জাতিয়তাবাদের লক্ষ্য ছিল উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর দেশগঠনের প্রয়োজনীয়তাই প্রধান হয়ে উঠল। স্বাধীনতার আগে ছিল আত্মত্যাগের, আত্মবলিদানের পর্ব, স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করে ছিল লড়াই। স্বাধীনতার পর সে লড়াই, সংগ্রামের অবসান। শুরু হল দেশ গঠনের অঙ্গীকার। সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এ এক কঠিন ব্রত। তৈরি হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। সীমিত সাধ্যকে ব্যবহার করে দ্রুত উন্নয়ন কীভাবে করা যায় তার খসড়া তৈরি করে পরিকল্পনা শুরু হয়। ১৯৫১ সালে তুমুল উদ্দীপনাসহ শুরু হল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যাত্রা।

৪.২.৬ উদ্ভাবনের প্রসারণ (Diffusion of Innovations)

উদ্ভাবনের প্রসারণ তত্ত্বের প্রাথমিক রূপরেখা দেন Everett Rogers, তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত জ্ঞাপনবিদ। ১৯৬২ সালে Diffusion of Innovations নামে একটি বই লেখেন। ঐ বইতে Rogers বলেন প্রসারণ হল একটি পক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে উদ্ভাবন অবিরত ঘটে চলেছে, এবং এটা ঘটছে অনিবার্যভাবে জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। সমাজে প্রতিনিয়ত মানুষের মধ্যে এই জ্ঞাপন ঘটছে এবং ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়ছে। এই ছড়িয়ে পড়াটাই হল প্রসারণ। নতুন ধারণা, প্রযুক্তি ছড়িয়ে যাচ্ছে মানুষের মধ্যে। মানুষ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে শিখছে নতুন কৃৎকৌশল, জ্ঞান ও ধারণা যা তাঁদের, আরও অভিজ্ঞ করে তুলেছে। সামাজিক উন্নয়নে তা দেখাচ্ছে নতুন দিশা। জ্ঞানের উন্মেষ শুধুমাত্র জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, প্রসারিত হচ্ছে সমস্ত মানুষজনের মধ্যে যারা সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক।

Rogers নতুন ধারণার প্রসারে চারটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—(১) উদ্ভাবন নিজেই, অর্থাৎ যে বিষয়ে নতুন কিছু ঘটছে। (২) জ্ঞাপন মাধ্যম, (৩) সময় এবং (৪) সামাাজিক ব্যবস্থা। এই চারটি উপাদান সে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় তা পুরোপুরি নির্ভরকরে মানবিক মূলধনের (Human capital) ওপরে। রজার্স মনে করেছেন উদ্ভাবনকে মানুষ নিজের স্বার্থেই গ্রহণ করবে। কারণ উদ্ভাবনের মধ্যে নিহিত আছে মানব কল্যাণ। এক একটি উদ্ভাবন হয়ে ওঠে উন্নয়নের এক একটি ধাপ। কৃষিতে, শিল্পে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে; যোগাযোগ প্রযুক্তিতে উদ্ভাবন প্রতিনিয়ত নিয়ে আসছে উৎকর্ষ, উন্নতি। এতে মানব জীবন আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে, উত্তরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

Rogers তাঁর Diffusion of Innovations গ্রন্থে ৫০৮টি সমীক্ষা থেকে যে ফল পেয়েছিলেন তা বহু বিষয়কে প্রভাবিত করেছিল। বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব (Rural Sociology), শিক্ষা (Education), শিল্প সমাজতত্ত্ব (Industrial Sociology) এবং চিকিৎসা সমাজতত্ত্ব (Medical Sociology)। এই সব ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত উদ্ভাবন ঘটে তৈরি করছিল এক নতুন ভূবন যা উন্নতকে যুগিয়েছিল পুষ্টি। মানুষ নতুন কোন ইতিবাচক কিছুকে গ্রহণ করছে, এটাই ছিল প্রণিধানযোগ্য বিষয়। মানুষের জায়গায় বিভিন্ন সংস্থাও নতুন কিছুকে গ্রহণযোগ্য মনে করে নতুন দিগন্ত রচনা করতে পারে। এই সংস্থা শিল্প প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে কোন কিছুই হতে পারে।

উদ্ভাবনের চরিত্র (Characteristics of Innovations) নতুন যাই সামনে আসুক না, সাধারণ মানুষ তাকে সাদরে গ্রহণ করে না। বিচার বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নেয় এই নতুনের কার্যকারীতা কী, তাঁর ক্ষমতার ভূমিকা কতখানি, এইসব দিক দিয়ে যাচাই করে নিতে চায় তারা।

রজার্স উল্লিখিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যায় যা উদ্ভাবন প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এগুলি হল—

(১) আপেক্ষিক সুবিধা (Relative Advantage)

(২) সাফল্য (Trialability)

(৩) পর্যবেক্ষণ (Observability)

(৪) সঙ্গতি (Compatibility)

(৫) জটিলতা (Complexity)

(১) আপেক্ষিক সুবিধা (Relative Advantage) :

প্রতিনিয়ত উদ্ভাবন ঘটে চলেছে। এর একটা ঐতিহাসিক পরিক্রমা রয়েছে। এখন যে উদ্ভাবনটা ঘটল, তার একটা ইতিহাস আছে। যেমন অফসেটের আগে লেটার প্রেস, অফসেট লেটার প্রেস থেকে এগিয়ে কয়েকটি নির্ধারিত বিষয়ের মধ্যে নিহিত আছে এই এগিয়ে থাকার ব্যাপারটি। যেমন ছাপার গুণগত মানের উন্নতি। এটাই হল আপেক্ষিক সুবিধা, এই বিষয়টি উদ্ভাবন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে।

(২) সাফল্য (Trialability) :

উদ্ভাবনকে গ্রহণ করা খুব সহজ নয়। প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ, অভিজ্ঞতা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বহুক্ষেত্রে উদ্ভাবন নতুন পথের দিশা দেখায়। উন্নতির জন্য নতুন কিছুকে গ্রহণ করতে সকলে উৎসাহ বোধ করে।

(৩) পর্যবেক্ষণ (Observability) :

চারপাশে যা ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করা দরকার। এই ক্ষমতা অর্জন করলে উদ্ভাবনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। যা দেখছি, বুজছি সেটাই ছড়িয়ে দেওয়া আশেপাশের মানুষের মধ্যে। এরপর সেই তথ্য আরো দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে যাবে।

(৪) সঙ্গতি (Compabitibility) :

উদ্ভাবন শক্তিশালী হয়ে সঙ্গতির মাধ্যমে। আমার ভাবনা যদি প্রতিবেশীর ভাবনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলেই উদ্ভাবন কার্যকরী হয়। ভাবনার মেলবন্ধন না ঘটলে জ্ঞাপন সফল হবে না। তাই প্রয়োজন সঙ্গতির।

(৫) জটিলতা (Complexity) :

যা দেখছি আশেপাশে তা হুবহু অনুবাদ প্রতিবেশীকে দিচ্ছি না। আমার চিন্তার মধ্যে দিয়ে তা বিশ্লেষিত হচ্ছে, যাকে বলা হয় filteration, তারপর আমার ধারণার রং মিশে তৈরি হচ্ছে নতুন বার্তা যা পৌঁছে যাচ্ছে প্রতিবেশীর কাছে। যাত্রাটা সোজা সরল নয়, বেশ জটিল। এখানেই জটিলতার বিষয়টি শক্তপোক্ত হচ্ছে।

৪.২.৭ সারাংশ

এই এককে আমরা যে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম তা হল:

- উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা
- সাম্প্রতিক উদীয়মান পরিপ্রেক্ষিত
- জাতিগঠনে জ্ঞাপনের ভূমিকা
- উদ্ভাবনের প্রসারণ (Diffusion of Innovations)

৪.২.৮ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১. উদ্ভাবনের প্রসারণ তত্ত্বে রূপরেখা কে দিয়েছিলেন, অল্পকথায় লিখুন।

২. রজার্স প্রবর্তিত চারটি উপাদানের কথা লিখুন।

বড় প্রশ্ন :

১. উদ্ভাবনের প্রসারণের তত্ত্ব আলোচনা করুন।

২. রজার্স যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৪.২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. ভট্টাচার্য, বি. গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি. লিপিকা।

২. চট্টোপাধ্যায়, প. গণজ্ঞাপন. প: ব: রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৩. McQuail, D. Mass Communication Theory.

একক ৩ ❑ ভারতে উন্নয়ন জ্ঞাপনের কৌশল (Strategies for Development Communication in India)

গঠন

৪.৩.১ উদ্দেশ্য

৪.৩.২ প্রস্তাবনা

৪.৩.৩ উন্নয়নের কৌশল

৪.৩.৪ ভারতের অভিজ্ঞতা

৪.৩.৫ সারাংশ

৪.৩.৬ অনুশীলনী

৪.৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৪.৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা যে বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করবো তা হল :

- উন্নয়নের কৌশল
- ভারতে উন্নয়ন জ্ঞাপনের কৌশল

৪.৩.২ প্রস্তাবনা

কীভাবে উন্নয়ন হবে তার কৌশল ঠিক করা প্রয়োজন। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে স্থানকালের প্রেক্ষাতে এই কৌশল নির্ধারণ করা হয়। দেশ-কালের চাহিদাই বলে দেবে কী হবে কৌশলের পথ।

ভারতবর্ষ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দীর্ঘদিন, প্রায় দুশো বছর ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। স্বাধীনতার পর সবচেয় বড় প্রয়োজন অনুভূত হল এমনভাবে উন্নয়নের পথ খোঁজা যাতে দ্রুত আর্থ-সামাজিক দিক থেকে স্বয়ংম্ভর হয়ে ওঠা যায়।

৪.৩.৩ উন্নয়নের কৌশল

কৌশলের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল পরিপ্রেক্ষিত। ভারতে উন্নয়নের চাহিদার পরিচয় পাওয়া যাবে এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে। ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ, রয়েছে সামান্য শিল্পের সম্ভাবনা। জনসংখ্যা

ক্রম বর্দ্ধমান। প্রযুক্তিকৌশল সামান্য, মূলধনও খুবই সীমিত। এটাই ভারতীয় আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত। এটাকে বিবেচনার মধ্যে রেখে এগোতে হবে। পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে দেখতে হবে সেগুলির যথার্থ পরিচয়। যেমন কৃষিপ্রধান বলতে আমরা কী বুঝি? সমগ্র অর্থনীতির কত শতাংশ মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত। এটা জানা দরকার। কীভাবে তারা কৃষিকাজ করে, অর্থাৎ প্রযুক্তিকৌশল কেমন তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। এগুলো জানলেই পরিপ্রেক্ষিত বোঝা যাবে।

বর্তমান সমস্যা মেটাতে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সেটা নির্ধারণ করা দরকার। প্রথমেই বুঝতে হবে সমস্যাটা কী? এবং এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যাবে। এক্ষেত্রে একটু গবেষণার প্রয়োজন। নানা প্রাসঙ্গিক বিষয় খতিয়ে দেখে এগোতে হবে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণারর গুরুত্ব রয়েছে। সঠিক পথের দিশা পাওয়া যায় গবেষণার মাধ্যমে। কোন অঞ্চলে জল কষ্ট থাকতে পারে, আবার কোথাও বন্যায় ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি হয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমস্যাও বিভিন্ন রকমের হতে পারে। উপযুক্ত সমীক্ষা নির্ভর গবেষণার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত অবস্থার চিত্র পাওয়া যায় এবং তারপর সুনির্দিষ্ট নীতির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যায়।

বর্তমানে কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে তা হল সহনশীল উন্নয়নের (Sustainable Development) পথ নির্ধারণ করা। সহনশীল উন্নয়নের মূল কথাই হল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সীমিত সম্পদের ব্যবহার এমনভাবে করতে হবে যাতে উন্নয়নের ধারা দীর্ঘমেয়াদি হয়। খুব দ্রুত উন্নয়ন করতে গেলে অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত শক্তির (energy) ব্যবহার হয়। এতে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ হয় বেশী এবং এর ফলে দূষণের মাত্রা বাড়ে। কৃষিতে কেমিক্যাল সার ব্যবহার করলে ফলন দ্রুত বাড়তে পারে। কিন্তু কীটনাশকের বিষ স্বাস্থ্যের হানি ঘটায়। সহনশীল উন্নয়ন জৈব সারের ব্যবহারের ওপর বেশী গুরুত্ব দেয়। সহনশীল উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্যই হল ইকোলজি রক্ষা করে এগোতে হবে। বিকল্প শক্তির ব্যবহার যেমন সৌরশক্তি, বাতাস শক্তি (Solar and Wind Power)-র ওপর নির্ভরতা বাড়াতে হবে। রিনিউএবল শক্তির ব্যবহার করলে দূষণ কমবে। উন্নয়ন হবে টেকসই অথবা সহনশীল।

সঠিক কৌশল (strategy) গ্রহণের ওপর উন্নয়নের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। গবেষণা ভিত্তিক পরিকল্পিত নীতি উপযুক্ত কৌশল নির্ধারণে সাহায্য করে। আর এই কৌশল দ্রুত আর্থ সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করতে পারে সামাজিক কল্যাণকে।

৪.৩.৪ ভারতের অভিজ্ঞতা

স্বাধীনতার পর দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির জাঁতাকল থেকে বেরিয়ে এক স্বয়ংম্বর দেশ গঠনের উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠেছিল। তৈরি হয়েছিল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সীমিত সম্পদের ব্যবহার করে উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করা। উন্নয়ন যজ্ঞের সময়কাল ধরা হয়েছিল পাঁচ বছর।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হয় ১৯৫১ সালে। কৃষি ক্ষেত্রের ওপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। কারণ ভারতীয় অর্থনীতি ছিল প্রধানত কৃষি নির্ভর। অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। রুদ্ধ দ্বার অর্থনীতিই (Closed door economy) ছিল মূল লক্ষ্য। বর্হিবিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক যোগাযোগ গুরুত্ব পায়নি। জিডিপি-র (GDP) বার্ষিক হার ধরা হয়েছিল ২.১ শতাংশ, কিন্তু বাস্তবে তা হয়েছিল ৩.৬ শতাংশ। কৃষিতে সাফল্য ছিল বেশি। স্বাধীনতার পর যে উদ্দীপনা তৈরি হয়েছিল তা আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে সাফল্য এনেছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৫৬-৬১) শিল্পের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া রাস্তাঘাট, বনজসম্পদ, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছিল। ইস্পাত, সার কারখানার মতো ভারী শিল্প স্থাপিত হয়েছিল। রুদ্ধ দ্বার অর্থনীতির আগল খুলতে শুরু করেছিল। কারণ শিল্পস্থাপনে বিদেশের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছিল।

এরপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রাথমিক পর্বে ভারতীয় অর্থনীতি নেহেরুর প্রবর্তিত পথ অনুসরণ করেছিল। ভারতীয় অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক আদলের ছাপ ছিল। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারের অংশগ্রহণ ছিল প্রধান, ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কারের পর ভারতীয় অর্থনীতিতে বেসরকারিকরণের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। প্রচুর পরিমাণে বিদেশি বিনিয়োগ আসতে থাকে। টাকা ও ডলারের বিনিময় ব্যবস্থাও মুক্ত হয়। বিদেশ থেকে ডলারের আমদানী বাড়ে, এতে বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় বৃদ্ধি পায়।

বিশ্বায়নের ফলে বৈদেশিক শুল্ক হার অনেক কমেছে। এবং বিদেশি বিনিয়োগকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে আনা হচ্ছে। বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতি মুক্ত অর্থনীতি, রূদ্ধদ্বার অর্থনীতিকে বিদায় জানানো হয়েছে।

বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতি পুরোপুরি বাজার নির্ভর হয়ে উঠেছে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। সরকারের লক্ষ্যই হয়ে উঠেছে বেসরকারিকরণ। অর্থনীতিকে রাষ্ট্রিয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বের করে আনাই হল সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

উন্নয়নের প্রসঙ্গে সহনশীল উন্নয়নের (Sustainable development) গুরুত্ব মেনে চলার চেষ্টা চলছে। কারণ আজ এটা জলের মতো স্পষ্ট যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, জলবায়ু পরিবর্তনের কথা স্মরণ করে অগ্রগতির পথ করে নিতে হবে।

৪.৩.৫ সারাংশ

আমরা এই এককে যা জানলাম :

- উন্নয়ন কৌশল
- ভারতে উন্নয়ন জ্ঞাপনের কৌশল

৪.৩.৬ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১. উন্নয়ন জ্ঞাপন বলতে কী বোঝেন?

২. উন্নয়ন বলতে কী বোঝেন?

বড় প্রশ্ন :

৩. ভারতে উন্নয়ন জ্ঞাপনের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. উন্নয়ন কী? উন্নয়নের কৌশল সম্পর্কে লিখুন।

৪.৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. ভট্টাচার্য, বি. জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম. লিপিকা।

২. White, S. A. Participatory Communication. Working for Change and Development, Sage.

৩. ভট্টাচার্য, বি. গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি. লিপিকা।

৪. Thomas, T. Participatory Communication. World Bank Working Papers.

একক ৪ ❑ উন্নয়নে এনজিও (NGO)-র ভূমিকা

গঠন

৪.৪.১ উদ্দেশ্য

৪.৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৪.৩ এনজিও কী?

৪.৪.৪ উন্নয়নে এনজিওগুলির ভূমিকা কী?

৪.৪.৫ সারাংশ

৪.৪.৬ অনুশীলনী

৪.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৪.৪.১ উদ্দেশ্য

এনজিও বা নন-গভর্নমেন্টাল অর্গানিজশন শব্দটির সাথে সবাই পরিচিত। আমরা সবাই জানি যে এনজিও হল এক ধরনের সংস্থা, যেগুলো নানা ধরনের সামাজিক কাজকর্মের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে। আর তাই, বিষয়টি ভালো করে বোঝার জন্যই আমরা আমাদের এই এককে NGO-র বিষয়ে আলোচনা করতে চলেছি। যাতে, এই এনজিও সম্পর্কে আমাদের মনে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়।

প্রথমে আমরা জানবো যে, এনজিও-র মানে কী বা NGO কাকে বলে।

৪.৪.২ প্রস্তাবনা

নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন (এনজিও) শব্দটি খুবই বিস্তৃত এবং যেকোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে যা কার্যত সরকার থেকে আলাদা। উন্নয়নের ক্ষেত্রে এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং করছে। বিংশ শতাব্দীতে, এনজিওগুলি ভারতে এবং বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের ইতিহাসে নিজেদের জন্য একটি সমৃদ্ধ, সম্মানিত এবং নির্ভরযোগ্য স্থান অর্জন করেছে।

৪.৪.৩ এনজিও কী?

এই এনজিও (NGO) কথাটি হল নন-গভর্নমেন্টাল অর্গানিজশন (non-governmental organization) কথাটির সংক্ষিত রূপ। একটি এনজিও হল এক ধরনের অলাভজনক বেসরকারি সংস্থা বা গোষ্ঠী। এনজিওগুলিকে বিশ্বব্যাংক এই ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে 'ব্যক্তিগত সংস্থাগুলি যেগুলি দুর্ভোগ থেকে

মুক্তি, দরিদ্রদের স্বার্থে প্রচার, পরিবেশ রক্ষা, মৌলিক এবং সামাজিক পরিষেবা প্রদান বা সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করে' প্রান্তিক মানুষদের খাদ্য, কাজ, জল, স্যানিটেশন, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং অন্যান্য সুবিধার জন্য এনজিওগুলি বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড প্রদানের মাধ্যমে তাদের চাহিদা পূরণ করে।

ভারতে, এনজিওগুলি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সামাজিক কর্ম গোষ্ঠী, উন্নয়নবাদী এবং বিকল্প হিসাবেও পরিচিত, এবং তারা দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং অভিযোজনে একটি বিশাল বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছে। দেখা যায় যে এনজিওগুলি স্থানীয় সম্প্রদায়ের খুব কাছাকাছি হয় এবং মানুষের জীবনের সাথে শিকড় রয়েছে। তারা সম্প্রদায়ের চাহিদার প্রতি তুলনামূলকভাবে বেশি সংবেদনশীল। তারা সরকারি ব্যবস্থার বাইরে কাজ করে এবং জনগণের প্রতিক্রিয়া এবং অংশগ্রহণের ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও উদ্ভাবনের নমনীয়তা রয়েছে।

মূলত, এই এনজিওগুলো সরকারি অনুদান, ব্যক্তিগত অনুদান ও সদস্যদের দেওয়া দান ও বিভিন্ন তহবিল উৎসের উপর আর্থিকভাবে নির্ভর করে। আমরা বাংলাতে এই ধরনের সংস্থাকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবেই চিনে থাকি। এনজিও বা এই ধরনের সংস্থাগুলো বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশেই কম-বেশি বিদ্যমান রয়েছে। এই সংস্থাগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি লোককে সম্প্রদায় হিসাবে আত্মনির্ভরশীল হতে সক্ষম করেছে, বিশেষ করে গ্রামীণ ও উপজাতীয় অঞ্চলে সবচেয়ে দরিদ্রদের কাছে মৌলিক পরিষেবা সরবরাহ করার জন্য তাদের সমৃদ্ধ তৃণমূল অভিজ্ঞতা খুব কাজে আসে।

এনজিও'র প্রধান ভাগ: প্রাথমিকভাবে অনেক এনজিও স্বেচ্ছাসেবকদের উপর নির্ভর করে। আবার, অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বেতনভুক্ত কর্মীদের নিয়োগ করেও কাজ করে থাকে। এই কারণে, বিশ্বব্যাংক এনজিওগুলোকে দুটি বিস্তৃত শ্রেণীতে ভাগ করেছে—

অপারেশনাল এনজিও: এই ধরনের সংস্থাগুলো উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজাইন করে থাকে ও সেগুলোকে বাস্তবায়িত করার উপর মনোযোগ দেয়।

অ্যাডভোকেসি এনজিও: এই সংস্থাগুলো কোনো একটা নির্দিষ্ট কারণকে সমর্থন করে বা প্রচার করার মাধ্যমে কোনো পাবলিক পলিসিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। আবার, অনেক এনজিওগুলো একই সাথে উভয় শ্রেণীর অধীনেই পড়ে। এনজিওগুলো সাধারণত তৈরি হয়, মানবাধিকারকে রক্ষা করতে, মানবিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করতে কিংবা রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে।

৪.৪.৪ উন্নয়নে এনজিওগুলির ভূমিকা কী?

এনজিওগুলির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং সেগুলি নিম্নরূপ:

ক. সামাজিক উন্নয়ন : একটি বেসরকারি সংস্থা যে সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হল

বিশ্বব্যাপী সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে উন্নত করা যা অবশেষে জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচক দ্বারা পরিমাপ করা মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সহজতর করতে সাহায্য করেছে। এনজিওগুলোর ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল তাদের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা বজায় রাখার ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার প্রতি তাদের অবস্থান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এনজিওগুলিকে সমাজে বঞ্চিত অংশকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদানের জন্য সরকারি সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করতে হতে পারে। যদি একটি সরকারি সংস্থা রাজনৈতিক আনুগত্য দাবি করে, তাহলে এনজিওগুলি তাদের নিরপেক্ষ অবস্থান লঙ্ঘন করার বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করার দ্বিধাগ্রস্ততার সম্মুখীন হতে পারে। এই কারণে মাঝে মাঝে এনজিওগুলিকে রাজনৈতিকভাবে অস্থির দেশগুলি থেকে তাদের প্রকল্প প্রত্যাহার করতে হয়।

খ. টেকসই সম্প্রদায় উন্নয়ন : এনজিওগুলো সম্প্রদায় স্তরের উন্নয়নের প্রচারে তার নেতৃত্বের গুণাবলী প্রমাণ করেছে। এনজিওগুলি এই ধরনের আদর্শ এবং মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হয়। যাতে তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সমাজের দুস্থ শ্রেণীর মধ্যে তাদের কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে পারে। এনজিওগুলির কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা সহজেই বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জনসমাগম করতে পারে। তারা এই বিভাগুলির ক্ষমতায়নে অগ্রগামী হয়েছে যাতে তারা তাদের জীবনকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এনজিওগুলি তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব বহন করে। এনজিওগুলি সরকারি সংস্থাগুলির তুলনায় খুব কম খরচে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্যভাবে টেকসই সম্প্রদায়ের উন্নয়নকে সহজতর করতে পারে।

এনজিওগুলি শুধুমাত্র স্থানীয় সম্প্রদায় পর্যায়েই নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও টেকসই উন্নয়নের প্রচার করে। সমসাময়িক যুগে সরকারি কর্মকান্ডে মনোযোগ দেওয়ার পাশাপাশি এনজিওগুলি তাদের কার্যক্রমের পরিধি প্রসারিত করেছে এবং তারা বৃহত্তর কর্পোরেশনগুলিতে মনোনিবেশ করা শুরু করেছে। এনজিওগুলি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতির দ্বারা সমর্থিত ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাবগুলি মূল্যায়নে জড়িত হয়েছে। এনজিওগুলি কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য তাদের কিছু সম্পদ বরাদ্ধ করতে ইচ্ছুক।

(সৌজন্য—শ্রীমতী সোমদত্তা নিয়োগী, Research Scholar,
Visva-Bharati University. NSOU PG SW-1)

গ্রামীণ উন্নয়নে এনজিওগুলির ভূমিকা : গ্রামীণ উন্নয়নে এনজিওগুলির ভূমিকা নিম্নলিখিত কারণে স্বীকৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে:

১. জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরকার একা প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে না;

২. সরকারি স্পনসরকৃত স্কিমগুলির গুণমান এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায় যখন লোকেরা প্রোগ্রাম পরিকল্পনা এবং ব্যাখ্যার সাথে জড়িত থাকে।

৩. এনজিওগুলি ভৌগলিক এবং কর্মসূচির প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাকে খুব ভালভাবে পরিপূরক করে;

৪. স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, সমস্যা এবং সম্পদ সম্পর্কে তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান রয়েছে।

৫. তারা মানুষের মন ও হৃদয়ের কাছাকাছি থাকে।

৬ স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের প্রতিশ্রুতি এবং উদ্যোগ।

৭. স্বেচ্ছাসেবী খাত আরও প্রতিক্রিয়াশীল এবং বৃহত্তর নমনীয়তার সাথে কাজ করতে পারে।

৯. বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

১০. শিক্ষা, প্ররোচনা, অনুপ্রেরণা এবং সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে মনোভাবের পরিবর্তন আনতে প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে একটি সংযোগ হিসাবে কাজ করা।

১১. জনগণকে বিস্তৃত পছন্দ ও বিকল্প প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় সরকারি কর্মসূচির পরিপূরক।

১২. প্রশাসনকে তহবিলের অপব্যবহার এবং বিলম্ব এড়াতে জনগণের প্রহরী হিসাবে কাজ করা।

১৩. প্রদর্শনী এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করা।

১৪. পরিবারের সমীক্ষার ভিত্তিতে পঞ্চায়েত পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা করা।

১৫. স্থানীয় উদ্যোগ এবং সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তা প্রদর্শন করা।

১৬. কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত জটিল প্রযুক্তি ব্যবহারে অপ্রশিক্ষিত সুবিধাভোগীদের যথাযথ নির্দেশনা প্রদান।

১৭. তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও অনুপ্রাণিত করা। তাদের পেশাগত বৃদ্ধির জন্য সেমিনার, সম্মেলন এবং কর্মশালার আয়োজন করা।

১৮. সম্প্রদায় এর মধ্যে থেকে অর্থ ও মানব সম্পদ সংগ্রহ করা এবং এর ফলে স্বনির্ভরতা প্রচার করা।

১৯. গ্রামীণ দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি করা, মহিলাদের অবস্থার উন্নতি করা, পরিবেশগত অবক্ষয় রোধ করা এবং সাক্ষরতার প্রচার করা।

২০. প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য, বস্ত্র ও ওষুধ ইত্যাদি প্রদান।

২১. গ্রামীণ দরিদ্রদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ইত্যাদি সুবিধা প্রদান।

২২. অনগ্রসর এলাকায় প্রয়োজনীয় কাঠামো নির্মাণ, প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রদান ইত্যাদি।

২৩. গ্রামীণ এলাকার সমস্যা অধ্যয়ন এবং বিভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

২৪. উন্নয়নের জন্য গ্রাম দত্তক নেওয়া। যেমন সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলোকে বিভিন্ন এনজিও দত্তক নিয়েছিল।

এনজিওর সম্প্রসারণ ও পন্থা : প্রতিটি এনজিওর কাজের পদ্ধতি অনন্য এবং মূলত এর উদ্দেশ্য সংস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়।

লক্ষ্য এবং উন্নয়ন : উন্নয়নের সামগ্রিক লক্ষ্য উৎপাদন পদ্ধতিতে উন্নত কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে বৃহত্তর আয় বৃদ্ধিকে বোঝায়। কৌশল শব্দটি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং বিভিন্ন লেখক দ্বারা বিভিন্ন অর্থের জন্য ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিক ব্যাখ্যার জন্য, একটি এনজিওর কৌশলকে 'সংস্থা এবং তার পরিবেশের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী শক্তি' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এটি অবশ্যই দেখা উচিত যে কাঙ্ক্ষিত ক্রিয়া অর্জনের জন্য সংস্থাটি তার চারপাশের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত।

সংযোজন কৌশল : সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রোগ্রামের আকার বৃদ্ধি বোঝায়।

বহুমুখী কৌশল : যা প্ররোচিত প্রোগ্রাম বা সংস্থার বৃদ্ধিকে বোঝায় না তবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বা নীতি অনুসরণের মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে অন্যদের প্রভাবিত করে প্রভাব বাড়ানোর লক্ষ্য রাখে।

বিচ্ছিন্ন কৌশল : যার দ্বারা প্রভাবগুলিকে আরও অনানুষ্ঠানিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত উপায়ে প্রচার করা হয়। সর্বোত্তম কৌশল বা কৌশলগুলির মিশ্রণ, স্পষ্টতই, অনেকগুলি কারণের উপর নির্ভর করবে এবং এনজিওগুলিকে নিজেদের শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ, এবং সীমাবদ্ধতালিকে ঘন ঘন এবং পদ্ধতিগতভাবে অন্বেষণ করতে হবে। একটি এনজিও দ্বারা স্টাটেজি প্রণয়ন শব্দের মধ্যে রয়েছে জনগণ-সংযুক্ত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা, সমস্যার সমাধান করার জন্য এবং কর্মের সাধারণ পদ্ধতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

উন্নয়নের সীমানায়, আরও কিছু শব্দ রয়েছে যা 'কৌশলগত (উন্নয়ন) পরিকল্পনা'-এর সাথে কমবেশি সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে সাধারণ ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে, 'ফ্রেমওয়ার্ক প্ল্যানিং' এবং 'সামগ্রিক পরিকল্পনা', উভয়ই বলে যে এই ধরনের পরিকল্পনায় সম্বোধন করা সমস্যাগুলি তুলনামূলকভাবে মৌলিক এবং সাধারণ প্রকৃতির। কৌশল প্রণয়নের মূল ধারণা এবং সম্পর্ক নিম্নলিখিত চিত্রটিতে চিত্রিত করা হয়েছে।

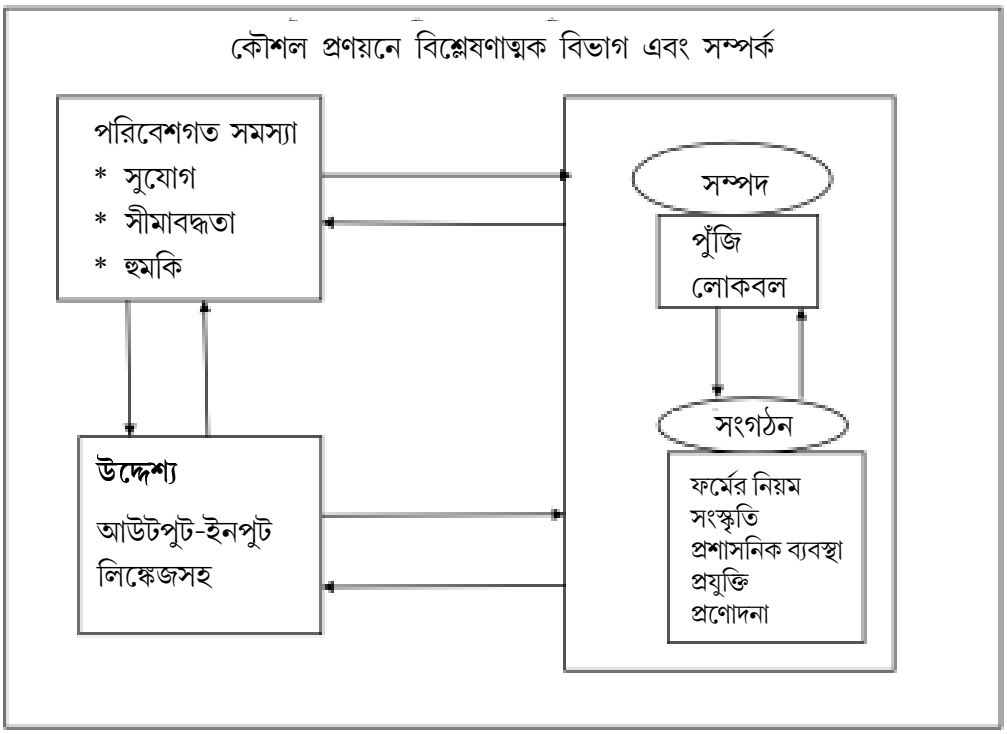

৪.৪.৫ সারাংশ

আমরা এই এককে যা যা জানলাম—

১. এনজিও কী

২. এবং উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা কী

৪.৪.৬ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন

ক) এনজিও কী?

খ) ফ্রেমওয়ার্ক প্ল্যানিং বলতে কি বোঝেন?

গ) এডভোকেসি এনজিও

ঘ) উন্নয়নে এনজিওর পাঁচটি ভূমিকা

বড় প্রশ্ন

ক) উন্নয়নে এনজিওর কী ভূমিকা রয়েছে?

খ) গ্রামীণ উন্নয়নে এনজিগুলির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. Davies, T. (2014). NGOs: A New History of Transnational Civil Society. New York. Oxford University Press.

২. এনজিও কি? এর কাজ এবং বৈশিষ্ট্যগুলো জানুন। (What is NGO in Bengali)

NOTES

NOTES

NOTES